বন্দী বিহঙ্গ

অনুবাদক

প্রবোধকুমার সান্যাল

[য়োহান বয়ের প্রণীত জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস "The Prisoner Who Sang" গ্রন্থের অনুবাদ]

গুপ্তপ্রকাশিকা

ঢাকুরিয়া, চব্বিশ পরগণা

—তিন টাকা—

দ্বিতীয় সংস্করণ

মহালয়া, ১৩৫২

প্রকাশিকা, ঢাকুরিয়া হইতে শ্রীইন্দুভূষণ দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীশম্ভুনাথ ব্যানার্জী কর্ত্তৃক মানসী প্রেস ৭৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

সুধী সাহিত্যরসিক

শ্রীযুক্ত প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

সুপণ্ডিতেষু—

প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রণীত

—গল্প সংগ্রহ—

আদি ও অকৃত্রিম

অঙ্গার
চেনা ও জানা
অঙ্গরাগ
বন্যাসঙ্গিনী
এই বুদ্ধ
তরঙ্গ

পঙ্কতীর্থ

—ভ্রমণ বৃত্তান্ত—

মহাপ্রস্থানের পথে
পঞ্জাব সীমান্তের পথে
দেশদেশান্তর
অরণ্যপথ
ভ্রমণ ও কাহিনী
ইতস্ততঃ

—উপন্যাস—

জয়ন্ত
নদ ও নদী
আঁকাবাঁকা
সায়াহ্ন
জীবন মৃত্যু
দেবীর দেশের মেয়ে
শ্যামলীর স্বপ্ন
নববোধন
কাজল-লতা
অগ্রগামী
স্বাগতম্
ঝড়ের সঙ্কেত
সরল রেখা
আলো আর আগুন

—চিত্র—

আগ্নেয়গিরি
রঙীন সূতো

—ছোটদের—

শুক্‌নো পাতা
আমার কথাটি ফুরোলো
সত্যি বলছি
দুরাশার ডাক

ওপারের দূত

—প্রবন্ধ—

মনে মনে

পায়ে হাঁটা পথ

বন্দী বিহঙ্গ

পরিচ্ছেদ—১

ছেলেটির নাম হোলো আন্দ্রে। মোটাসোটা চেহারা, চকচকে চুল, গোলাপী রং—সেলাইকরা পা জামা প'রে ঘুরে বেড়াতো। তা'র মা ছিল কুঁজো, এবং অবিবাহিত। ছোট্ট তাদের সংসারে আর একটি লোক ছিল—সে হোলো আন্দ্রের মামা। লোকটির বয়স হলেও বিয়ে করেনি। সারাদিন কেবল দোক্তা চিবোয় আর কাশে, আর থুতু ফেলে বেড়ায়। এই তিনটি প্রাণী থাকতো গাছপালা ঘেরা এক জঙ্গলে। সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি পথ বেরিয়ে গেছে পাহাড় পেরিয়ে—এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকায়।

আন্দ্রের কোনো সঙ্গী ছিল না। লোকে বলতো, আহা বেচারি কি একলা! কিন্তু লোকেরা জানতো না, নিজেকে নিয়েই ছেলেটার কী গভীর কৌতুক ছিল! দুপুর বেলায় বাড়ীর লোক একটু ঘুমোলে আন্দ্রে একমুঠো ঢিল-পাটকেল নিয়ে বেরিয়ে আসতো, এদিক ওদিক তাকিয়ে ছুড়তো মুরগীর ছানাগুলোর ওপরে—ব্যস, কী মজা! মা বেরিয়ে আসতো ছুটে চোখে ঘুম নিয়ে!

ছেলেটা চেঁচিয়ে বলতো, একটা বাজপাখী, মা!

মা বলে, বকিসনে,—দেখেছিস তুই?

যেন দেখলুম—এই এত বড়, মা!—দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেটা বলে। ছেলের কথা বিশ্বাস ক'রে মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উপর দিকে তাকায়। কিন্তু ঠিক সেই সময় মুরগীগুলো ঘাড় তুলে যেন বিপরীত কিছু একটা বলতে

চায়। তারপর আন্দ্রে আড়ালে পালায়, এক জায়গায় উপুড় হয়ে শোয়, আর প্রাণ ভ'রে হাসে।

বই পড়তে শেখা কী মজা, আর বই যারা পড়ে তাদের মুখ দেখলে কী হাসিই পায়। মা যখন বিছানায় শুয়ে ফিক্-ব্যথায় ছটফট করে,—মায়ের মুখখানা হয়ে ওঠে যেন কাঠের একপাটি জুতো,—তাই দেখে আন্দ্রে আড়ালে গিয়ে মুখ লুকোয়। মা বলে, কাঁদিসনে বাবা,—এখুনি ভালো হয়ে উঠবো। কিন্তু সেই কুঁজো মা গোয়ালঘর থেকে যখন দুধের ভাঁড় হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে—দুধ গড়িয়ে পড়ে ধুলোয়—আন্দ্রে তখন আর হাসি চাপতে পারে না, একটা গাদার উপর প'ড়ে হাসতে হাসতে তা'র যেন দম আটকায়। মা রাগে হাত মুঠো ক'রে চেঁচিয়ে বলে, হতভাগা!

কিন্তু হাসি পেলে আন্দ্রে কী করবে! হঠাৎ হাসি আসে, আগে থেকে জানিয়ে আসেনা। শীতকালে একদিন সে গেল মামার সঙ্গে বনে কাঠ আনতে। কাঠ বোঝাই গাড়ীখানায় দুজনে চেপে ব'সে তারা পাহাড়ের ঢালুতে সেখানা গড়িয়ে দিল—দুপাশে দুজন—যাতে ঠিক সময় গাড়ীখানাকে বাঁধা যায়··· কিন্তু মামার পায়ের জুতো হয়ত কাঁটার ঝোপে গেল আটকে—ব্যস, আর কি চাই···বেকায়দায় প'ড়ে গিয়ে মামা ঝুলতে ঝুলতে কাৎ হয়ে চেঁচায়! আন্দ্রের হাসি ফেনিয়ে ওঠে। মামা সেই অবস্থায় দাঁতে দাঁত চেপে বলে, দাঁড়া, দাঁড়া, আগে ঠিক হয়ে নিই—দেখাচ্ছি মজা! আন্দ্রে পালিয়ে যায়। বুড়ো যখন ঘরে এসে পৌছয়, দেখে আন্দ্রে বিছানায় প'ড়ে রয়েছে—তা'র অসুখ। মা বলে, একটু আস্তে হাঁটো, আইভার!

গ্রীষ্মকালের রাত্রে আন্দ্রে পা টিপে টিপে ওপরে যায়। এইটি তা'র দেখার ইচ্ছে, গুরুজনরা কেমন ক'রে বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছে। একটি খড়ের

কুটি দিয়ে মামার নাকে সুড়সুড়ি দেওয়া এমন কিছু পাপ নয়! মামা ঘুমের ঘোরে হাত নেড়ে ঠিক যেন মাছি তাড়ায়। হয়ত মায়ের গায়ে কিছু ফুটিয়ে দিল—পিশুপোকা মনে ক'রে মা নিজের গা আঁচড়ালো!

হয়ত কেউ হাসচেনা, হাসবার কোনো কারণও ঘটেনি—আন্দ্রে কিন্তু হঠাৎ হেসেই অস্থির। খেতে বসলে ওদের চেহারা কী যেন হয়! ভোজনের সময় অতি লোলুপতায় মায়ের নাকটা যেন বড় হয়ে ওঠে, মামার ঠোঁট দুটো যেন অশ্রান্ত। অমনি হো হো ক'রে আন্দ্রের হাসি। হাসির জন্যে মার খেয়েছে কতবার। কিন্তু হাসি পেলে একবার···কুড়ুল তুলে ভয় দেখালেও সে হাসি থামে না।

বার্জেট পাহাড়ে ওদের বাড়ী। সেখানে আন্দ্রের জানা মাত্র দুটি আস্তানা —একটি ছোট্ট কুটীর আর একটি গোয়াল। দুটি বাসা পাশাপাশি যেন দুটি স্বামী স্ত্রী—জরাজীর্ণ, অথর্ব, নোংরা—জলে-ঝড়ে একইভাবে নড়বড়ে হয়ে রয়েছে। গাছের ছাল, ডালপালার বেড়া—ওধারে নীচে ছোট নদী, মাঝে মাঝে ছোট ছোট কোঁড়া গজিয়েছে। পাথরের ঢেলাগুলো অমনি দীর্ঘকাল একইভাবে দাঁড়িয়ে, তারা আর বাড়ে না,—তাদের যেন মা-বাপ নেই যে, তাদের কোনো উপায় হবে।

একদিন উপরতলার জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলো একটি লোক গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছে, আর তা'র দিকে সবাই চেয়ে রয়েছে। মানুষের এমন কিছু নেই যে, আপন ক্ষণ-চাপল্যকে চাপতে পারে। সহসা আন্দ্রে ভাবলো, ওরা দুজন অন্য দিকে ফিরে তাকাক না কেন! যেই ভাবা, অমনি কাজ। জানলার হুকটা সে খুলে দিল, জানলাটা দড়াম ক'রে নীচে গেল প'ড়ে। মা আর মামা চমকে তাকালেন তা'র দিকে। ছেলেটা যেন মূর্তিমান ঘর-জ্বালানে।

তারপর যা হবার তাই। মামার পায়ের শব্দ পেয়ে আন্দ্রে জানলা টপ্‌কে দেয়াল বেয়ে ছাদের কার্ণিসে ঝুলছে।

গর্জন ক'রে মামা বললে, গেল কোথা?

মা বললে, হা ভগবান! নচ্ছার পাজি ছোঁড়া হয়ত ছাদে গিয়ে উঠেছে!

তারপর ভাই-বোনে গালমন্দ ক'রে ডাকে—এখুনি বেরিয়ে আসবি ত আয় নৈলে—

মামা একখানা মই আন্‌লো। উপর থেকে আন্দ্রে বললে, আমি লাফিয়ে পড়বো—এই ব'লে একটা ঘুলঘুলিতে পা রাখলো।

মা ভয়ে অবশ। ভয়ে কেঁদে উঠে বললে, আন্দ্রে, ওরে আন্দ্রে, আয় বাবা, নেমে আয় লক্ষ্মীটি।

মামা উঠছিল মই বেয়ে, কিন্তু বোন গিয়ে ভাইকে হিড়হিড় ক'রে টেনে নামিয়ে বললে, চুপ করো আইভার, ওকে ভয় দেখিয়ো না।

মা ছেলেকে নেমে আসার জন্য কাকুতি মিনতি করে। মা শেষকালে প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য হোলো, আচ্ছা, নেমে এলে তোকে চিনি আর মাখন খাওয়াবো!

তা'র জন্যে ভাই বোনে ঝগড়া বাধলে তা'র ভারি দুঃখ হোতো।

একদিন রবিবারে নীল একটি টুপি প'রে সে গেল গীর্জায়। পাহাড়ের পথের একটা বাঁকে দাঁড়িয়ে সে দেখলো—দেখলো দূরের পৃথিবী, কী বৃহৎ, কী বিস্তীর্ণ—কত লোক থাকে ওই পৃথিবীতে! এখান থেকে আরম্ভ ক'রে নীচের দিকে নেমে কত সমতল আর ঘন অরণ্য পেরিয়ে গেছে দূর দূরান্তরে …কত লোকালয় আর শস্যশ্যামল প্রান্তর অতিক্রম ক'রে! অর্ধচক্রাকার সাগরতীর, জাহাজের দল ভাসছে…কত অজানা কত রহস্য লোকের হাত-ছানির ডাক! অবশেষে এই ভাবনার উপর দিয়ে বাজে গীর্জার ঘণ্টারব…

ঘণ্টারবের তলায় সব ডুবে যায়। আন্দ্রে একদল নরনারীকে দেখতে পেলো, দেখলো কোনো মেয়ের পিঠে কুঁজ নেই! নেই দেখে সে অবাক হয়ে গেল। হঠাৎ তা'র মাকে দেখে মনে হোলো, মা যেন ছোট একটা গীর্জা, আর তা'র পিঠে কুঁজটা যেন ঠিক ওই গীর্জার গম্বুজের মতন। ধরো যেন সেই কুঁজের মধ্যে একটা বাচ্চা পুরোহিত বিজবিজ ক'রে প্রার্থনা স্তোত্র পড়ছে! আঃ একবার এই ঈশ্বরের ঘরে ঢুকলে অমনি চুপ ক'রে বসে থাকতে হবে—যদিও তার খেয়াল-খুশির দিকে অবিশ্যি কেউ তাকিয়ে নেই। ধরো প্রার্থনা চলছে—এমন সময় হঠাৎ যদি কেউ মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, আরে, আরে, এই যে, ওলানাইবা যে—আরে এসো এসো,—তেষ্টা পেয়েছে, খাবে নাকি একটু?—কিম্বা ধরো যদি কেউ চুপি চুপি গিয়ে বেদীর ওপর উঠে পিছন থেকে পুরোহিতের গায়ে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়?

মা তা'র কানে কানে বলে, সাবধান, অসভ্যতা করিসনে। মন্দিরে ব'সে মিটমিট ক'রে বোকার মতন হাসতে নেই!

এক সপ্তাহ অন্তর তিন দিন ক'রে তাকে একটা ঝোলায় বইখাতা নিয়ে কাছেই একটা ইস্কুলে যেতে হোতো। শীতের ভোরে তখনও আলো ফোটে না. জঙ্গলের পথটাও দীর্ঘ—অনেক সময় আন্দ্রে শেয়ালের ডাক শুনতো। বহুদূর পর্যন্ত নেমে গিয়ে একটা পল্লীতে পৌছে তবে সে কোনো সঙ্গী পেতো! একটি মেয়ে সঙ্গী জুটতো—তা'র নাম জোনেটা। তারই সমবয়সী। জোনেটা তার মায়ের নতুন ঘাঘরাটা পরে যেতো ইস্কুলে, ফলে পথে কতবার হোঁচট খেয়ে পড়তো।

ইস্কুলে গিয়েও কী মজা। মানচিত্র দেখলে অথবা বাইবেলের গল্প শুনলে ত কথাই নেই। নরওয়েটাকে দেখা যায় যেন একটি বিড়াল—মাছের দিকে যেন ওৎ পেতে আছে! সুইডেন যেন একটা ময়দার বস্তা! বিলাতটা ঠিক যেন

তার মায়ের মতন—পিঠে আয়ার্ল্যাণ্ডের কুঁজটা। আর বাইবেলের গল্পে পাওয়া যায় কত সুন্দর অভিনয় করার বিচিত্র ভূমিকা—বনে জঙ্গলে একা একা সে সব অভিনয়গুলি করতে পারে। এলিজার মতন সে শূন্যে উড়ে যেতো, ঝড়কে বলতে পারতো—থামো। শয়তানকে তাড়াতে পারতো। এবং গাছপালাকে শোনাতে পারতো কত উপদেশ।

ইস্কুলের ছুটি হ'লে দুটি ছেলে মেয়ে গোলাপী পশমের গুটির মতো আবার পাহাড়ের পথ ধরতো টুকটুক্ ক'রে—ধূসর শীতের সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতো। পথে জোনেটা বিদায় চাইলে বাকি পথটা একলা যাবার আতঙ্কে আন্দ্রে যেন ডরিয়ে উঠতো। মেয়েটা কোনো কোনো দিন খুশী থাকলে তাকে বাকি পথটুকু পৌছে দিত। তারা বড় হ'লে কি করবে, কি ভাবে তারা দিন কাটাবে—এমনি অনেক গল্প করতো।

একদিন গুরু গম্ভীর চালে মেয়েটা বললে, যাই বলো, আমেরিকা সব চেয়ে ভালো দেশ।

আন্দ্রে তার তুষার-ক্ষত কানদুটোর ওপর টুপিটা নামিয়ে জানালো, তা'র স্বপ্ন হোলো পারশ্য—সেখানকার লোকেরা শাদা ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়ায়······বাঁকা তলোয়ারে তারা সেলাম জানায়।

হা ভগবান,—মেয়েটা বলে উঠলো, সেই দেশ! সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই যে তোমাকে মেরে ফেলবে।

ছেলেটা বললে, আরে না, না—পিস্তলটা ভালো ক'রে বাগিয়ে ধরতে জানলেই হোলো।

পরের দিন মেয়েটা বললে, সেই দূর দেশে যাবার আগে আর একবার ভেবে দেখ্লেম। আমি আর আমেরিকায় যাবো না। যাক্—চললুম।

চলি—ব'লে আন্দ্রেও একা একা সেই দীর্ঘ নির্জন পাহাড় পেরিয়ে চললো।

পরের সপ্তাহে আর ইস্কুলের ঝামেলা নেই—সুতরাং সেই চাষাড়ে পল্লী আবার জনহীন হয়ে এলো। ঘোড়ার গলায় ঘণ্টার টুংটাং কী অপরূপ মনে হয়। এখানে কী করা যায়? কাঠ কাটো আর রান্নাঘরে নিয়ে যাও—সেই একই কাজ, লোকে চোখ বন্ধ ক'রেও করতে পারে। কিন্তু আকাশে আকাশে আন্দ্রের মন যখন ঘুরে বেড়ায়, সে অদ্ভুত সব কথা ভাবে। পর্বতের ওপারে সমুদ্রের থেকে উত্তর বাতাস উঠে আসে, সঙ্গে সঙ্গে আসে ধূসরবর্ণের মেঘ। বহুদূরে নীচের দিকে দেখা যায় জন সমারোহ। আন্দ্রের মনে হয় কত যুগযুগান্তর পেরিয়ে গেছে, সে মানুষ দেখেনি।

একদিন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। একটি মোড়ক এলো কোথা থেকে, তার মধ্যে কয়েকখানি সংবাদপত্র! বার বার আন্দ্রে সেগুলি পড়লো। কোথায় যেন আগুন লেগেছিল, একটি বালককে তার জন্য সন্দেহ করা হয়েছে। একটি হত্যাকাণ্ড হয়েছে কোথায়, কিন্তু হত্যাকারী এখনও পালিয়ে রয়েছে। ছুটে গিয়ে সে মাকে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা মা, বলতে পারো প্রতারণা কাকে বলে?

মা তাকে বুঝিয়ে দিল, আন্দ্রে কত কী যেন ভাবতে লাগলো। এ সব অন্যায়, এসব অপরাধ। আন্দ্রে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না সে কোথাও অপরাধ করেছে। কেবল এইটুকু ভাবলে তার কৌতুক হয়, সে যদি একখানা ছুরি নিয়ে তা'র মামার কণ্ঠার কাছে ধরে, মামার মুখের চেহারাটা কী রকম দাঁড়ায়; অথবা গোয়ালে যদি আগুন লাগে, যদি মুরগীগুলো ঝটাপটি ক'রে আগুন থেকে বেরোবার চেষ্টা করে, মায়ের চেহারা তখন কেমন!

ইস্কুলে একদিন টিফিনের সময় সে লুকিয়ে তা'র এক বন্ধুকে টিল মারলো, বন্ধুর নাক কাটলো। মাস্টার যখন তদন্ত করছেন, আন্দ্রে বললে, সে কিছুই জানে না। ধরা সে পড়লো না, এবং গান গাইতে গাইতে সে বাড়ী ফিরলো। ভাবলো, আর কিছু নয়, খবরের কাগজ তা'র একখানা চাই, অবশ্য চাই। মায়ের কাছে সে আব্দার ধরলো, অতএব একখানা কাগজের গ্রাহক হয়ে মা তবে রক্ষা পেলো।

পরিচ্ছেদ—২

মাত্র পনেরো বছরের কিশোর—চওড়া বুকের ছাতি, পেশীবহুল দেহ—সে চলেছে কুঁজো একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাহাড় পেরিয়ে উপত্যকার দিকে। কেউ ভাবতো না তা'র বয়স এত কম। নীল টুপির নীচে সোনার বরণ চুলের গোছা তা'র ঢাকতো না। তা'র দু'টি চোখে ঝিলিক খেলে যায়,—যেন সকল সময় দূরের দিকে চেয়ে কোনো কৌতুকের কিছু চোখে পড়তো। ছেলেটি সত্যিই সুশ্রী,—কিন্তু তা'র অস্থি-চর্মের মধ্যে কোথায় কিছু একটা ছিল, যেটা দেহের আধারের মধ্যে অতিকষ্টে চাপা থাকতো। সে জানতো, তাকে আর তা'র মাকে একসঙ্গে দেখে পিছন থেকে লোকে চাপা হাসি হাসে,—অন্যায় নিশ্চয়ই। কিন্তু মা তা'র বড় প্রিয়! কিন্তু মা যদি কোনো খানার ধার দিয়ে হাঁটতো, তবে সে—আর কিছু নয়—মাকে সে ঠেলে দিত খানার মধ্যে। ঈশ্বর সাক্ষী, মায়ের আঘাত লাগুক, এ সে চাইতো না—কিন্তু মাকে খানা থেকে টেনে তুলতে তা'র ভারি মজা লাগতো।

কোথাও একটু আধটু চুরি হ'লে, অনেকে তাকেই চোর ব'লে এসে হাঁকা-হাঁকি করতে থাকে। একদিন সন্ধ্যার সময় একটি তরুণী মেয়েকে কে যেন আক্রমণ করে, মেয়েটির জামাজুমি ছিঁড়ে-খুঁড়ে নষ্ট করে দেয়—তখন আর কি, ধরো আন্দ্রেকে! আর ওদিকে আন্দ্রে যে মায়ের জন্যে খেটে খেটে হায়রাণ হচ্ছে, মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে—সে কেউ দেখবে না।

একদিন গির্জা থেকে ফেরার পথে মাস্টার বললে, তোমার গলাটি বেশ, বাবা! আন্দ্রে হেসে প্রতিবাদ করলো।

সত্যি বলতে কি, আন্দ্রের মন খুশী থাকলে তা'র ইচ্ছে হোতো, গির্জার মধ্যে নিঃশব্দ জনতার মাঝখানে থেকে হঠাৎ সে উচ্চ ও স্পষ্ট গলায় গান গেয়ে ওঠে। কিন্তু মা বলতো, ছি, অত লোকের মাঝখানে গলা চড়িয়ে গান গাওয়া অসভ্যতা।

অবশেষে একদা জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরতে যাবার সে যোগ্য হয়ে উঠলো। তারা যাবে উত্তর দিকে, লফোটেন দ্বীপে। তার কাপড়-চোপড় ও দরকারী জিনিসপত্র কেনার জন্য মা একটি গরু বেচে টাকা পেলো।

হ্যাঁ, এবার সে বড় হয়েছে বৈকি। সেজেগুজে যেদিন সে জেলেদের সঙ্গে জলপথে যাত্রা করলো, মা তার দিকে চেয়ে রইলো বাৎসল্যের হাস্য-কোমল দুটি চোখে—মায়ের চোখে আনন্দের অশ্রু।

এক সপ্তাহ পরে আন্দ্রে ফিরে এলো। পাড়ার মাতব্বররা অবাক হয়ে গেল তাকে দেখে। আন্দ্রের সঙ্গে একটি ট্যাঁকঘড়ি, হাতে সুন্দর একটি ছড়ি, হোমরা-চোমরা বাবু—! নিজের চোখকে তারা যেন বিশ্বাস করতে পারলো না। ব্যাপার আর কিছুই নয়, আন্দ্রে সেই জেলেদের সঙ্গে বেরিয়ে মাঝপথে কোথায় যেন পালায়, সমুদ্র-সজ্জাগুলি বিক্রি করে, এবং তারপর এখানে! বাড়ী ফিরে সে বললে, মাগো, শুভপ্রভাত! মামা বললে, এ কি, তুই?

হ্যাঁ, ফিরে এলুম। ভেবে দেখছি, শীতকালে যদি মাছ ধরতে যাই, চিরদিন মাছ ধরেই কাটবে আমার। 'মুচি কিম্বা পুরোহিত কোনোটাই হবার আর আশা থাকবে না, তার চেয়ে বরং—

'মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। মামা চুপ।

আন্দ্রে বোঝাল কত কী। কিন্তু বোঝাতে পারে কতটুকু? তা'র মনের কথা হোলো, অনেক জায়গায় অনেক রকম লোক হয়ে সে থাকতে চায়। মুচি,

দরজি, প্রচারক—আরো নানারকম। গল্প পড়লে, কাগজ পড়লে—এ সব কথা বুঝতে আর কল্পনা করতে পারা যায়। ধরো, একখানা বই হাতে নিয়ে কত নিঃশব্দ সন্ধ্যা কেটেছে, ঘুরঘুর ক'রে একপাশে তা'র মা চরকা কাটছে, স্টোভের আগুনটা জ্বলছে এক রকম মৃদু একঘেয়ে শব্দে! আন্দ্রের মনে হোতো, এই নিঃসঙ্গ ঘরে তার গ্রন্থের অন্তর্গত নর-নারীদের ডেকে আনে, তারা আসুক—তাদের সঙ্গে আন্দ্রেও ঘটনার স্রোতে গা ভাসাবে। সে যেন সমগ্র এশিয়াখণ্ডে ভ্রমণে বেরিয়েছে পরিব্রাজক মহাত্মা পলের সঙ্গে, জুলিয়াস সীজারের সাথী হয়ে সে যেন চলেছে মিশর দেশে! তা'র মনো-বৈলক্ষণ্য দেখে মা একদিন ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, এমন কুড়ে হলি তুই? পাড়ার লোক সবাই যে তোকে নিয়ে হাসাহাসি করবে রে? আন্দ্রে বললে, তা করুক, সে দুর্ভাগ্য ওয়াটার্লু যুদ্ধের চেয়ে ত আর বড় নয় মা!

চরকা থামিয়ে মা বললে অবাক হয়ে, কি? কি বললি?

বইয়ের পাতা উল্টে আন্দ্রে নিস্পৃহভাবে বললে, একটা মস্ত বড় দরকারি সভা ছিল!

একবার এক মৃতব্যক্তির শোকযাত্রায় সে সঙ্গে গেল। কবরের চারিদিকে সবাই দাঁড়িয়ে যখন কাঁদছে, যখন পুরুৎ মশাই স্তবপাঠ করছেন—মাঝখান থেকে কে যেন বেমক্কার মতন চেঁচিয়ে ফস ক'রে কি যেন একটা কঠিন দিব্যি উচ্চারণ ক'রে বসলো!

সবাই হতচকিত। পুরুতের চশমা গেল খুলে। সকলের মুখে এমন বিস্ময়, যেন এখনি শবদেহটিও নড়ে উঠে বসতে পারে। কিন্তু কে লোকটা, আন্দ্রে নিশ্চয় নয়, সে ত' কাঁদছে। অথচ অন্য কেউও নয়! সবাই আন্দ্রের দিকে তাকালো বৈ কি। আন্দ্রে সহসা তখন সবচেয়ে গর্হিত কাজটাও ক'রে

বসলো। স্তবপাঠের বইখানা পকেটে ফেলে সেখান থেকে গুড়ি মেরে পালালো। তা'র মেরুদণ্ড যেন হিম হ'য়ে আসছে। সেই সমগ্র জনতা তার পিছন থেকে ঢিল পাটকেল নিয়ে তেড়ে আসছে। বাড়ী ফিরে সটান একেবারে বিছানায়। মায়ের কাছে এমন ভাব জানালো যেন, এ-জীবনে সে আর নাও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে।

কেন এমন করে, সে জানে না। কেন হঠাৎ মনে হয়, সেই করুণ মুখগুলির চেহারা ফিরিয়ে সে তাদের অন্য চেহারা এনে দেয়! এই ভেবে সহসা বিছানা ছেড়ে উঠে সে কৈফিয়ৎ স্বরূপ চিঠি লিখতে লাগলো: "ভাই জোনেটা, তোমাকেই শুধু আমার মনের কথা বলতে পারি। মন্দ লোকে সামনে পিছনে আমার গায়ে কলঙ্ক দেয়, কিন্তু শয়তানের পথ অনেক রকম— ওদের শাস্তি হবেই।"

কত সে ব'লে যায়—যেন কত নিরপরাধ সে। লোকের ইৎরোমোর সম্বন্ধে কত রকমের কথা। অবশেষে লেখে, "জোনেটা, তোমাকে আড়ালে একটা কথা বলবো।"

হাতে পেয়ে সে চিঠি জোনেটা পাড়ার লোককে দেখায়। সবাই ছি ছি করতে থাকে, ছেলেরা বিদ্রূপ ক'রে পালায়। ছি, ছি, ছি। ক'দিন ধ'রে তা'র আহারে রুচি চ'লে গেল, বিছানায় গড়াগড়ি দিল, চোখে ঘুম নেই।

রবিবারে পথে বেরোতেই রাস্তার ছেলেদের কদর্য বিদ্রূপ। কী কুৎসিত, কী জঘন্য! তাড়াতাড়ি সে ঢুকলো গির্জায়, চেঁচিয়ে স্তব পড়তে লাগলো। সেদিন থেকে সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। সে যেন সকলের থেকে আলাদা। যেখানেই সে যায়, সবাই যেন আঙ্গুল দেখিয়ে বলে, ওই যে, ওই যাচ্ছে!

উঁচু পাহাড়ে উঠে কোথাও দাঁড়ালে নীচেকার উপত্যকাটা যেন সমগ্রভাবে তা'কে বিদ্রূপ করতে থাকে!

অরণ্যের ভিতর তাদের ছোট পুরনো কুটীরখানি তেমনি জনহীন হ'য়ে থাকে। দীর্ঘ একটি সপ্তাহ—জনহীন, নিঃসঙ্গ! উন্মাদ কল্পনা আন্দ্রের মাথার মধ্যে যেন কুরে কুরে খায়। সে ভাবে আমি যদি সেণ্ট পল হতুম—এদের কত উপদেশ দিতুম, কত শিখতো এরা!

গির্জায় সম্প্রতি এক নতুন পুরোহিত এসেছেন। তাঁকে দেখার জন্য আন্দ্রে এক রবিবার পথের ধারে ব'সে রইলো। ঘোড়ার গাড়ী চ'ড়ে তিনি সামনে দিয়ে যখন যাবেন, আন্দ্রে গিয়ে দাঁড়ালো কাছে। ভদ্রলোক মাথা নীচু করলেন। আন্দ্রে তাঁর টুপি ছুঁতেই ঘোড়াটা চমকে উঠে হাঁসফাঁস করতে লাগলো। ভদ্রলোক রাশ টানবার চেষ্টা করলেন, আন্দ্রে লাগামটা ধরলো। হতচকিত লোকটি চাবুক বাগিয়ে ধরলেন। বললেন, কি হে, কী চাও?

কিছু না। কিন্তু আন্দ্রে দেখতে চেয়েছিল লোকটার ক্রুদ্ধ মুখখানা। দেখতে চেয়েছিল রাগ পড়লে সে মুখখানা কেমন নরম হাসি হাসে, হেসে কেমন নির্মল হ'য়ে ওঠে। তারপর সে কথা বলতে থাকে। তা'র ক্ষুধার্ত মা বিছানায় পড়ে রয়েছে। সে যেন নিজেকে রূপান্তরিত ক'রে জানাতে চাইলো, তারা গরীব, পয়সা কড়ি তাদের কেউ ধার দেয় না। তার মামা খোঁড়া, তাদের গরুটি মারা গেছে। গোটা কুড়ি টাকা পেলে তার মায়ের চিকিৎসা চলতো, ভাঁড়ার কিনতো ইত্যাদি। ভগবানের দয়ায় তাদের দিন ফিরলে টাকাটা সে শোধ ক'রে দিতে পারতো।

পুরুৎমশাই টাকা বা'র ক'রে দিয়ে বললেন, এই নিয়ে যাও, তোমার গুরু-জনদের আমার নমস্কার জানিয়ো, বাবা।

টাকা হাতে নিয়ে আন্দ্রে দাঁড়িয়ে রইলো। গাড়ী চলে গেল। পিছন থেকে লক্ষ্য ক'রে তা'র মনে হলো, জীবনে এত বড় নির্বোধ সে কখনো দেখেনি।

রবিবারটা কী আশ্চর্য! কত উত্তেজনা, প্রাণের কী উত্তাপ সে অনুভব করেছে এই দিনটিতে। টাকাটা নিয়ে আন্দ্রে কিন্তু বড় লজ্জিত হোলো। সোমবার টাকাটা সে ফেরৎ পাঠালো। সে ভাবলো, পুরোহিতের মুখের চেহারাও ত' সে বদলে দিতে পারে! আচ্ছা, আর একদিন করা যাবে।

এদিকে মায়ের চোখে স্রধুই শাসন, মামা একটা কথাও বলে না। খাবারে আর রুচি নেই, বিস্বাদ লাগে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আন্দ্রে কেবল চেয়ে থাকে ওই উপত্যকার দিকে। সে যেন নিয়মের ব্যতিক্রম, কারো সঙ্গে তা'র খাপ খাবে না। ওদিকে সেই জেলেরা ফিরে এলো। মাছের তেল গালানো চলছে, তা'র ধোঁয়া দেখা যায়। পাহাড়ে পাহাড়ে তা'র গন্ধ। লোকেরা যেন পিঁপড়ের মতো আনাগোনা করছে। যেন কোথায় রয়েছে একটা পিঁপড়ের স্তূপ। ধরো, একটা ছড়ি দিয়ে যদি আন্দ্রে সেই স্তূপের ওপর একটা খোঁচা দেয়! সেগুলো চঞ্চল হ'য়ে ওঠে নাকি? ওঠে বৈকি!

একদিন সে ঠিক তাই করলো। ওখানকার হাকিমের কাছে সে নালিশ জানালো, ধাত্রীর ছোট মেয়েটা গাঁয়ের মোড়লের মতন ঠিক দেখতে হয়েছে, এটা সন্দেহজনক! অথচ খাতায় লেখা হয়েছে, শিশুটির বাপ অন্য একজন! এর মানে কী? দরখাস্ত পাঠাবার আগে সে কয়েকজন লোককে ডেকে তা'র নালিশের মর্ম পড়িয়ে শোনালো।

তারপর ফিরে এসে চোখ বুজে সে ভাবলো, কেমন হয়েছে! এবার কলঙ্কটা ঘুরে বেড়াক দরজায় দরজায়। বুড়োরা বাতব্যাধী নিয়ে ঘুরুক এই জনরব নিয়ে। কেমন মজা?

সে স্তবপাঠ করতে লাগলো। মা আড়চোখে চেয়ে নিশ্বাস ফেলে বললে, হা ভগবান!

অতঃপর অপকলঙ্ক প্রচারের অভিযোগে আন্দ্রেকে দায়ী ক'রে তা'র ওপর শমন জারী করা হোলো; আন্দ্রে সাক্ষীসাবুদের জন্য গ্রামের সর্বত্র ঘুরতে লাগলো। মোকদ্দমার কেলেঙ্কারী শুনে সবাই হতচকিত। লোকেরা হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারলো না—কিন্তু যাই করুক তা'রা আন্দ্রের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করলো। সবাই তা'র দিকে হাঁ ক'রে তাকায়। সে নিজেকে বিশেষ একটা অভিনব কিছু ব'লে ভাবতে লাগলো। এই সময়টায় সে ভোল্‌টেয়ারের ঘটনাগুলি পাঠ করছিল; তা'তে ছিল ভোল্‌টেয়ার একবার হাকিমদের রাজা ও রাজন্যদের জনসমাজে অভিযুক্ত করেছিলেন। সেই ছবি ভেবে আন্দ্রে অভিভূত হ'য়ে উঠলো। ভোল্‌টেয়ারকে সে অনুসরণ করলো, অনুকরণ করলো—তার মতো হয়ে উঠলো। হে প্রিয় জনসাধারণ, দাঁড়াও, অপেক্ষা করো। কত অন্যায় ঘটে আছে, এবারে তা'র প্রতিকার হবে। সহসা সে একটা চিঠি লিখলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। জানালো এই জেলার ডাক্তার একটি প্রসূতিকে হত্যা ক'রে বসেছে। গির্জার ভিতরকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে প্রধান পুরোহিতের কাছে চিঠি দিয়ে বসলো। অবশেষে লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে রাজপথের উপর একটা মারামারির অভিযোগ ক'রে সে পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন জানালো।

সবাই শশব্যস্ত। লোকের চোখে ঘুম নেই। আগামীকাল আবার কি উৎপাত ঘটবে কেউ জানে না।

এমনভাবে যে-ব্যক্তি সকলের কাছে খ্যাতিমান হোলো, সে কি তালিমারা পাজামা প'রে পথে বেরুবে? কিছুতেই না। আন্দ্রে তা'র রবিবারের

পোষাকটা প্রত্যেকদিনই চড়িয়ে বেরুতে লাগলো। হঁ্যা, ভোল্‌টেয়ার পরতেন একটা অদ্ভুত কাটুনির জামা, আন্দ্রেকেও তাই পরতে হবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। বুড়ো পুরুতের মৃত্যুর পর তা'র জিনিসপত্র নিলামে উঠলো। আন্দ্রে গিয়ে নিলাম ডেকে কিনে আনলো পুরনো নীল রংয়ের আলখাল্লা—সেইটে গায়ে চড়িয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে সে হেলে দুলে চললো গির্জার দিকে—সে যেন মহামাতব্বর,—সে যেন গ্রামের নৈতিক চরিত্র পাহারা দিয়ে বেড়াতে চায়। সবাই বলে, ওই যে, ওই যাচ্ছে!

এমন একজন ব্যক্তি কিছু একটা বিনা উপাধি ছাড়া বাঁচতে পারে? অতএব শিগগিরই তা'র নাম হোলো এজেণ্ট আন্দ্রে।

'কিসের এজেণ্ট?'—এই প্রশ্ন করতেই সে বলে, জানো না বুঝি? চার চারটে আমেরিকান জাহাজের!

কেউ বলতে পারে সে মিথ্যা বলছে? নিজের বাড়ীর দেওয়ালে সে ছাপা কাগজ লটকে দিল। তা'তে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ছিল বৈকি।

কিন্তু তা'র মা একদিন খালি হাতে দোকান থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো। কি ব্যাপার? এক পোয়া কফি সে দোকান থেকে ধারে পায়নি। তা'র বদলে সবাই তা'কে বিদ্রূপ করেছে, গালমন্দ দিয়েছে! সবাই বললে, ছেলে অতবড় এজেণ্ট, পয়সা দিতে পারে না?

আন্দ্রে সমস্ত রাত জেগে জেগে ভাবলো। পরদিন সে নগরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো। আর কিছু নয়, সে যে জলজ্যান্ত একটা পুরুষ, একথা গ্রামের লোককে বেশ ক'রে চোখ ফুটিয়ে জানিয়ে দিতে হবে।

পা[illegible]—৩

শহরে সে আগেও এসেছিল, তখন সে ছোট্ট,—মায়ের সঙ্গে একটা ডিমের ঝুড়ি বয়ে এনেছিল। এখন তা'র চোখ বদলেছে। সে যেন শহরকে দেখছে দূরের থেকে—যেমন উপর থেকে উপত্যকাকে দেখা যায়। ওই শহর, এই সে। সভ্যভব্য লোকরা বুঝতে পারছে না তাকে। না বুঝুক, সেও যে ওদের মতো একজন কেউ-কেটা—এটা যেমন ক'রেই হোক সে বুঝিয়ে দেবে,—অন্তত রসচ্ছলেও।

বড় বড় জম্‌জমে দোকানের জানলায় জানলায় সে হাল্কাচালে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়! থাক্‌, মায়ের অসুখের মিথ্যে গল্প নিয়ে ঢোকার দরকার নেই, ভোল্‌টেয়ারের বিশ্বশান্তি প্রচারকের ভূমিকাও থাক্‌। তা ছাড়া বুড়ো পুরুতের আলখাল্লাটা আবার সে সঙ্গে আনেনি। তা'র গায়ে এখন খদ্দরের পোষাক—বরং সে যদি এখন একজন অবস্থাপন্ন কৃষকের আত্মমর্যাদা দাবী করে, সেটা মানানসই হবে।

তা'র বুকের মধ্যে দুরু দুরু করতে থাকে। তবু, সে রোমার কোম্পানীর মস্ত দোকানের চওড়া সিঁড়িতে পা ফেলে উঠতে লাগলো। উঠেই একদম দোকানে। অদ্ভুত বটে—কফি থেকে জুতোর কাঁটা এখানে সব মেলে দেখা যায়! বাস্তবিক, বুড়ো রোমারের কত কাহিনী সে শুনেছে! বুড়ো দাঁড়িয়ে থাকতো তা'র দরজায়, জেলে নামতো দূরে তাদের ছিপ থেকে। যদি কোনো হতভাগা শূন্য ঝোলা নিয়ে ফিরে যেতো, বুড়ো অমনি ডেকে বলতো, "ওই, ওরে, ময়দা চাস্‌ বুঝি? আয়, আয়, আমি চারটি দিচ্ছি,

নিয়ে যা, হতভাগা !”—জেলেরা বুড়োর কত বাধ্য ছিল! বুড়ো বলতো, “হেঁ, হেঁ, বাবা—মেয়ে আর পুরুষ-মানুষের যা দরকার—সব, সব পাবে আমার এই দোকানটিতে। যাবে কোথা!” একবার একটা ছোঁড়া বুড়োর সঙ্গে তামাসা করতে গিয়ে চেয়ে বসলো এক ডজন বোতামের ঘরা—বুড়ো একটু দমলো না! বরং দোকানের লোককে ডেকে বললে, ওহে, দেখোত, বোতামের ঘরাগুলো কোথায় আমরা রাখি?···এমনি একটা লোককে আন্দ্রে মনে মনে কল্পনা ক’রে নিল।

দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলো, কর্তা কোথায়?

ছোকরা মুখ তুলে তা’র দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। পরে বললে, এইদিকে—

একটা দরজা খুলে গেল। ভিতরে অল্প আলোকিত এক কক্ষে দুটি লোক ব’সে ছিল। সামনে তাদের দুটো বাক্স, দুজনের মধ্যে একজন বুড়ো, একজন ছোকরা। ওরা চোখ তুলে তাকাতেই আন্দ্রের মনে হোলো সে যেন কী একটা নতুন মানুষ। সে বিজ্ঞ হ’য়ে উঠলো, বিজ্ঞের মতো দাঁড়ালো।

কি চাই?

এই বুড়োই বুঝি রোমার,—এই নাকিসুরের কণ্ঠস্বরই। আন্দ্রে নিজের পরিচয় দিয়ে বললে, জিনিসপত্র সে দেখতে চায়। আজকাল কৃষকদের অবস্থা মন্দা, খাজনা বাড়ছে, লোকেরা মাইনে চায় বেশী,—আকাশের অবস্থাও অনিশ্চিত। চাষবাসের কাজের সঙ্গে একখানা দোকান সে খুলবে মনে করেছে!

চাষবাস অনেক বেশী বুঝি?

না, না, তেমন কিছু নয়। বিশ তিরিশটে গরু, গোটা পাঁচ ছয় ঘোড়া—টায়ে-টুয়ে এদের খাওয়া চলে। তবে কিনা শরীর জল ক'রে খাটলে সময়টা ফিরতে পারে, এই আর কি।

কোথা থেকে আসছ ?

আন্দ্রে জবাব দিল। কিছুক্ষণের জন্য তা'র মনে হোলো, তা'র খোলসটা যেন ছাড়ানো হচ্ছে, তা'র কথাগুলো মেপে জুপে ওজন করা হচ্ছে! পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখছে—মাথার টুপি থেকে তা'র পায়ের জুতো পর্যন্ত! তা, দেখলেই বা। লোকটা বিক্রেতা আর আন্দ্রে হোলো ক্রেতা—এই ত! এত' সোজা-সুজি, পরিষ্কার! আন্দ্রে নিবিড় ভাবে অনুভব করলো, সেই মুহূর্তে সে নিজে একজন অবস্থাপন্ন চাষী—তা'র সমস্ত জীবনে চাষী ছাড়া সে আর কিছু নয়!

নতুন কারবারীদের সঙ্গে বুড়ো রোমারের ধরণ ধারণ বেশ মজার। প্রথমে গালমন্দ দিয়ে ভূতছাড়া করতো, কিন্তু তাই দেখে যদি কেউ চ'লে যায়—তবে সেটা হবে মস্ত ভুল। তারপর যদি একবার এঁদোপড়া ঘরখানায় কেউ ঢোকে, আর সে বেরুতে চায় না।

তাই নাকি? তা'হলে একখানা দোকান করতে চাও তুমি? বয়স কত?

আন্দ্রে একটু আড়ষ্ট হ'য়ে উঠলো। পরে বললে, আমি আমার ঠিকুজি সঙ্গে আনিনি।

পরস্পর চোখ চাওয়া চায়ি—সবাই চুপ।

আবার প্রশ্ন হোলো, নিজের সম্বন্ধে তোমার অনেক বড় ধারণা, কি বলো? অ্যাঁ? ব্যবসা করতে চাও? তোমাদের ওখানকার ফয়েদের সঙ্গে পেরে উঠবে? তারা মুরগীর খোপের মতন দোকান দেয়, ক্ষুদে মহাজনের

কাছে মাল কেনে নগদ্‌দা, আর বড় বড় মহাজনদের কাছে ধারে কেনে—তারপর বছরে দু'বার দেউলে হয়। অ্যাঁ? তারপর আমরা যখন কান ধ'রে টেনে আনি, তখন ধার্মিক সাজে, প্রার্থনা-সভা করে। অ্যাঁ? বলো তারা নিপাতে যাক্! তোমার দোকান ফেল্ হ'লে নগদ টাকা শুধবে ত? অ্যাঁ?

অসহ্য পুলকে আন্দ্রে থর থর করে। সে তিরস্কৃত হচ্ছে মহাত্মা রোমারের কাছে, সে কত বড়। এবার সে একটু শহুরে কায়দায় বলুক। সে বলে, আমি সবার সব পাওনা চুকিয়ে দিই। আচ্ছা, আজ চলি।

না, দাঁড়াও একটু। দু'এক কথা বলেছি, ও কিছু নয়। তুমি দোকানদার হ'তে চলেছ যে!

আমার সব নগদ কারবার। আন্দ্রে বলে।

বলো কি? কিসের জন্য নগদ?

এই সব বাসনপত্র, এটা ওটা।

আমি দেবো সস্তায় সকলের চেয়ে। ব্যবসায় যদি দাঁড়াতে চাও, এক জায়গা থেকেই সব মাল কিনো। বুঝলে, সব মাল! তবেই উভয় পক্ষের কাজ ভালো চলে।

কিন্তু যদি সমুদ্রের চুনোমাছ বেচি?

চুনোমাছ? এ সময় কোথা? কি বলছ?

কথাটায় প্রতিবাদ উঠবে, আন্দ্রে ভাবেনি। সে ভড়কে গেল।—সে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ ক'রে বললে, হ্যাঁ, চোরাই মাল নয়! এই সম্প্রতি কতকগুলো জালে পড়েছে। খুব বেশী নয়, গোটা পঞ্চাশেক পিপে মাপের।

দাঁড়াও, পাগল কোথাকার। যাচ্ছ কেন? এসো, চুরুট ধরাও একটা।

ধন্যবাদ, ধূমপান করিনে।

তবে এক গেলাস পোর্ট—? এসো, একটা চুক্তি হয়ে যাক্। বসো ওই চেয়ারটায়। পোর্ট খাওনা?

কী চতুর ওর চোখ! প্রশ্নের আড়ালে মানুষটার কী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! আন্দ্রে বললে, না থাক্—

আবার চুপ। লোকটা এদিক ওদিক ঘুরে ওকেই লক্ষ্য করছে। আন্দ্রের সংযম যেন ওর শ্রদ্ধাকেই বাড়িয়ে তুলছে।

তা'হলে তোমার চুনোমাছের কারবার? তুমি যেখানে থাকো সেখান থেকে জেলের সঙ্গে ব্যবসা করা বুঝি খুব সুবিধে?

আন্দ্রে সম্মতি জানালো। আরাম কেদারায় সে বসা, লোকটা ঘুরছে তা'র চারদিকে। সে আন্দ্রে নয়, সে রোমার,—তাকে যেন পরীক্ষা করা চলছে। অনেক বেকুব আছে সংসারে কিন্তু মদভাঙ খায় না, এমন লোক কম। এ ছোকরা যদি সাধু হয়, তবে খদ্দের হিসাবে ভালো হবেই। যদি অন্যত্র চলে যায়, রোমার কোম্পানীরই ক্ষতি। জামিন কিম্বা পরিচয়-পত্র চাইলে হয়ত বা হাতছাড়া হ'য়ে যেতে পারে। তাছাড়া কৃষকরা বড় আত্মাভিমানী!

বুড়ো বললে, ওহে, হানসেন, যাও ত—এ কি চায় দিয়ে দাওগে। তাহলে ওই কথাই রইলো—শহরে যখন চুনোমাছ আনবে, আমার কাছেই আনবে। একটা লেখাপড়া করো দেখি!

সন্ধ্যায় একটি পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা। সে বীয়ার খাওয়াতে চাইলো। আন্দ্রে বললে, ধন্যবাদ, না। এক প্রকার মাদক সে আবিষ্কার করেছে, সেটি সূর্যরশ্মির মতোই স্বচ্ছ। রোমারকে সে নাচালো, ঘোরালো,

ধমকালো, সতর্কভাবে উপদেশও দেওয়ালো—কিন্তু রোমার তা'র কাছে প্রতারিত! ঈশ্বরের দিব্যি, কী গভীর ভাবেই প্রতারিত হোলো! আন্দ্রে ভাবতে থাকে, সোনার বরণের মেঘ চলেছে উত্তর বাতাসে তাদের সেই কুটীরের ওপর দিয়ে। সে চলেছে সেই একখানি মেঘের রথে চ'ড়ে। যাক্, এবার একটু শোবার যায়গা, একটু ঘুম—আর সে দাঁড়াতে পারেনা।

কয়েকদিন পরে একখানা ষ্টীমার তাদের উপত্যকার ঘাটের কাছে এসে থামলো। ঘাটের চারদিকে একদল লোক দাঁড়িয়ে কি যেন বলাবলি করছিল। শহর থেকে তাদের কাছে টেলিগ্রাম এসেছে—তারা এখানে থাকতে বাধ্য।

একজন বললে, মামলার খবর কিছু জানো?

অপরজন বললে, গালমন্দ ছাড়া আর বিশেষ কিছু হবে না। কিন্তু হ্যাঁ—সেই যে জংলী ছেলেটা······সেই যে পাগ্‌লাটা—তা'র জেল এবার হবেই। যাছাধন যাবে কোথা!

ষ্টীমার থেকে খেয়া নৌকা এসে ঘাটে ভিড়লো, এবং সকলের আগে যে লাফিয়ে ঘাটে নাম্‌লো, সে আন্দ্রে!

হোমরা-চোমরা পোষাক আসাক তা'র পরণে—যেন মস্ত একজন আইন-জীবি। সঙ্গে নামলো বস্তা-বস্তা আটা ময়দা, কতকগুলো মাল বোঝাই বাক্স, জিনিসপত্র, এটা ওটা—চাষের সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি—অসংখ্য, অগণ্য। প্রত্যেকটি মালের উপর লেখা—"আন্দ্রে বার্জেট, মহাজন!" ওরা মুখ চাওয়া চাযি করতে লাগলো—অবাক, আশ্চর্য! তাদের চমক ভাঙলো, যখন আন্দ্রে হুকুম করলে, ওহে, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকোনা, নাও, জিনিসপত্রগুলো মাল-গাড়ীতে তোলো!

ডাকপিওন ছোকরা জিজ্ঞেস করলো, টমটম গাড়ীখানা কি হবে?

আন্দ্রে বললে, ওঃ ওখানা আমি নিজে চালিয়ে বেড়াবো।

যেন সে কত সৌখীন, কত সম্ভ্রান্ত। ঘোড়ার রাশ ধ'রে সে গাড়ী ছাড়লো। পিছনে তা'র প্রকাণ্ড সমারোহ, মস্ত শোভাযাত্রা। লোকেরা অবাক, ছুটোছুটি করতে লাগলো এঘর ওঘর, দাবানলের মতো উত্তেজনা ছড়ালো। ছেলে-বুড়োরা পায়ের জুতো হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলো সেই দৃশ্য দেখার জন্য, ঘরে ঘরে জানলা খুলে গেল। চারদিকে কৌতূহলী চক্ষু। আন্দ্রে গাড়ীতে ব'সে রয়েছে শান্ত গাম্ভীর্যে, কিন্তু মনে মনে সে যেন উড়ে চলেছে সোনার মেঘের ভেলায় চ'ড়ে। তাকে যারা সহ্য করতে পারেনি, ছোট ক'রে দেখে এসেছে এতকাল, তারা স'রে যাক্। পাহাড় সুড়ঙ্গের কাছাকাছি এসে সাধারণ লোকরা সাইকেল অথবা অন্যান্য পা গাড়ী থেকে নেমে বড় লোকদের গাড়ী পেরিয়ে যাবার পথ ছেড়ে দেয়। আন্দ্রে স্থির হয়ে ব'সে রইলো। পরে গুন-গুন ক'রে সে গান ধরলো যাতে ওরা সবাই শোনে।

ঘরে মা বিড়বিড় ক'রে কি যেন অভিযোগ জানায়। ভাঁড়ার ঘরে খাবার সামগ্রী ফুরিয়েছে। মামা তামাক খেতে পায়না, দড়ির আঁশগুলো শুকিয়ে দোক্তার মতো চিবোয়। এর জন্যে আন্দ্রেই দায়ী। তা'র জন্যে যত কিছু দুর্ভাগ্য।

আরে, ওসব কি?—মা জানলার বাইরে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো—এ কি সম্ভব?

দুজনে তাকালো। পথের বাইরে মস্ত শোভাযাত্রা। এই বন-গাঁ দেশে এত মাল পত্র কোনদিন আসেনি! সেই মিছিলের পিছনে পিছনে আসিছে দেশসুদ্ধ ছেলে-মেয়ের দল।

বড়লোক নিশ্চয়ই—বুড়ি বললে, জিনিসপত্র সবই ওঁর।

আইভার বললে, হ্যাঁ, বেশীর ভাগই ময়দা—কিন্তু ওসব যাচ্ছে কোথায় ?

এ কি ! তাদের দরজার কাছেই এসে থামে যে ! আগে টমটম খানা, পিছনে মালগাড়ীর দল—এ কি, এ যে তাদের উঠোনের মধ্যেই এসে ঢুকলো। উত্তেজিত কম্পিত বৃদ্ধ ভাই-বোন কাঠের বাক্স ধ'রে থর থর ক'রে যেন কাঁপতে থাকে।

মামা বললে, এ যদি আন্দ্রে না হয় তবে আমার নাম বদ্‌লে দিয়ো।

অবাক কাণ্ড। এই বুন-গাঁ মুলুকে—যে দেশে কোথাও যান-বাহন নেই—এখানে আন্দ্রে দোকান খুলবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ছোট বাড়ীটি সোরগোলে ভ'রে উঠলো। এত বড় ব্যবসায়ীর এত মালপত্র এই ছোটট্টুটি ঘরে ধরবে না। ভাগ্যি গরম কাল। গরুটাকে রাখা গেলো যেমন তেমন ক'রে। শুয়োরটা আর মুরগীগুলোকে কাটা হোলো! জায়গা বেশী দরকার—সব মাল ধরাতে হবে।

অবশেষে শোবার ঘর হ'য়ে উঠলো দোকান ঘর। বুড়ো ভাই বোন হাতে স্বর্গ পেলো। সবটা এমনি আকস্মিক যে, তাদের মাথার ঠিক রইলো না। রোজ সকালে উঠে প্রথমটা তারা যেন হতচকিত হ'য়ে যায়—যেন সবটাই স্বপ্ন! আন্দ্রে ছেলেটা আর কিছু না হোক্ সত্যিই মহৎ।

আন্দ্রে মাকে উপহার দিল শেলাইয়ের কল,—আর মামা? তিনি যা চাইবেন তাই পাবেন। প্রতি রবিবারে গাড়ী আসে, তা'রা গির্জায় যায়। মা নিল নিজের পছন্দসই সর্বশ্রেষ্ঠ শালখানি।

আন্দ্রের দোকানে জিনিস কিনতে লোক আসে। যাতে বিক্রি বেশী হয় এজন্যে আন্দ্রে প্রত্যেক খদ্দেরকে ধ'রে কাফি খাওয়ায়। কত ভালো দোকানদার সে, কত দড়। যারা ধারে মাল কেনে, আন্দ্রে তাদের নাম

খাতায় লেখে না। সুধু খড়ি দিয়ে দেয়ালে দাগ টেনে রাখে। কিছুদিন পরে দেখা যায় দেয়ালে আর জায়গা নেই, এত দাগ কাটা—কিন্তু কোন্‌টা ময়দা, কোন্‌টা চিনি অথবা কফি—সব গোলমাল হ'য়ে যায়। কার কাছে কি বাবদে কত পাওনা—কে জানে। যাকগে, ওসব ঠিক হয়ে যাবে।

সবাই এলো একে একে, এলো না শুধু জোনেটা। আন্দ্রে কিছু বিমর্ষ হ'য়ে থাকে। অবশেষে নিজেই গেল সে একদিন। তা'র হাতে একটি শেলাইয়ের কল।

রাত্রের দিকে জোনেটা সবে মাত্র খাবার টেবিলের ধার থেকে উঠে যাচ্ছে, এমন সময় আন্দ্রের প্রবেশ।

এই যে জোনেটা, ভালো ত? এইটি তুমি নাও, তোমার জন্যে উপহার —আমাদের ছোটবেলাকার স্মৃতিচিহ্ন!

যারা আশপাশে খেতে বসেছিল, তা'রা বিস্ময়ে হতবাক! আন্দ্রে নিজের কাজ সেরে জমিদারী চালে মাথা উঁচু ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

দেখতে দেখতে সেই মিথ্যা কলঙ্ক প্রচারের মামলার দিন এলো। সেদিন আন্দ্রে একজন প্রধান ব্যক্তি বৈ কি! সে একজন মহাজন—প্রতিপক্ষরা একটু ভয় পেলো সন্দেহ নেই। আন্দ্রের তরফের সাক্ষীরা বেশ উৎসাহিত। তাদের বেশ যেন মনে পড়ছে মোড়লের সঙ্গে ধাত্রীর লুকিয়ে দেখাশোনার দৃশ্য। ধার্মিক যারা তারা আন্দ্রের কথায় সায় দিতে লাগলো। তারা বলে, হাঁা, গির্জায় মন্ত্র পড়তে গিয়ে পুরুৎ মশাই ভুল করতো বৈ কি। প্রার্থনাগুলো যেন ভগবানকে ব্যঙ্গের মতো শোনাতো। হাঁা, আন্দ্রের অভিযোগ সত্য! ইতিমধ্যে লোকের চক্ষে আন্দ্রে মস্ত একজন ব্যক্তি হ'য়ে উঠেছে, কেননা

সে সম্ভ্রান্ত লোকদের আক্রমণ করছে, এত' কম কথা নয়! সাহস হবে না কেন বলো? এমনি সময়টায় আন্দ্রে পথে বেরুলে ছেলেরা টুপি তুলে তাকে নমস্কার জানাতে থাকে।

এমন দিনে ঘটনার গতি ঘুরে দাঁড়ালো। মাস দুই পরে খানচারেক গাড়ী সঙ্গে নিয়ে কয়েকজন লোক এসে দাঁড়ালো তাদের দরজায়। কই, আন্দ্রে কোথায়? হ্যাঁ, ওই যে—এসো, বেরিয়ে এসো।

আরে, মিস্টার রোমার, হেরিং, মিস্টার স্কোয়ার—নমস্কার, তারপর? কি খবর?—আন্দ্রে এসে সহজভাবে দাঁড়ালো। যেন কিছুই হয়নি, ভাবখানা এই।

রোমার দাঁড়ালো সোজা হয়ে—মুখখানা রাঙা। তারপর কি যেন ফেটে উঠে বলতে লাগলো, বুড়ো ভাই বোন বুঝতে পারলো না। যখন ব্যাপারটা বুঝলো, তা'রা দেয়াল ধ'রে দাঁড়ালো। রোমার চীৎকার করছে, ঘুষি পাকাচ্ছে, হাতে হাতকড়া দিয়ে যাবজ্জীবন কারাবাসের ভয় দেখাচ্ছে। তারপর তারা ডাকলো ষণ্ডাগুণ্ডা গাড়ীওয়ালাদের। বললে, মাল সব তোলো!

দেখতে দেখতে যেন দস্যুরা সব দোকান খালি করতে লাগলো। রোমার সব দেখাতে লাগলো, রাগে লাফাতে লাগলো, নাচতে লাগল আগুন হ'য়ে। যেন বন্য জানোয়ার, তা'র একরাশ দাড়ি যেন কেশরের মতো ফুলছে বারবার।

আর সব মাল কই?—দেখি তোমার ক্যাস বই! রোমার আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

হা ভগবান, মাত্র ছ'টাকা বিক্রি! সে বিশ্বাস করলো না, আন্দ্রেকে সঙ্গে নিয়ে ঘর দোর গোয়াল সব খোঁজ করলো, কোথাও কিছু নেই।

এর মানে কি ?

আন্দ্রে বললে, ধারে কারবার !

রোমার আবার চেঁচায়। ক্লান্ত হ'য়ে মামা ব'সে রইলো দোক্তা মুখে, চৌকিদার পাইপ ধরালো !

যতগুলো গাড়ী এসেছিল, তার একখানায় মাত্র মাল ভরলো, বাকি গাড়ী খালি চললো। ছেলে মেয়ে, বুড়ো, যুবা, পাড়ার সবাই ইতর ভদ্র—সকলে কেলেঙ্কারী দেখতে লাগলো। আন্দ্রের এবার আর রক্ষা নাই—হায় রে হতভাগ্য ! তারপর শূন্য দোকানে তালা পড়লো—ভিতরে কেবল রইলো ছেঁড়া কাগজ আর পুরনো জুতো। চৌকিদার বললে, "প্রত্যেকদিন বেলা বারোটায় আমার আপিসে যাবে, নৈলে এইখান থেকে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হবে।" কী স্পর্দ্ধা তা'র ! আন্দ্রে এক সময় গরম হ'য়ে জানালো, এসব বে-আইনী, আমিও জানি মামলা করতে।

বেশ।—এই ব'লে চৌকিদার রোমারের দিকে একবার তাকালো। দুজনের মধ্যে কি যেন কথা হ'য়ে গেল।

আন্দ্রে বললে, আচ্ছা, চলি—

মা বললে, এসো তোমরা !

তিনজন পরস্পর মুখের দিকে তাকালো—মা, মামা আর আন্দ্রে। শূন্য ঘর, চারদিক শূন্য ! সামনের মাঠে যে ঘাস গজিয়ে ছিল, সেগুলিতে গরুর জাব দেওয়া যেতে পারতো, কিন্তু ঘাসগুলি এসে খেয়ে গেল কোন্ ভিন্ দেশী একদল ঘোড়া। সত্যিই, আন্দ্রের চক্ষে কান্না এলো। কিন্তু যখন গোলমাল আরম্ভ হোলো, তখন বুড়ো মা আর মামার মুখের দিকে চেয়ে থাকা কী নিবিড় অভিজ্ঞতা ! রোমারের মুখে চোখে নাগরিক হিংস্রতা—মাতার দিকে

থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো আকাশের দিকে—কি চক্ষু! আর মামা—মামা যেন শূন্য থেকে অগাধ নীচে প'ড়ে গেছে!

বুড়ো এক সময় থুতু ফেলে জানলায় উঁকি মেরে বললে, শোবার ঘরেও ঢুকতে পাবো না?

না, শোবার ঘরটাও দেউলে হ'য়ে গেছে!

মা বললে, কিন্তু রান্না ঘরটা?

আন্দ্রে বললে, হঁ্যা, রান্নাঘরটা আর ওই ঘরটা নিতে পারো।

—সে যেন এরই মধ্যে সহজ হ'য়ে গেছে, যেন তা'র মনে কোথাও কিছু দাগ লাগেনি। তা'র আনন্দ, মুখ থেকে তা'র বন্দনা গান নিঃসৃত হচ্ছে। বুড়ো মামা কেবল তা'র পুরনো জুতো জোড়ার জন্য গোঁজ গোঁজ ক'রে বেড়াতে লাগলো।

শরৎকালের দিকটায় আন্দ্রের বিরুদ্ধে চার চারটে মামলা ঝুলতে লাগলো। ভারি মুস্কিল। তার স্বপক্ষের সাক্ষীরা একে একে স'রে পড়লো। রোমারের মামলা পরিষ্কার,—আন্দ্রের দেউলে হওয়া কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশেষে যখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হিসাব নিকাশের দিন আসন্ন হ'য়ে এলো, আন্দ্রে শহরের দিকে যাত্রা করলো। কয়েক মাস আর তা'র খোঁজখবর পাওয়া গেল না।

পরিচ্ছেদ—৪

বুড়ো মা অনেক কষ্টে দারিদ্র্যের ওপর আবরণ টেনে কোনো প্রকারে দিন চালাচ্ছিল, অবশেষে দুঃখ আর অভাবের তাপে জ্ব'লে জ্ব'লে একদিন বুড়ি মারা গেল। মৃতের সৎকারের সময় আন্দ্রে এসে পৌছল। ইতিমধ্যে আবার তা'র ভোল ফিরেছে। একমুখ ঝোলা দাড়ি, সোনার ঘড়ি,ঘড়ির চেন—যেন মস্ত জমীদার। সোনার আংটি তা'র আঙুলে দেখে সকলের কী কানাকানি। লোকগুলোর মুখের কী চেহারা, কী মুখের কাটুনি—বাস্তবিক, অবাক হ'য়ে তাকালে তাদের মুখের ভঙ্গী কী রকম যেন হয়ে ওঠে।

মায়ের শেষ কাজ সেরে আন্দ্রে চ'লে গেল। ছ'মাস নিরুদ্দেশ। পরে আবার যখন ফিরলো, দেখে মামাও ইতিমধ্যে মরেছে। ঘরদোর কিছু নেই,—ঘোড়াগুলো অদৃশ্য। চারদিকে শুধু ধ্বংস আর এলোমেলো জঞ্জাল। আন্দ্রে একখানা পাথরের টুকরোর ওপর ব'সে ভাবতে থাকে।

অনেকবার সে উঠে দাঁড়াল যাবার জন্য, আবার বসলো। কয়েকদিন পর তাদের ঘরবাড়ীতে সহসা আগুন লাগলো। চৌকিদার ছুটতে ছুটতে এলো। তা'র কিছু বুঝতে বাকি রইলো না। আন্দ্রের বিচার হোলো,—কিন্তু আন্দ্রে প্রমাণ ক'রে দিল সে বাড়ী ছিল না।

দুরবস্থার মধ্যে আন্দ্রের দিন কাটে। কেউ তাকে কাজ দিতে চায় না,—মনের ভিতরেই কোথায় যেন সে কেমন ভাবে বাঁধা রয়েছে,—সে যেন এই জঙ্গল থেকে নিজেকে হিঁচড়ে বেরুতে পারে না। হাতে সেই সোনার আংটিটা নেই, পকেটে কিছু নেই, বিক্রি করার কিছু নেই—বিনা নিমন্ত্রণে লোকের বাড়ী গিয়ে পাত পাতাও যায় না,—সুতরাং এভাবে অসম্ভব।

কিছু একটা করা চাই বৈ কি। কিন্তু কি? একদিন সে তা'র পুরনো মাস্টারের কাছে গেল, তা'র কাছে বস্‌লো, সে লোকটা গরীব ছাত্রদের অভিভাবকদলের নেতা। আন্দ্রে হঠাৎ তা'র কাছে ব'সে বিষম কাশি কাশতে লাগলো; বললে, তা'র বড্ড শরীর খারাপ, এবং শরীর থেকে রক্তপাত ঘটে। বুড়ো মাস্টার মশাই দয়াপরবশ হ'য়ে এখানেই কোথাও তা'র আহার ও বাসস্থানের চেষ্টা ক'রতে লাগলেন।

কিন্তু জনসাধারণের ঘোরতর আপত্তি। সমস্ত পল্লীর সে আতঙ্ক, ছেলে-মেয়েরা পালায় তাকে দেখে। অবশেষে একটি লোক তাকে জায়গা দিল। লোকটি পাকা চুল, বিজ্ঞ,—এই সমুদ্রের খাঁড়ির কাছেই তার জমিজায়গা। লোকটা কারো ধার ধারে না, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি নিয়েই থাকে। অনেকে বুড়োকে বললে, আর তোমার রক্ষে নেই। নিজের ঘর নিজের দোষেই জ্বালিয়ে হুড়মুড় ক'রে ফেলতে চাও কেমন?

বুড়ো বললে, না গো না, ঘর আমি তুলেই ধরবো, দেখো।

ভয়ে থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীর গিন্নী জানলায় উকি মেরে দেখলেন, কেমন ভাবে আন্দ্রে এসে ঢোকে।

বুড়ো তা'র হাত ধ'রে বললে, এসো হে, এসো।

বুড়ো যেন আন্দ্রেকে বাড়ীর চাকরের মর্যাদা দিয়ে তা'র আত্মসম্মান বোধকে জাগিয়ে তুলতে চায়।

তা বেশ, আরম্ভটা মন্দের ভালো। আন্দ্রে চায় শিখতে চায়,—এবং শিগগিরই বাদামে রংয়ের দুটো ঘোড়ার পিছনে পিছনে এগিয়ে বলে, হট্—টি-টি! লাঙলের ফলায় জমির মুখখানা আঁচড়ে নতুন চেহারা বেরোয়। সে যাই হোক, ঈশ্বর জানেন সে ভদ্রজীবনই যাপন করছে। বেশ, এখানেই

থাকো! কেউ তাকে দেখলে এই কথাই বলবে। লাঙ্গলের কাজ থেকে মুখ তুলে মাথার টুপি সরিয়ে এদিক ওদিক তাকায়। না, কেউ কোথাও নেই। এ তা'র নিজেরই যেন প্রতিধ্বনি।

অপরূপ শরৎকাল। উপরে রাঙা আকাশ, নীচের পাহাড়ের গায়ে ফুটেছে সোনার মতো লতাপাতা,—কী নিবিড়, কী শান্ত, কী উজ্জ্বল! পরিচ্ছন্ন শুষ্ক বাতাস ঢেউ দিয়ে চলেছে।

উপরে নিশ্চল মেঘ, নীচে আন্দ্রে দাঁড়িয়ে নিশ্চলভাবে। সে সবিস্ময়ে ভাবে, মানুষ তা'র সেই একই পুরনো চেহারা নিয়ে একই ভাবে কেমন ক'রে বাঁচে, কেমন ক'রে নিজেকে সহ্য করে বছরের পর বছর? সেই লফো-টেনের দিকে যাওয়া, সেই ফিরে আসা, সেই একই জমিতে ভূতের মতো জ করা,—আর সেই একই স্ত্রীর সঙ্গে একই ভাবে বকাবকি করা! কী একঘেয়ে, কী পুনরাবৃত্তি! দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ—নতুন অভিনব কিছু নেই। কই, তিলে তিলে একঘেয়েমির হাতে এরা ত মরে না! সেই স্বামী, সেই স্ত্রী—আর কিছু নয়, আর কিছু নেই।

একটা ভাবনা ভূতের মতো তাকে পেয়ে বসেছে,—যদি সে নিজেকে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করে, কেমন হয়? ধরো যদি কেউ এসে বলে, তুমি পুরুতের চেহারা নাও? হ্যাঁ, নিতে সে পারে এক বছরের জন্যে, যাব-জ্জীবন নয়! না, অসম্ভব! যদি বলে, গুরুদেব হও! হ্যাঁ, হ'তে পারে বৈ কি! গীর্জায় গিয়ে বহুলোকের পরিবেশে গুরুদেব আসীন—ভারি চমৎকার মজা! কিন্তু চিরজীবনের জন্য গুরুর চেহারা—অসম্ভব সে বড় ভয়ানক। যদি সে রাজা হয়, হোক—তবে এক বছর, কি দুবছর—যে ক'দিন হতভাগ্য অপরাধীদের শাস্তি মকুব ক'রে দিতে পারে—তত্তাদন।

রাজার চেহারা সহনীয়,—তাতে আনন্দও আছে,—কিন্তু তার বেশী নয়! বলো কী, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাজা হ'য়ে থাকতে হবে,—আর কোন চেহারায় অবতীর্ণ হওয়া চলবে না,—সে যে ভয়ানক কঠোরতা! ছোট বেলায় আন্দ্রে লোকের চেহারার অনুকরণ করতো,—এবার সে বিভিন্ন ব্যক্তির রক্তমাংস নিয়ে বাঁচতে চায়। আজ সে হবে পীটার, কাল সে হবে পল্—তবে ত! পুরোহিতের কাছে সে হবে ভিক্ষুক, রোমারের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে জমীদার হ'য়ে, দেশের কাছে সাজবে মহাত্মা ভোল্টেয়ার—এবং এখন? এখন সে সর্বহারা, এখন সে সমাজচ্যুত। কে জানে হয়ত অনেক নরনারীকে এই প্রকার কষ্টক্লিষ্ট জীবনের মধ্যে থাকতে হ'য়েছে! কিন্তু এই অবস্থাটা আন্দ্রের কাছে এমন কিছু নয়,—এ একটা সাময়িক ওলোটপালটের অবস্থামাত্র। সে যদি কুষ্ঠরোগীর মতো কোনো প্রার্থনা সভায় যোগদান করতে পারে, যদি হাত বাড়িয়ে একটুখানি করমর্দন পায়—তবে কি কম কৌতুক? নিজের মনকে নিজে সে হাসিয়ে তুলতে পারে—এমন লোক কি জগতের মধ্যে একমাত্র সে নিজে?...হ্যাঁ, কি যেন সে ভাবছিল এতক্ষণ! উপরে মেঘের দল, আর নীচে সে নিশ্চল দণ্ডায়মান।

এমনি করেই দিন চলে মন্থর গতিতে—ঘোড়াগুলো সেই একইভাবে লাঙ্গল টেনে চলে।

কেবল রবিবারটা তা'র কাছে একটু চকচকে। নীলরংয়ের জামাটা গায়ে চড়িয়ে হাসিমুখে সে যায় গির্জায়। লোকজন তা'র দিকে একদৃষ্টে তাকায়, সরে যায়।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে আন্দ্রে সহাস্যে বলে, নমস্কার!

কিন্তু কেউ তা'র কথার সাড়া দেয় না!

অবশেষে অবস্থাটা একটু বদলালো। কেউ কেউ সস্নেহে এসে তা'র সঙ্গে মধুর আলাপ করতে থাকে; তাদের ধারণা আন্দ্রের আচার আচরণ সম্প্রতি যে রকম ভদ্র ও মিষ্ট হ'য়ে উঠেছে, এটা শুভলক্ষণ—আন্দ্রে আবার ভালো হবে, মানুষ হবে, তা'র পাপ স্খালন হবে! তা'র অভিভাবক বুড়ো যে আন্দ্রের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে! বুড়োই ত সবাইকে বলেছে, আন্দ্রেকে কলঙ্ক থেকে টেনে তোলা এখন সম্ভব বৈ কি!

কিন্তু হঠাৎ ঘটনার গতি একেবারে লণ্ডভণ্ড। একদিন রবিবারে বাড়ীর গিন্নীর কাছে ধোপদস্ত একটা জামা পাওয়া গেলনা, সেই রাগে আন্দ্রে সেই মহিলাকে একেবারে পঞ্চায়েতে এনে হাজির করলো। স্বামী এই কাণ্ড দেখে একেবারে স্তম্ভিত।

আন্দ্রে আবার বেরিয়ে পড়লো তা'র বাক্সটা কাঁধে নিয়ে। সেই সময়টা নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে নির্বাচন-যুদ্ধ চলছে। এই নির্বাচনের একটি পক্ষের লোক হোলো তা'র পরিত্যক্ত আশ্রয়দাতা লোকটি। সুতরাং তা'র বিরুদ্ধ-বাদী যে লোকটির নাম বার্ঘিম—আন্দ্রে সটান গিয়ে তা'র কাছে আশ্রয় নিল।

এই বেশ। বেশ লাগছে আন্দ্রের। মস্ত বড় জমীদার বাড়ীতে সে জায়গা পেলো। কিছু তাকে করতে হয় না, কেবল বার্ঘিমকে নির্বাচন সভায় সে পাঠিয়ে দেয়। বাড়ীতে অনেকগুলি সংবাদপত্র আসে; আন্দ্রের ভাবখানা এমন যেন সব কিছু তা'র করতলগত। সর্ব বিষয়ের সর্বময় কর্তা সে। বেশ ত, খুব ভালো। কিন্তু আবার দিন দিন কেন তা'র ক্লান্তি আসে, কেন বা অতৃপ্তি! বুড়োর কাছে সে ছিল একঘেয়ে জীবনের অবসাদের মধ্যে! আর এখানে এই বার্ঘিম সাহেবের কাছে? এ লোকটা নিশ্চিত জানে, এ এই

নির্বাচন যুদ্ধে জয়লাভ করবে! লোকটা নিজের নিরাপত্তা ও জয়লাভ সম্বন্ধে এতই নিশ্চিত যে, আন্দ্রে যেন রি রি করতে থাকে।

সর্বশেষে নির্বাচন সভায় সকলেই যখন নিশ্চিত যে, বার্ঘিমের দল অনেক বেশী ভোটে জয়লাভ করবে, সেই সময় সেই সভায় হঠাৎ স্থানীয় চৌকিদার ভীড় ঠেলে এসে ঢুকলো। যেন কী একটা ঘটনা ঘটেছে!

চৌকিদার ঘোষণা করলো, মশাইরা শুনুন, আপনাদের কাছে আমার জানানো কর্তব্য যে, দুইপক্ষের একটি পক্ষ চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে।

চৌকিদারটি বার্ঘিমের বিরুদ্ধ দলের লোক। বার্ঘিম ছিলেন সেই সভার সভাপতি। সভাপতির আসনে ব'সে বার্ঘিম সহসা রাগে ফুলতে ফুলতে ভাবলেন, লাথি মেরে লোকটাকে যদি এখান থেকে তাড়ানো যেতো।

সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, কে—কে চোর?

বার্ঘিম নিজে। চৌকিদার ব'লে উঠলো।

সবাই বিমূঢ় ও স্তব্ধ। বার্ঘিম এখানকার সবচেয়ে বড় ধনী, বড় রাজনীতিক মিশনের সভাপতি, সংযত ব্যক্তি—সেই বার্ঘিম চোর! বিচিত্র সংবাদ বটে সকলের মুখ কঠিন হ'য়ে উঠলো। বুড়ো বার্ঘিম উঠে দাঁড়ালেন। বললেন কী চুরি করেছি আমি, শুনি?

চৌকিদার বললে, সেকথা বাড়ী গিয়ে জানুন! আন্দ্রে নামক ক্যাসবাক্স থেকে আপনি দশটি টাকা চুরি করেছেন, সে নালিশ করেছে! হয় এটা মিথ্যে, জানিনে! কিন্তু আমার কর্তব্য সত্য ঘটনা জনসাধারণ জানানো; কেননা ভবিষ্যতে আমাদের এই নির্বাচন যুদ্ধটা হয়ত জগতের চোখে হাস্যকর হ'য়ে দেখা দিতে পারে!

চৌকিদার চ'লে গেল।

বার্ষিম সাহেব বাড়ী এসে দেখলেন, আন্দ্রে অদৃশ্য! আন্দ্রে কোথায় গেছে কেউ জানেনা, কেউ তা'র পালানো নিয়ে মাথাও ঘামায়নি। কিন্তু সে-বছরের নির্বাচনে মিঃ বার্ষিম মনোনীত হ'তে পারলেন না।

পরিচ্ছেদ—৫

আন্দ্রে ঘুরে বেড়ায় পথে পথে। পথে লোকজন, গাড়ী ঘোড়া, নানা গণ্ডগোল—কিন্তু সেই রোমাঞ্চকর অনির্দেশের মধ্যে আন্দ্রে ঘুরে বেড়ায়। পকেটে কিছু নেই, সংস্থান নেই, ম'রে গেলে কেউ চিনবে না—তবু বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল আন্দ্রে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে যেন আকাশের অসীম রহস্যলোকের দিকে তাকিয়ে কী যেন বিচিত্র আশ্চর্য কিছু নিরীক্ষণ করে! কত দোকানে সে কাজ খুঁজলো, কিন্তু সকলেই জানতে চায় তা'র স্বভাব চরিত্র কেমন! অবশেষে একটা কাজ যখন প্রায় জুটে গিয়েছিল আর কি, ঠিক সেই সময় দোকানের মালিক বললে, পরিচয়পত্র কই?

আন্দ্রের মাথায় ভূত চাপলো। বললে, হ্যাঁ, যদি চাই তবে জেলের কর্তার কাছে ভালো পরিচয়পত্র পাবো বৈ কি!

কী বললে?

বলছি জেলের কর্তা, তিনি আমাকে সত্যিই ভালোবাসতেন!

আচ্ছা, এসো তবে—

আন্দ্রে চ'লে গেল।

কী নির্বোধ সে! কিন্তু নিজে সে ভালো ছেলে এই কথাটা ভাবতেই জেলের কথাটাই তা'র আগে মনে এসেছিল। যাকগে, যা হবার তা হ'য়ে গেছে। কাল আবার নতুন পাতা ওল্‌টানো যাবে।

দেওয়ালে লটকানো খবরের কাগজ সে পড়ে। কী একটা দোকানে একট কাজ খালি আছে যেন! কাজ পছন্দ হ'লে মাইনেটা ভালো। আন্দ্রে এক খানা দরখাস্ত পাঠালো, তা'র সঙ্গে দুখানা সার্টিফিকেট লিখলো নিজের হাতে লেখা বেঁকিয়ে। কয়েকটি সাধু ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকের নাম-সই নিজের হাতে ক'রে দিল। দিন দুই পরে খবর এলো, হ্যাঁ, চাকরিটা হয়েছে। আন্দ্রে ট্রে চেপে বসলো।

আপিসের চাকরি—এ একটা উপায় বটে। এখান থেকে সেই জগে যাওয়া যায়, যেখানকার লোক কফওয়ালা হাতের জামা পরে—যাদের মুখগুি বিবর্ণ। কেরাণী যায় নাচের আসরে, সেখানে মেয়েদের হাতে হাত বাড়ি দেয়। আন্দ্রেও কেরাণী—কেরাণী ত বটেই!

ট্রেণের গার্ড চেঁচিয়ে ঘোষণা করলো, আর কুড়ি মিনিট বাকি। অম সবাই ছুটলো স্টেশনের হোটেলে রাত্রের মতন খেয়ে নিতে। আন্দ্রের পয়সা কড়ি নেই,—কিন্তু তা বললে কি হয়, আপিসের কেরাণীর মতন মুখে চো একটা ভব্যতা বজায় রাখতে হবে বৈ কি। সে একখানা টেবিলের ধারে গিয়ে ব' শহুরে লোকের কায়দাকানুন মাপিক কাঁটা চামচে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

খেতে বসেছে এমন সময় ওধার থেকে একটি মেয়ে ব'লে উঠলো, ওম মাগো, দেখো ওই লোকটাকে। মাংসের ওপর ঝোল না দিয়ে ফলের রস ঢে খাচ্ছে—

মেয়েটার কথায় চারদিক থেকে কৌতূহলী চোখ, হাসি আর চাপা হা আন্দ্রেকে যেন ঘিরে ধরলো। সুতরাং আন্দ্রেকে নিজের পথ দেখতে হো বৈ কি। এটা ওটা খাদ্য হাত সাফাই ক'রে কোনো মতে পকেটে পুরে,- এক সময় সে উঠে কোথা দিয়ে যেন স'রে পড়লো।

আন্দ্রে নতুন চাকুরীস্থলে গিয়ে দাঁড়ালো। একটি কোলকুঁজো লোক সামনে. সে বললে, ও, তুমি? বেশ, বেশ, এসো।

আন্দ্রে মনে করেছিল, অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে তাকে কী না জানি অভ্যর্থনা ববে—হয়ত সেখানে সুন্দরী দুটি তরুণী তা'কে দেখেই ভালোবাসায় বিগলিত :ব—তারপর ভোজনের পালা আরম্ভ হবে, তারপর সুন্দর শয়নকক্ষে চতুষ্পদ ালঙ্কে·····যাকগে, হ্যাঁ. নাই বা জুটলো সে সব·····ধন্যবাদ। লোকটা া'কে একটা খামারের কাছে এনে বললে, ওই ,যে গাছের গুঁড়ি—'গুলো আগে কাটতে হবে। হ্যাঁ, এখুনি কাটতে পাবো, আমরা আজ া'কতে বসেছি।

আন্দ্রে তাকালো। লোকটা তামাসা করছে না ত? লোকটা পুনরায় ললে, আচ্ছা, দাঁড়াও—আগে আস্তাবলে এসো,—

হা ভগবান! কোথায় আপিসের চাকরী, আর এই আস্তাবল! সেখানে টি অশ্ব আর অশ্বতর নিয়ে কী গভীর আলোচনা—তাদের আহারাদি, তাদের ালন পালন!—

হ্যাঁ, কি বলছিলুম বাপু—খাওয়া হয়েছিল ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ—স্টেশনে ডিনার খেয়ে এসেছি!

বেশ, তবে কাঠগুলো কাটতে থাকো। ওই যে ওই গুলো—

অতএব এইভাবে আন্দ্রে একটি অভিজাত পরিবারভুক্ত হয়ে এবং একজন র্মচারী হিসাবে তা'র নতুন জীবন আরম্ভ করলো। কিন্তু এইভাবে কাঠ কটে চলা! ঘণ্টার পর ঘণ্টা আন্দ্রে কাঠ কাটে করাত দিয়ে—নির্বোধের তন. মূঢ়ের মতন। করাতখানা টানে আর ঠেলে—ঠেলা আর টানা—টানা ার ঠেলা! তা'কে পাগল করবে দেখছি!

একদিন সে-বাড়ীর পরিবারের সঙ্গে তা'র পরিচয় হোলো বৈ কি। যুবতী দুটি মেয়ে ছিল বটে, কিন্তু আন্দ্রেকে দেখে তারা এমন নাক বেঁকিয়ে চ'লে গেল, যে, আর একবারও আন্দ্রে তাদের দেখতে পায়নি। একবারও না।

গিন্নি জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ গো বাছা, তোমার মা-বাপ আছে?

আন্দ্রে বললে, হ্যাঁ, আমার বাবা দেশগাঁয়ের নগর-রক্ষী!

অ্যাঁ—বলো কি? • ভাই বোন আছে?—কর্তা জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ আছে। আমার এক ভাই কামান রক্ষীদের ক্যাপ্টেন, আমার এক বোনের বিয়ে হয়েছে মিঃ ফ্রহল্—এটর্নীর সঙ্গে!

তরুণী মেয়ে দুটি এতক্ষণ বাদে তা'র মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালো। চশমা থেকে চোখ বেঁকিয়ে বাড়ীর কর্তা তাকালেন। ছেলেটা বলে কি!

এরপর আবার কাঠের গাড়ী চালাবার পালা! কনকনে শীতের দিনে গাড়ীর পিছনের একধারে হ্যাংলার মতন ব'সে থাকতে হয়! তা'র পাশে ব'সে মোটা-সোটা ফারকোট গায়ে একজন আধামাতাল ফিরিওয়ালা! সে যেন কর্তা, সেই যেন সব—গায়ের কোটটা হয়ত তা'র ধার ক'রে গায়ে চড়ানো। এইভাবে সেই সুদীর্ঘ সন্ধ্যা সেই কাঠের গাড়ীতে হুমড়ি খেয়ে থাকতে হয়। ক্লান্ত ঘোড়ায় গাড়ী টেনে চলে। উচুঁতে ওঠে, আবার নীচে নামে। অনেক সময় দেখা যায় আন্দ্রের পা'দুখানা অসাড়, অচেতন। জুতোর মধ্যে আঙুল গুলো সে নাড়াতে পারে বটে, কিন্তু আঙুলে যেন কোন চেতনা নেই। কান দুটো জ্বালা করে, নাকে ঘা হয়, চোখ দুটো জলে ভ'রে ওঠে—কিন্তু গাড়ীর ঘণ্টাটা বাজতে থাকে—ডিং ডিং ডিং! এক ঘেয়ে অক্লান্ত সেই ঘণ্টার ধ্বনি ডিং-ডিং-ডিং—আর তাঁ'র দুই পাশে পাহাড় বন পেরিয়ে যায়, যেন ওদের আ

শেষ নেই। এক সময় যেন তা'র ঘুম ভাঙে—দেখে ঘোড়াটা এসে থেমেছে আস্তাবলের দরজায়! সে তা'র অবশিষ্ট উষ্ণমটুকু খরচ ক'রে গাড়ী থেকে কুঁজো হ'য়ে নেমে সেই শ্রান্ত ঘোড়াটার রাশ খুলে দেয়। তারপর ঠাণ্ডা বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করা—তারপর কখন এক সময় হাত-পাগুলো একটু একটু গরম হ'য়ে আসে।

একদিন কর্তা বললেন, শহরে যাচ্ছি, তুমি আমার দোকানটা দেখো হে। আমার পুরনো লোক আসবে, সে'ও তোমার সাহায্যে থাকবে—বুঝলে?

আন্দ্রে একা দোকানে বসলো। যেদিকেই চায়, সেই যেন সর্বময় কর্তা। খানিকক্ষণ বাদে একজন বেঁটে শক্ত সমর্থ লোক দোকানে এসে ঢুকলো। বললে, নমস্কার, আমিই এ-দোকানে আগে থেকে কাজ করি।

লোকটা আমুদে বটে, এত সকালেই মদের গন্ধ ওর মুখে। বললে, এসো, দরজার সামনে ব'সে তাস খেলা যাক্। আরে, জনপ্রাণীও এপথে আসবে না। লোকেরা জানে এখানে কিছু পাওয়া যায় না, ভাবছো কেন? বুড়োটা এতবার দেউলে হয়েছে যে, ওকে জিনিসপত্র দিয়ে কেউই বিশ্বাস করে না।—যাক্ একটু চলবে নাকি? এই ব'লে লোকটা একটা বোতল বা'র করলো। তারপর সেটা নিজের মুখের মধ্যে কাৎ ক'রে ধরলো। প্রায় অনেকটাই গিললো বটে। পরে বললে, বুড়োটা কি বলে জানো? তোমার সুপারিশ পত্রগুলো সব জাল করা। হাঃ হাঃ হাঃ—বুঝলে, আমি তোমার দলে। তুমি ঘুঘু ছেলে জেনেও বুড়ো তোমাকে বিশ্বাস করে। কেন জানো? লোকটা আর কাউকে পাবে না। —যাক্ হ্যাঁ একটা কথা। যদি মজুরি চাও, নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নিও। দেখো যদি কপালগুণে কোনদিন হঠাৎ বাক্সে কিছু পেয়ে যাও!

বুড়ো যখন এক বস্তা কফি নিয়ে শহর থেকে ফিরলো গিন্নি হাউমাউ ক'রে

কেঁদে উঠলো। বললে, ভগবান আমাদের রক্ষে করেছেন। ওই দুটো হতভাগা দোকানে ব'সে মদ খেয়ে জুয়ো খেলছে আর পাগলের মতন গান ধরেছে। রাস্তার লোকের কী ভীড়! যাও, পুলিশে খবর দাও।

বুড়ো পিছনের দরজা দিয়ে দোকানে ঢুকতেই ওরা দুজন স্ফূর্তিতে গদগদ হ'য়ে উঠে লোকটাকে জড়িয়ে ধ'রে একেবারে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে ধরলো। বুড়ো হাত-পা ছুড়ে চেঁচাতে থাকে। কিন্তু এই ঘটনার পর আন্দ্রে তা'র নিজের কথাটা বুড়োকে এমনভাবেই বুঝিয়ে দিল যে, চাকরা থেকে তা'কে আর বরখাস্ত করা হোলোনা। সে র'য়েই গেল।

কিছুকাল পরে একদিন কাজের সময় কর্তা তা'র কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, কাঠ কাটা হচ্ছে বুঝি?

লোকটার গলার আওয়াজ উত্তেজনায় কাঁপ্‌ছে।

কপালের ঘাম মুছে আন্দ্রে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। কি জানেন, বদ হজমের পক্ষে এই কাঠ কাটার ব্যায়ামটা বেশ স্বাস্থ্যকর। সকলেই বলে।

গেল কাল কি করছিলে শুনি?

গেল কাল? ও! ডাকের গাড়ীতে পুরুৎ মশাইকে বসিয়ে চালাচ্ছিলুম।

হুঁ, একটা বিশেষ দুষ্ট মতলবে—কেমন? শেল্‌বুতে তাঁর তদন্তে যাবার কথা, তুমি তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে গেলে অন্য দেশে। পুরুৎ এসে আমার কাছে বলছিল।

আজ্ঞে দেখুন—আন্দ্রে নতমুখে বললে, একটার বদলে আর একটা তদন্ত তিনি ক'রে এলেন ত?

কি? ওটা কি এককথা? শেল্‌বুতে কত লোক ওঁকে দেখবার জন্যে এসেছিল, তা জানো? তোমাকে এক্ষুণি তাড়ানো আমার উচিৎ ছিল!

লোকটা মুখ ফিরিয়ে রাগে গমগম ক'রে চ'লে গেল।

বুড়ো এক সময় দোকানে এসে বললে, শোনো, কাউকে ধারে কিছু দেবে না।

আন্দ্রে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও সারাদিন ধ'রে তাই ব'লে দিচ্ছি। ধারে বিক্রয় নাই!

কিন্তু ওই যে মেয়েটা কোঁচর ভ'রে কেক নিয়ে গেল, কই ওর কাছে দাম নিলে না ত?

ওই যা—আজকাল আমার ভারি ভুল হচ্ছে!

কিছুক্ষণ পরে বুড়ো আবার বলে উঠলো, ও কি, ও মেয়েটা কতটা সাবান কিনলো?

বাক্সে পয়সা ফেলে আন্দ্রে বললে, এক সের।

বটে, তবে আড়াই সের বাটখাড়া চাপালে কেন?—ও, সেইজন্যেই তোমার এখানে এত খদ্দের—বটে!

হঠাৎ মুখে চোখে উচ্ছ্বাস এনে আন্দ্রে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, এসব কাজ-কারবার যত তাড়াতাড়ি হয়—!

লোকটা ঘুষি পাকিয়ে বললে, আমার যা করা উচিৎ তা হচ্ছে···

এমন দিনে এক আসামীর বিরুদ্ধে ডাকাতি আর খুনের মামলার শুনানী আরম্ভ হোলো। মামলা হবে দূরের এক শহরে। সমস্ত দেশটা উত্তেজনা-ময় হয়েছে। রাজপক্ষের নগরপাল আগের দিনে এসে পৌছেচে, সে ডাকের গাড়ীটি চায়। দূরের শহরে সে যাবে।

বুড়ো আন্দ্রেকে বললে, তুমি ভদ্রলোককে পৌছে দিয়ে এসো। আন্দ্রে রাজী হ'য়ে নগরপালকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলো। গাড়ীতে ব'সে আন্দ্রে সেই

আইন বিশারদকে মজার গল্প শোনাতে লাগলো। লোকটা বেশ আত্ম-ভোলা। আকাশে তখন তারা, অরণ্যে তুষারপাত। আন্দ্রে গান গাইতে লাগলো গাড়ীতে ব'সে।

পরদিন হুলস্থূল কাণ্ড। বুড়োকর্তা উত্তেজিত, উদ্‌ভ্রান্তভাবে আন্দ্রেকে পাকড়েছে। আন্দ্রে বললে, কি লিখতে হবে বলুন ?

লেখো—কর্তা আর্তনাদ ক'রে বললে, তোমাকে যে বললুম নগরপালকে সেখানে পৌঁছে দাও, তুমি কি সেই সত্য অস্বীকার করবে ?

আন্দ্রে বললে, আজ্ঞে না, সত্যকে অস্বীকার করব, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনে !

তাহ'লে তুমি তা'কে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে ?

আন্দ্রে একটু থতিয়ে বললে, হ্যাঁ বলছি। দেখুন, কালকের আবহাওয়া ছিল চমৎকার। গাড়ীতে যেতে যেতে ভদ্রলোক আমাকে গান করতে বললেন। কিন্তু ঘোড়াটা কেমন জানি গান সহ্য করতে পারে না—সম্ভবত বাঁকাপথ নিয়েছিল ! আমি কি করব বলুন ?

দূর হও, হতভাগা, পাজি, গাধা !

সেবার গুডফ্রাইডের ছুটির সময় একদিন সকালে পরিষ্কার কাপড়-চোপড় প'রে আন্দ্রে কর্তার ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলো। সহসা মাঝ-পথে গিন্নিকে দেখা গেল কাঁদো কাঁদো মুখে। আন্দ্রে বললে, কর্তার সঙ্গে একটু কথা বলবো কি ?—হ্যাঁ, দেখুন, কালকে ঘোড়াটার একটা ঠ্যাং ভেঙ্গে গেছে !

গিন্নি বললেন, উনি শয্যাগত হ'য়ে আছেন !

সে কি কথা ? তাঁর কি সত্যিই অসুখ ?

গিন্নি হাত নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, উনি সর্বস্বান্ত···আর তুমি·· তুমিই তা'র কারণ! বলি, কাল রাত্তিরে কে ঢুকেছিল ভাঁড়ার ঘরে? পেট্রোলের মট্‌কির ছিপি বন্ধ করেনি কে, শুনি? কর্তা আজ উঠে দেখেন আটা ময়দা কফি খাবার দাবার সব পেট্রোলে মৈ-মাড়ন—একদম ছাঁকা তেল চারদিকে! বাড়ীময় গন্ধ পাচ্ছনা? ভাঁড়ারের সব নষ্ট, লণ্ডভণ্ড! কর্তা ভির্মি গেলেন—ডাক্তার এসেছে। যাও তুমি, বেরোও, দূর হও—এক্ষুণি দূর হও!

কিছুক্ষণ পরে আন্দ্রে কর্তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। গিন্নি রোগীর পাশে ব'সে। আন্দ্রে বললে, আজ্ঞে আমার মাইনেটা।

কর্তা বিজবিজ ক'রে বললেন, মাইনে! এখনও হাত পেতে মাইনে চাও? যথেষ্ট ক্ষতি কি আমার করোনি?

আন্দ্রে বললে, যাকৃগে। তবে দুঃখ রইলো আমরা মিলেমিশে ভালো ক'রে কাজ করতে পারলুম না। তা যাকৃগে। তবে আমার আন্তরিক কামনা, আপনি শীঘ্র নিরাময় হোন!—সে চ'লে যাচ্ছিল, আবার ঘুরে দাঁড়ালো। বললে, ভালো কথা, আপনি যদি একখানা সার্টিফিকেট আমাকে দেন, পরে আমার কাজে লাগতে পারে!

কি? কি বললে?—ওগো, ওকে তাড়াও ত' এখান থেকে।

আচ্ছা, তবে নমস্কার! আসি!—ব'লে আন্দ্রে চ'লে গেল। যাকৃগে, নিজের মুখমণ্ডলটিকে এমন মধুর বিনয় আর স্নেহার্দ্র আন্তরিকতায় সে বুড়োর মুখের কাছে ধরতে পেরেছিল যে, ওতেই আন্দ্রের মাইনেটার শোধ উঠে গেছে!

পরিচ্ছেদ—৬

আর যাই হোক, এ পৃথিবী আদর্শ বাসস্থান নয়। বছরখানেক পরে দেখা যায়, আন্দ্রে হাজতে, বন্দী—সম্প্রতি সদর বন্দীশালায় বদলী হবার অপেক্ষায় সে রয়েছে। মন্দ লোকেরা তাকে ধরিয়ে দিয়েছে, তার কারণ সে একপ্রকার নতুন লাঙ্গল গ্রামে গ্রামে সরবরাহ করার জন্য কোনো এক দোকানের পক্ষ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে বেড়িয়েছে। যাই হোক, গত কাল তা'র শাস্তি হয়েছে। এখানে বেশ কিছুদিনের জন্য বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থান।

জেলের ওয়ার্ডার দরজা খুললো। তা'র সঙ্গে জনৈক লম্বা চওড়া রক্তাভ চেহারার লোক—চোখে সোনার চশমা। আগন্তুক বললে, এই যে—হ্যাঁ, সেই বটে! আচ্ছা ধন্যবাদ, ওয়ার্ডার সাহেব—এই একটু,—এই আর কি!

ওয়ার্ডার বাইরে গেল। ভদ্রলোক চশমা মুছে হেসে বললে, আমিই ডাঃ জেনসন। কাল তোমার বিচারের সময় ছিলাম। জানিনে তুমি আমাকে দেখেছিলে কিনা।

আন্দ্রে কটাক্ষে চেয়ে বললে, তা হবে।

তোমার ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত ধরণের—বুঝলে? সবাই আমরা একমত হয়েছিলাম—তুমি দুষ্ট লোক। কিন্তু তোমার কথা ভেবে কাল সারারাত ঘুমোইনি। তোমার মাথাটা একবার আমাকে একটু পরীক্ষা করতে দেবে?

একটা যন্ত্র বা'র ক'রে ডাক্তার বন্দীর মাথার চারদিকে আটকে বসালো। খুব সাবধানে আঙ্গুল টিপে টিপে শ্বাসপ্রশ্বাস টানতে টানতে ভদ্রলোক আন্দ্রের মাথা পরীক্ষা করতে লাগলো। তারপর জানলার বাইরে চেয়ে চিবুকে হাত রেখে কয়েকবার বললে, হুম। অবশেষে এক সময় ঘরময় পায়চারি ক'রে

বললে, ঠিক, বুঝলে বন্ধু, ঠিক যা ভেবেছি। তোমার কি একবারও মনে হয়নি যে, এসব তোমার পক্ষে ভালো হচ্ছে না ?

আন্দ্রে নিশ্বাস ফেলে কি যেন বিড়বিড় করলো। যেন বললে, তার কোনো দোষ নেই।

তুমি সাধারণ অপরাধী নও, বুঝলে, তোমার অনেক মেধা আছে—মানে সবটা মন্দ নয়—কিন্তু বিশেষ প্রতিভা। কেবল তা'র ভুল প্রয়োগ ঘটেছে, তাই তুমি আজ এখানে! আচ্ছা, থিয়েটার কা'কে বলে জানো ?

আন্দ্রে দু' একবার অভিনয় দেখেছিল। থিয়েটারের কথা সে জানে বৈ কি।

ডাক্তার বললে,—তোমার কখনো অভিনেতা হবার ইচ্ছা জেগেছিল কি না এ আমি জিজ্ঞেস করতে পারতুম—কিন্তু, না না, অমন মুখ করো না—ওটা তোমার আসল মুখ নয়। হাঃ হাঃ হাঃ! কাল তোমার বিচারের সময় তোমাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। হাঃ হাঃ হাঃ।

আন্দ্রেও হাসলো বটে।

রুমালখানা ঘোরাতে ঘোরাতে ডাক্তার আবার পায়চারি ক'রে বললে, হ্যাঁ বেশ আমুদে ছেলে তুমি। লেখাপড়া বিশেষ করোনি। আজ এখানে এই বন্দীশালায়। তা বেশ ভালো। যদি জেলে ব'সে শিক্ষার গুণে পুরোহিত হওয়া যায়, তবে অভিনেতা হওয়া যাবে না কেন! দাঁড়াও দেখি, তোমার জন্য বইপত্র জোগাড় করি। আগামী ছ'মাস অনুতাপ ভোগ ক'রে তুমি যখন বেরোবে, আমার সঙ্গে দেখা করো, বুঝেছ? যদিও আমাকে কৃপণ বলে সবাই, আর আমার মুঠোও সহজে খোলে না—তবু আমারও খেয়াল-খুশি আছে। তোমাকে আমরা মস্ত এক ব্যক্তি বানিয়ে তুলবো।

আন্দ্রে তা'র পরদিন থেকে ইতিহাস, ইংরেজি ও জার্মান শিখতে লাগলো।

ছ'মাস পর জেল থেকে বেরিয়ে আন্দ্রে ডাক্তারের সঙ্গে গেল ছোট একটি স্থানীয় রঙ্গালয়ে। ম্যানেজারের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে বললে, ও, এর কথাই বুঝি বলছিলেন?—তারপর আন্দ্রের আপাদমস্তক দেখে সে আবার বললে, প্রতিভাবান সম্বন্ধে আপনার মতামত—মানে, বুঝলেন কিনা—

ডাক্তার বললেন, সেকথা ত' আমাদের হ'য়ে গেছে।

হ্যাঁ, তা বটে। তবে আপনি যতটা মনে করেন অতটা সহজ নয়। কিন্তু এসব খুব কঠিন, ভারি কঠিন, তা বলছি—

ডাক্তার ক্ষুণ্ণভাবে চ'লে যাবার উদ্যোগ করলেন, কিন্তু ম্যানেজার তাকে ডাকলেন অন্য ঘরে। দুজনে নানা কথা চলতে লাগলো। ডাক্তারের কণ্ঠে উত্তরোত্তর উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছিল। তারপর দুজনে বেরিয়ে এলো।

ম্যানেজার বললে, কাল বেলা বারোটার সময় এসো।

পরদিন আন্দ্রে এলো ঠিক সময়। এসেই একটা নতুন ধরণের পরীক্ষায় প'ড়ে গেল। ম্যানেজার তাকে হবসেনের একটা কবিতা আবৃত্তি করতে বললে। আন্দ্রের মুখস্থ ছিল, বেশ বলে গেল।

ম্যানেজার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললে, বাঃ বেশ, বেশ ভাই। যেন একজন মিশনারি প্রার্থনা ক'রে গেল—এমন মধুর! আচ্ছা, এই বইয়ের এই গল্পটা পড়ো ত?

এই বলে লোকটা নিজেই গল্পের খানিকটা অঙ্গভঙ্গী ও মুদ্রাসহকারে প'ড়ে গেল।

আন্দ্রে এবার ধরলো। প'ড়ে গেল ঠিক ম্যানেজারের মতন—তা'রই মতন অঙ্গভঙ্গী, তা'রই মতন মুদ্রাদোষে ভরা।

বাঃ বেশ, বেশ ভাই।—ম্যানেজার আবার ব'লে উঠলো। আচ্ছা, এবার

আর একটা হোক'। একটা সত্যিকার অভিনয়, ধরো—বিশপ নিকোলাসের অভিনয় !—ডাক্তার বেশ জোরের সঙ্গে প্রস্তাব করলেন !

কি বললেন ? কিসের ভূমিকা অভিনয় ?—ম্যানেজার যেন ভির্মি যাবার উপক্রম করলো।

ডাক্তার বললেন, বিশপ নিকোলাসের। ওকে যে কোনো ভূমিকায় নামান না কেন। যা খুশি। হ্যামলেট ? হ্যাঁ, তাই করতে বলুন।

ম্যানেজার দৌড়ে গিয়ে আনলো এক বাঁধানো বই। এনে আন্দ্রের হাতে দিল। তারপর ডাক্তার তাঁ'র ছাত্রকে বক্তৃতা দিয়ে হ্যামলেটের রাজসভা বোঝালেন। আন্দ্রের চোখে সমস্ত ছবিগুলি যেন মন্ত্রবলে ভেসে উঠলো। বিশপ নিকোলাস কেমন দেখতে—সে যেন নিজের শরীরের ওপর সেটা অনুভব ক'রে নিল। তাঁ'র বয়স বেড়েছে, গলার স্বর ভাঙা, শরীর কুঁজো হ'য়ে এসেছে। এবার আর একবার সে আপন অন্তরের পরিহাসকে চাপলো—যেমন বিশপ নিকোলাস চেপেছিল রাজসভায় গিয়ে।

ম্যানেজার বললে, ইয়া, হ্যাঁ ঠিক এই—হ্যাঁ, হোক ?

আন্দ্রের অভিনয়ের পর ম্যানেজার আবার লাফিয়ে বললে, বাঃ বেশ—বেশ ভাই। এই ত চাই ! সম্ভবত তোমার প্রতিভা রয়েছে চাপা। কি জানো, কাঁচা হীরে আর কি ! ঘষা মাজা হ'লে, কাটছাঁট করলে ঠিক হ'য়ে যাবে। কিসে চলে তোমার ?

আন্দ্রে সহসা উত্তর দিতে পারলো না—সে যেন তখনও বিশপ নিকোলাসের প্রাণ থেকে স্ব-দেহের মধ্যে ফিরে আসতে পারে নি !

ডাক্তারের কৃপায় আন্দ্রের ভাগ্য ফিরে গেল। মাসে মাসে সে কিছু পায় থিয়েটার থেকে ; অন্য সময় কাজ করে আর বই পড়ে। ভদ্র পরিবারে সে

থাকে, খায়দায়, পরিষ্কার পরিপাটি থাকে। অভিনয় শেখে প্রায় সময়। আগে জানতো না এ একরকমের কলাশিল্প। ঘরে ঢোকা, বেরিয়ে আসা, নির্ভুলভাবে পা ফেলা, মাথা নোয়ানো, হাসাহাসি করা, শিক্ষার পালিশ দেখানো—এ বেশ। বহু জিনিস আছে বটে শেখবার। সে ডাক্তারের সঙ্গে খেতে বসে। জগতের বহু কবির গল্প শোনে। কেমন ভাবে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাব্য পড়তে হয় শিখে নেয়।

ডাক্তার একদিন বললেন, আর বুঝি কাপড়-চোপড় নেই তোমার? আচ্ছা, আমার দর্জির কাছে চলো।

ফলে, আন্দ্রের অনেকগুলি পোষাক তৈরী হোলো। একদিন ডাক্তার বললেন, ভদ্রলোকের মতন দেখাচ্ছে তোমাকে। কিন্তু ওই হাতের নখগুলো—

অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার তাকে সুসভ্য মানুষের নখের চেহারা বুঝিয়ে দিলেন।

আন্দ্রের ভিতরে ছিল যেন কাদার ডেলা, ডাক্তার তা'র থেকে একটি অবিনশ্বর মূর্তি বা'র করতে চাইলেন। এ যেন তাঁ'র নিজের স্বপ্ন! তিনি শিক্ষিত ছেলের দিকে ফিরেও চাইতেন না, তিনি চাইতেন আদি মূল ধাতু—যাকে হাতে ক'রে গড়া যায়! তা তিনি পেয়েছেন!

অবশেষে আন্দ্রেকে একটি ভূমিকায় নামানো হোলো। কাগজে কাগজে খবর ছাপা হোলো—একজন অসাধারণ নতুন অভিনেতা পাওয়া গেছে। একটি বিচিত্র চরিত্রের যুবক যার জীবন-কাহিনী আশ্চর্য!

যবনিকা উঠলো! গ্রামের লোকেদের সঙ্গে থেকে গির্জার মধ্যে অভিনয় করায়,আগে থেকেই সে অভ্যস্ত,—এবার দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে আন্দ্রে সেই

একই উত্তেজনা অনুভব করলো। বার বার সে হাততালি পেলো। মাঝে মাঝে এক এক অঙ্কের শেষে সে যবনিকার পাশে এসে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে। ডাক্তার আবেগ উত্তেজনায় বলেন, চমৎকার, চমৎকার হচ্ছে! শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলেছ তুমি!

ম্যানেজার আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে প্রতিজ্ঞা করেন, আন্দ্রের বেতন তিনি বাড়িয়ে দেবেন। পরদিন কাগজে ছাপা হোলো, গত সন্ধ্যাটি অবিস্মরণীয়!

কাগজগুলি থেকে সমালোচনাগুলি কেটে নিয়ে আন্দ্রে জোনেটার কাছে পাঠিয়ে দিল।

খ্যাতির বোঝায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে ছোটশহরের পথ দিয়ে চলার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সে লাভ করলো। রোমার নামক সেই লোকটার সামনে দিয়ে অনেকবার সে আনাগোনা করলো—বুড়ো লোকটা ভাবতে লাগলো, কোথায় যেন এর আগে এ ছোকরাকে সে দেখেছে। বুড়ো টুপিটা নাড়ে আর আন্দ্রে নতবিনীত ভাবে তা'র অভিবাদন গ্রহণ ক'রে ফিরিয়ে দেয়।

ডাক্তার একদিন তা'র জন্য ডিনার-পার্টিতে তাকে আমন্ত্রণ ক'রে তা'র শুভজীবন ও উন্নতি কামনা করলেন। সে এই শহরের নবীন আশা আর আন্দ্রে? প্রত্যেকদিন সকালে উঠে সে যখন পোষাক পরে, তার মনে হয় সে যেন সোনার মেঘের ভেলায় চ'ড়ে বসেছে!

প্রথম শ্রেণীর ডাইনিং হলে সে খায়, চাপরাশিদের বকশিস দেয়, মহিলাদের সঙ্গে ভিন্ন কক্ষে গিয়ে আলাপ করে। বড় বড় ভূমিকায় সে নামে। একটি থেকে আরেকটিতে সে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কখনো রাজা, কখনো যোদ্ধা কখনো হত্যাকারী, কখনো বুড়ো মাতাল, কখনো তরুণ, কখনো বা হতাশ প্রেমিক, অথবা বিমর্ষ বিষণ্ণ পিতা! জীবনটা উত্তেজনাময়, কাল কি হবে

কে জানে! আজ তোমাকে কেউ আশ্রয় দিতে চায় না, কাল হয়ত তোমাকে নিয়ে কত পান-ভোজন কত আমোদ আহ্লাদ! জীবনটা যেন রূপকথা,—দিনগুলি উড়ে চলে—স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে যায়। এখানে কত বিচিত্র লোকের একত্র সমাবেশ। সবাই রয়েছে গায়ে গায়ে—সংগ্রামে সংশয়ে, কলহে, পরিশ্রমে। প্রত্যেকের সৎ আর অসৎ প্রভাবে চারদিকে সবাই প্রভাবান্বিত হচ্ছে—আনাগোনায়, মহড়ায়, অভিনয়ে, আহারবিহারে—সকল ব্যাপারে। কর্মীদের ভিতরে পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, কানাকানি, গালাগালি, প্রশংসা, সাহচর্য, আবার বিশ্বাসঘাতকতাও। অভিনয়ের পর শ্রোতাদের কাছ থেকে হাততালি পেয়ে বেরিয়ে এলে, কিন্তু সহকর্মী হয়ত কটু মন্তব্য করলো তোমার কুৎসিত অভিনয়ের প্রতি; আবার সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেই হয়ত কোনো নারী বিহ্বল প্রশংসায় তোমাকে জড়িয়ে ধরলো। জীবনটা কী অদ্ভুত!

সবাই স্বীকার করলো, প্রসাধন ব্যাপারে অর্থাৎ 'মেকআপে' আন্দ্রের জুড়ি কেউ নেই। দু'একটি রেখায় নিজেকে সে যেন অসাধারণ ক'রে তোলে।

একটি বছর এমনি ক'রে কাটলো। অতঃপর আন্দ্রে যেন দিন দিন বিরক্তি আর অসন্তোষে ভ'রে উঠতে লাগলো!

লোককে বিশ্বাস করানো ছাড়া অভিনয়ের দাম কতটুকু? শ্রোতারা সবাই জানে, এটা সত্যিকার জীবন নয়, এটা অভিনয় মাত্র। সুতরাং প্রতারিত কেউ হয় না। আন্দ্রের প্রাণসত্তার ভিতরে একটি বাসনা যেন ঘন হ'য়ে ওঠে—রঙ্গমঞ্চের বাইরে অভিনয় করা যায় না?—অর্থাৎ পথে ঘাটে, লোকের বাড়ীতে, রাজপথের মোহানায়? সংশয় সন্দেহহীন সাধু লোকদের সামনে

সে যদি বিশ্বাসের অতীত একপ্রকারের লোকের মতন দাঁড়িয়ে তাদের চোখের সামনে ঠকাতে পারতো ?

কেউ কড়া নেশা করে, সে করে না। কেউ তামাক না পেলে মাথা খারাপ করে। তা'র ওসব দরকার নেই। কেউ স্ত্রীলোকের জন্য উন্মাদ, জ্ঞানহারা। তাদের কথা ভাবলে আন্দ্রের হাসি পায়। কিন্তু তা'রও একটা বিস্ময়কর কামনা আছে যে। এ-জীবনকে সে যেন আর কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। সে নিজের মধ্যে নিজে বন্দী হ'য়ে থাকবে, আর কোনো ব্যক্তি হ'য়ে উঠতে পারবে না সে, প্রতারণা করবে না কারুকে—এ যে অসম্ভব !

এই বাসনা অধীর হ'য়ে উঠলো তা'র কোনো এক প্রভাতে,—সে আর স্থির থাকতে পারলো না, কোথায় যেন অদৃশ্য হ'য়ে গেল! সঙ্গে কিছুই নিল না, স্থধু নিল একটুখানি মোম-গলানো রং আর কয়েকটা পরচুলা। এগুলো কোনোদিন কাজে আসতে পারে !

শহরে গেল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে শুনলো ডাক্তার গেছেন ভ্রমণে। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল আন্দ্রে ঢুকেছে এক ব্যাঙ্কে,—সেখানকার একটা ফোকরে ডাক্তারের নাম-সই যুক্ত একটুক্রো কাগজ সে গলিয়ে দিচ্ছে।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার চশমার ওপর দিয়ে তা'র প্রতি কটাক্ষ করলেন। কি নাম ? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে !—তুচ্ছ ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার, তুমি এই ছোট্ট জায়গায় ব'সে কতটুকু জানো, আন্দ্রে সেই ডাক্তারের কাছে কতখানি উপকৃত, কতখানি কৃতজ্ঞ !—যাক গে, টাকাটা বেশ মোটা রকমের !

আন্দ্রে কাঁপতে থাকে। এর নাম অভিনয়! এর নাম উত্তেজনা! সে জানে, এক চুল এদিক ওদিক হলেই সর্বনাশ, একটি পলকেই সব পণ্ড। এর নাম অভিনয়কলা, এর নামই কাব্য !

দাঁড়াও একটু—ব'লে ম্যানেজার বেরিয়ে গেল।

আন্দ্রে ভাবলো, লোকটা বুঝি ডাক্তারের কাছে টেলিফোন করতে গেল। ওরা দুজন প্রায়ই ক্লাবে ব'সে তাস খেলে। কিন্তু ডাক্তার ত' বাড়ীতে নেই!

লোকটা ফিরে এলো, তা'র চোখে মুখে সন্দেহ সুস্পষ্ট। আর একটি মুহূর্ত—তারপর হয় টাকা, নয়ত কারাবাস।

লোকটা আঙ্গুলের ফাঁকে কাগজের টুকরোটা নেড়ে চেড়ে তা'র মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। শেষকালে বোঝা গেল, সে মনোস্থির করেছে। আন্দ্রের মুখের কোনো একটি রেখা, কিম্বা তা'র মুখের কোনো একটি ভাসমান অভিব্যক্তির ছায়া লোকটাকে প্রতারিত করলো।

কাগজের টুকরোটা অন্যত্র গেল, এবং ক্যাসিয়ার তা'র নাম ডাকলো। আন্দ্রে টাকার নোটের তোড়া পকেটে পুরবার আগে ইচ্ছে ক'রে সাবধানে একটি একটি ক'রে গুণলো। তারপর সে তাকালো একবার চারদিকে, এবং ধীরে সুস্থে স্থান ত্যাগ করলো। তা'র শিরার মধ্যে কেমন যেন তীব্র ভয়ঙ্কর উল্লাস; যেন তা'র আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছে এক কোমলাঙ্গী নারী!

আবার একটা বাসস্থান তা'র জুটলো। আপন কীর্তির অধীর ও অব্যক্ত উল্লাস নিয়ে সে আবার বিছানায় গিয়ে উঠলো। সেই আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটলো তা'র কণ্ঠে স্তব-সঙ্গীতে!

আপন গ্রামে সে একদা কত চপলতা ক'রে এসেছে! আজ সেগুলো যেন তাকে লজ্জা দিচ্ছে। যদি সে সেইসব লজ্জার কতকটা অপনোদন করতে চেষ্টা করে, তবে কেমন হয়? হ্যাঁ, তা'র পথ আছে, উপায় আছে।

সে উপহার পাঠালো তা'র দেশে সেই সব নরনারীর কাছে—যাদের জীবনে ও যাদের শান্তির সংসারে সে অহেতুক উৎপাত ক'রে এসেছে

কোথাও পাঠালো রাশি রাশি আসবাব সজ্জা, কোথাও চিত্রাবলী, কোথাও সোনার ঘড়ি,—এমনি ক'রে সে তা'র চপলতার ঋণ পরিশোধ করতে লাগলো। যারা তা'র উপহার পেলো, তারা সকলেই অবাক, মূঢ়, হতচকিত।

ইতিমধ্যে ডাক্তার ফিরে তাঁ'র বন্ধু ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে টাকা তোলার কথাটা শুনলেন। ডাক্তার স্তম্ভিত হ'য়ে বললেন, তিনি নাম সই ক'রে কোনো লোককেই টাকা দেননি। কিন্তু কাগজের টুকরোটা তাঁকে দেখানো হোলো, তিনি নিজ নাম-সইয়ের অবিকল নকল দেখে মূঢ়ের মতো চেয়ারে ব'সে পড়লেন। জীবনে একটি মাত্র আশ্রয় অবলম্বন ক'রে আপন অবিশ্বাসবাদকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা পেয়েছিলেন, এবার সেটিও ঘুচলো।

আন্দ্রে তা'র সকল চিহ্ন মুছে দিয়ে কোথায় চ'লে গেছে, তা'র ধরা ছোঁওয়া পাওয়া গেল না। পুলিশের তল্লাসে কোনো সুদূর এক ক্ষুদ্রগ্রামে এক নবাগত কৃষ্ণকেশ কৃষ্ণশ্মশ্রু মিশনারিকে পাওয়া গেল—সে লোকটি বাইবেল বিক্রি করে, প্রার্থনা সভা ডাকে আর গ্রামবাসীদের কাছে ধর্মতত্ত্ব প্রচার ক'রে তাদের নবচেতনায় জাগিয়ে তোলে। কিন্তু আন্দ্রে কোথায়?

পরিচ্ছেদ-৭

হ্যাঁ, তা'র অভিনব জীবন উত্তেজনায় টলটলে। একজন অভিনেতার পক্ষে মিঃ সোরেনসেন, অর্থাৎ সাধারণ এক মিশনারির ভূমিকা, বেশ বড় রকমের বৈকি। এতদিনে নিজের জন্য বাছা বাছা শব্দ সে পছন্দ করবার

সুবিধা পেয়েছ। তা'র চারদিকে যারা স্তোত্র পাঠ করে, নাটক অভিনয়ের কথা তা'রা কল্পনাও করে না। তা'রা মুখের দিকে তাকায় অখণ্ড বিশ্বাস নিয়ে তা'রা সচেতন তবু তা'রা প্রতারিত।

আন্দ্রে অশ্রান্তভাবে শুনে এসেছে কেমন ক'রে গুরুপুরুত ধার্মিকরা ধর্ম প্রচার করে; দরকার হ'লে সেও তাদের বেশ ধারণ করতে পারে। কিন্তু এখানে, এই গ্রামে, পৃথিবী থেকে দূরে—সেখানকার উপযোগী চেহারা নিজের জন্য সে সৃষ্টি করেছে। এখানে তা'র উত্তেজনা আরও তীব্র, এখানে অসংখ্য নিবিড় চক্ষু অপলকভাবে তা'র দিকে তাকায় অসীম আগ্রহ-শীলতায়—এমন অভিজ্ঞতা তা'র জীবনে ঘটেনি। সে ওদের নাচাতে পারে সুধু হাতখানা নেড়ে। বুড়ো যদি কেউ থাকে, দু'চারটে শব্দের কৌশলে তাদের মুখের নতুন রেখা টেনে দেওয়া যায়; দন্তহীন মুখ কোথাও থাকলে তা'র মুখগহ্বর আরো বড় হয়ে ওঠে, কারো আত্মপ্রত্যয়শীল মুখের চেহারা থাকলে সেটি ভয় আর দুঃখে ভিন্নরূপ নেয়। এমন কি, কারো যদি উজ্জ্বল হাসিমুখ থাকে, তা'র মুখের উপর দারিদ্র্য-পীড়িত কারুণ্য ফুটিয়ে মিঃ সোরেনসেন ওরফে আন্দ্রে কৌতুক আস্বাদন করে। তরুণী মেয়েরা ব'সে থাকে। তাদের চোখে জল আনা ভারি সহজ। তারপর যদি তাদের মনশ্চক্ষে নবীন আশা আর মধুর স্বপ্ন জাগানো যায়, তবে তা'রা হয়ে ওঠে যেন দেবদূতী; এবং তাদের দেখে আন্দ্রের নিজেরও যেন ডানা গজিয়ে ওঠে। নতুন চিন্তা আসে তা'র মনে। সুধু মানুষের মুখগুলি সে যেন আর লক্ষ্য করেনা; সে দেখে আরো কিছু। সে যেন বুঝতে পারে সে একটি অপূর্ব বিস্ময়কর বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলেছে! তা'র কাছে ঈশ্বর কি, ঈশ্বর কেমন? একটি বীণাযন্ত্রের তার! সেই তার দিয়ে সে ছুঁয়ে চলেছে মানুষের প্রাণ—সে বুঝতে পারে

তা'র আপন সত্তার মধ্যে একটি অতি দুর্লভ, মধুর, একটি অতি শক্তিশালী সুর তরঙ্গমন্দ্রিত হচ্ছে। সে যখন বলে, এসো, এসো ভ্রাতৃগণ, আমরা সমবেত বন্দনাগান করি!—তখন—তখন যেন একটা মন্ত্রশক্তি! যেন মায়া, যেন পরম বিস্ময়!

তবু এ-কীর্তি তা'র আংশিক। দেখতে দেখতে তা'র এই অভিনয় কল্পনার সকল সীমা পেরিয়ে চললো। সে জানেনা,—পরমুহূর্তে কি হতে পারে সে জানেনা। মধ্য রাত্রির মৃত্যুশয্যার কাছে তা'র ডাক আসতে পারে, তরুণী রমণী তা'র করুণ প্রণয়কাহিনী তাকে শোনাতে পারে, কোনো ব্যথিত-হৃদয়া জননী মত্তপ সন্তানের বিষয় বলবার জন্য তা'র কাছে এসে দাঁড়াতে পারে।

ইদানীং সে কারো মুখের দিকে চেয়ে দেখে না, সে দেখে তাদের আত্মার অভিব্যক্তিকে—যারা তাকে বিশ্বাস ক'রে তা'র কাছে আপন প্রাণ সত্তাকে উন্মীলিত করে। আন্দ্রে নিজের মনেই ভাবে, তাহ'লে মিশনারি হওয়া মানে এই; আমি এখন মিশনারির জীবন লাভ করেছি।

ফিরে এসে বন্ধ ঘরের মধ্যে সকলের অগোচরে পরচুলা খুলে ফেলা কী স্বস্তি! ছদ্মবেশ খুলে দাঁড়ালে আসল মানুষটা বেরিয়ে আসে। সে হাসবে, না কাঁদবে? কী করছ তুমি, আন্দ্রে? কী ঘটছে তোমার? এই যে তুমি—তুমি আন্দ্রে—এইটিই কি তোমার প্রকৃত আমি? মুখের মুখোস সে খুলে ফেললো যেন কতকটা অনিচ্ছায়। বেদনার সঙ্গে সে যেন মিশনারিকে বিদায় দিচ্ছে—আন্দ্রে অপেক্ষা সে কত মহৎ! আন্দ্রে—আন্দ্রেই বা কে! আন্দ্রে যেন অপরিচিত, যেন সে দূরে দূরে থাকে সমস্তদিন—সুধু রাত্রে তা'র সঙ্গে দেখা হয়। সে যেন দুরন্ত দুঃশীল আন্দ্রের ওপর দিন দিন শ্রদ্ধা হারাচ্ছে—মিশনারির দৃষ্টিতে সে যেন আন্দ্রেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। হা ভগবান্,

সে আর সেই এক ব্যক্তি নয়। কত মহাত্মা আর মনীষীর গল্প কত সে পড়েছে, তাদের ছবি তা'র মনের উপর দিয়ে ভেসে যেতে থাকে। সে যেন আপন অন্তরে তাদের অভিজ্ঞতার আস্বাদ পায়, সে যেন তাদেরই জীবন যাপন করে। এই হোলো জীবন, এই শিল্প, এই কাব্য।

একদিন এক বুড়ীর মৃত্যুশয্যায় তাকে ডাকা হোলো। বুড়ীর পিঠে কুঁজ লক্ষ্য ক'রে সে কেমন যেন রহস্যময় উত্তেজনা অনুভব করলো। সেটি ছিল এক শ্রমিকের কুটীর। সহসা আন্দ্রের মনে হোলো সে আপন ঘরে মায়ের শয্যার পাশে বসে রয়েছে। বুড়ী ক্ষীণস্বরে স্তিমিত চক্ষে বললে, আমার কি উদ্ধার আছে, বাবা?

আন্দ্রের কেমন যেন শিহরণ হোলো। নিজেকে সে অনুভব করলো আপন গৃহের চতুঃসীমানায়। সেখানে সে ছিল সমাজচ্যুত, জেলখাটা আসামী—আর এখন? এখন এখানে ব'সে তাকে বিচার করতে হবে, একটি আত্মার সদ্গতি হবে কিনা। আন্দ্রে বুড়ীকে বললে, ভগবানেয় কৃপায় তার এ সংশয় কেন?—এই ব'লে সে বুড়ীর মুখে হাত বুলিয়ে দিল, সান্ত্বনা দিল। অবশেষে বুড়ীর কাতর করুণ মুখখানি দেখতে দেখতে মৃত্যুতে উদ্ভাসিত হ'য়ে এলো।

আন্দ্রে উঠে এলো স্তব-মন্ত্র-গান করতে করতে। সে আর এখন ভ্রাম্যমান সাধারণ ধর্মধ্বজী নয়, সে আন্দ্রে। এই দিনটি তা'র আপন যৌবনকালের প্রতি যেন সম্মান এনে দিল। মিঃ সোরেনসেন নয়—আন্দ্রে—আন্দ্রে গিয়েছিল মুমূর্ষু বৃদ্ধার কাছে। সেই আগেকার বন-কুটীরের বালক যেন তা'র কুব্জদেহ জননীকে বৈকুণ্ঠধামের তোরণদ্বার দেখিয়ে দিয়ে এলো।

সময়কাল অতিবাহিত হয়। তা'র অন্তরের এই প্রসন্ন পবিত্রভাব বিকাশের পাশে থেকেই তা'র মন হাস্যমুখরতায় ফেনিয়ে ওঠে। কিন্তু এ

হাসিতে কোনো জ্বালা নেই। এ হাসি স্বচ্ছন্দ জীবনের, আনন্দের—সে যেন তা'র আপন ভাগ্যের বাইরে—সে দর্শক। সে আর একই ব্যক্তির মধ্যে অপরিবর্তনীয় ভাবে সীমাবদ্ধ নয়,—সে এখন আপনাকে বদলাতে পারে, ভিন্ন ব্যক্তি হ'য়ে উঠতে পারে। সেদিন সন্ধ্যায় ঘর বন্ধ ক'রে জানলার পর্দা টেনে সে পায়চারি করতে করতে কৃত্রিম দাড়িটা বার বার খুলছিল আর পরছিল। বার বার ভাবছিল, এ রকমভাবে চলতে পারে না। তুমি তার প্রেমে আসক্ত, তাকে জয় করতে পারো তুমি। কিন্তু সে-নারী কাকে বিয়ে করবে? সোরেন-সেনকে, না আন্দ্রেকে? তুমি একাধারে ছুই ব্যক্তি, তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে!

আসল কথা হোলো তা'র অভিনয় শেষ হয়েছে। খাঁটি মহৎ ব্যক্তি সাজতে গেল খুঁটিনাটি পর্যন্ত যা কিছু তা'র আয়ত্ব, এরপর যা কিছু করবে, সমস্তটাই শুধু পুনরাবৃত্তি!

এই সময়ে পরিষদ গৃহে তা'র জন্য একটি সম্মাননা সভার আয়োজন করা হয়েছিল,—কিন্তু আন্দ্রে বিদায় নিল। লোকেরা তা'র ভাড়াটে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ীপথ ধ'রে চললো গুণ-গুণ গান গেয়ে। তারপর এক সময়ে সবাই যখন তাকে ছেড়ে চলে গেল, সে গাড়ী থামিয়ে নামলো, গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিল, তারপর ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে একা একা হেঁটে চললো। শেষবারের মতো দেখে নিল নীলহ্রদের চারপাশে উপত্যকা গ্রীষ্মকালের মাধুর্যে স্থন্দর হ'য়ে রয়েছে। হ্যাঁ, ওখানে সে রেখে এলো উদার ধর্মপরায়ণ সোরেনসেনকে—ওখানে সে অভিনব ব্যক্তিরূপে ছিল কিছুকাল। এবার বিদায়! যেন তা'র কাছ থেকে আন্দ্রে বিদায় নিল। নমস্কার তোমাকে।

পথ ধরে সে নামলো এক ক্ষুদ্র নদীর তীরে। ব্যাগটা রেখে মাথার

চুলগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করলো। একটি ছোট্ট আয়না ছিল কাছে। সেটির ভিতরে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, আন্দ্রে, ভালো ত? দিনের আলোয় অনেককাল তোমার সঙ্গে দেখা-শোনা হয়নি!

ব্যাগটা পিঠে ঝুলিয়ে আবার সে চললো গান গেয়ে। এইভাবে কয়েক-ঘণ্টার জন্য সে মুক্তিলাভ করলো। আবার লোকসমাজে যাবার আগে তাকে নতুন রূপ ধারণ করতে হবে।

এক সপ্তাহ বাদে সে এলো খৃষ্টিয়ানা শহরে। মস্ত শহর, যানবাহন দেখে সে উদ্‌ভ্রান্তপ্রায়। একজন পাহারাওলাকে দেখে সে বললে, আচ্ছা, আমাকে সস্তায় একটা থাকা-খাওয়ার জায়গা ব'লে দিতে পারো?

পাহারাওলাটা প্রসন্নমুখে গোঁফে তা দিয়ে বললে, হ্যাঁ, পারি বৈ কি। আমার বোন একটা ছোটখাটো হোটেল চালায়। এসো আমার সঙ্গে।

আন্দ্রে চললো তা'র পিছু পিছু।

আজকাল আন্দ্রের নাম হোলো সেওস্‌টাড্‌—জমীদারের গোমস্তা, তবে আপাতত কাজকর্ম নেই,—বেকার। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো রাঙা, মুখের দুপাশে ঝোলানো—এবং এক পা একটু খোঁড়া। একটি নোংরা রাস্তায় ঢুকে হোটেল পাওয়া গেল। সামনের সিঁড়িটা অন্ধকার, দালানের চারদিকে দুর্গন্ধ—সমস্ত জায়গাটায় একটিমাত্র চকচকে জিনিস ছিল—সেটি টেলিফোন। খাবার জায়গাটার কড়িকাঠ অত্যন্ত নীচু, ওপাশে একটা ঝোলানো খাঁচায় একটি টিয়াপাখী। পাখীটা তাদের দেখে কপ্‌চে উঠলো। একটি পক্ককেশ মহিলা কানে একটি শ্রুতিযন্ত্র লাগিয়ে এসে দাঁড়ালো। মহিলা বললে, কি? হ্যাঁ ঘর একটা আছে বৈ কি। আমার মেয়ে সব ঠিক ক'রে দেবে।

খাবার সময় একজন পক্কশ্মশ্রু ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ হোলো। ক্যাপ্টেন

বললে, তাহলে তোমার নাম সেগুস্টাড্—কেমন? আচ্ছা, তুমি বোধ হয় ইন্দেরা গাঁয়ে আমার পুরণো বন্ধু সেগুস্টাডের কেউ হও?

আন্দ্রে ফস্ ক'রে বললে, হ্যাঁ, তিনি আমার কাকা। তবে আপাতত তিনি শয্যাগত।

তাত' বটেই, বয়েস হয়েছে কিনা! তা প্রায় বিরাশী বছর তাঁ'র বয়স হলো, না?

পঁচাশী। আন্দ্রে বললে। অথচ কা'র সম্বন্ধে সে কি বলছে তা সে কিছুই জানেনা।

এমন সময় একজন স্থূলদেহ বৃদ্ধ তামাটে রংয়ের পরচুলা পরে একটি বয়স্কা নারীর সঙ্গে এসে ঢুকলো। লোকটি এই বাড়ীওয়ালীর পিতা, নাম ইভারসেন —ব্যাঙ্কে কাজ করে। আন্দ্রে বিশেষভাবে তাকে পর্যবেক্ষণ ক'রে ভাবলো, এর চেহারা যদি হুবহু নকল করতে পারি তবে ত লোকে বেশ প্রতারিত হ'তে পারে।

ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করলো, তারপর? আজ কত লাখ টাকা নিয়ে এক ব্যাঙ্ক থেকে অন্য ব্যাঙ্কে আনাগোনা করলে, ইভারসেন?

রাঙা চোখ দুটো ফিরিয়ে বুড়ো বললে, তা লাখ লাখ, বলতে বাধা নেই!

আহারাদির পরে আন্দ্রে ব্যাঙ্কের জমাদারের সঙ্গে আলাপ জমালো। বুড়ো তা'র চাকরীর কথাবার্তা আর কাজের হিসেব বলতে লাগলো। সে বহু ব্যাঙ্কের বিল নিয়ে বহু ব্যাঙ্কে যায়, টাকা আনে, আবার টাকা নিয়ে যায় নানা জায়গায়—ফিরে আসে বিল নিয়ে। চামড়ার ঝোলাটায় তা'র টাকা আর বিল সবই থাকে। এ ছাড়া আরো দু'চারটে দরকারী কথা আন্দ্রে জেনে নিল, তারপর চুপ ক'রে গেল। বুড়ো ভাবলো ছেলেটি বেশ ভদ্র,—কথা ব'লে তৃপ্তি!

দিনের পর দিন যায়। আন্দ্রে শহরে ঘুরে বেড়ায়। একদিন ক্যাপ্টেন বললে, শুনলাম তুমি এখানে নতুন—চলো তোমাকে দেখাই সব। বড় রাস্তায় এসো, অনেক বিখ্যাত লোকের দর্শন মিলবে। ঠিক এই সময়টায়—বুঝলে, বুড়ো ইবসেন চায়ের দোকান থেকে বেরোয়! চাই কি ভাগ্যের জোরে এদেশের প্রধান মন্ত্রীরও দেখা পেয়ে যেতে পারো—এই সময়টায় তিনি অফিস থেকে ফেরেন।

কপাল ভালোই। প্রথমে তা'রা দেখলে একটি ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধকে। মাথায় কালো সিল্কের টুপি আর চশমা, পরণে একটা আঁটসাঁট কোট—দ্রুতপদে চলেছে। আন্দ্রের মনে পড়লো ইবসেনের সকল নায়কের ভূমিকায় সে অভিনয় করেছে,—'ইংস্ট্রাণ্ডের' ভূমিকায় তা'র অভিনয় সর্বশ্রেষ্ঠ। আন্দ্রে কল্পনা করলো, এ লোকটির জীবনটা কেমন! তা'র মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে! তা'র জীবন-কাহিনী, স্মৃতি, স্বপ্ন, দিব্যদর্শন—এসব কিরূপ! ওর মতন হওয়া যায় না? আন্দ্রে যেন দিব্যভাবে অনুভব করলো, সে ইবসেন, মস্ত গ্রন্থকার সে। ইবসেনের মতো বিশেষ ভঙ্গীতে কয়েক পা সে হাঁটলো! হ্যাঁ, ইবসেন সে নিজে।

সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায় তা'র সামনে দিয়ে। মাঝে মাঝে সে যায় রঙ্গালয়ে, বেশীর ভাগ সময় ঘরের মধ্যে পড়াশুনোয় কাটে। ভ্রমণকাহিনী তার সবচেয়ে বেশি প্রিয়, তারপর ইতিহাস—যেমন সে আগেকার কালে প'ড়ে যেতো। নেপোলিয়নের বিষয় পড়তে গিয়ে যেন সেই ব্যক্তিকে চোখের সামনে দেখা যায়, তা'র ব্যক্তিত্বকে আত্মসাৎ করা যায়, তা'র মতন হওয়া যায়। কোনো বইয়ের ভিতর দিয়ে সে ভ্রমণ ক'রে আসে মেক্সিকো, আবার কোনো বইয়ে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে। সে যেন জ্বরে আক্রান্ত হোলো, যেন বিষাক্ত বর্শার

ঘায়ে আহত হোলো। প্রতি পৃষ্ঠা নূতন দৃশ্য আনে। আন্দ্রে, আন্দ্রে কোথায়? রোমান নৌবহরের কর্ণধার হ'য়ে চলেছে কার্থেজে আগুন জ্বালাবার জন্য! হ্যাঁ, এই যে আমি, আমার নাম সিপিয়ো!!

মিঃ সেণ্ডস্টাড্, আসুন, খাবার দিয়েছে!

হ্যাঁ, ব্যাঙ্কের বুড়ো জমাদারই বটে। লোকটা বন্ধু হয়েছে! আন্দ্রে প্রায় সব সময়েই অলক্ষ্যে বুড়োর রক্তাভ চোখ আর কুঞ্চিত মুখের চেহারা নিরীক্ষণ করে—; মুখের বলি-রেখা মুখ গহ্বরের কোণ থেকে নীচের দিকে নেমে গেছে। সব দেখে সে। মানুষটাকে যেন মনে প্রাণে সর্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা সে গ্রাস ক'রে নেয়।

একদিন নিরিবিলিতে আন্দ্রে বুড়োর চামড়ার ঝোলাটা খুললো। কতকগুলো বাজে বিল, আর কিছু না। কয়েকখানা বিল পকেটে পুরে সে ঘরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে পরীক্ষা করতে লাগলো। দেখলো, দোকানের সই আর অফিসের ছাপ। লণ্ডনের এক ব্যাঙ্ক থেকে পূরো দু'হাজার পাউণ্ড তোলা হয়েছে।

এর পর থেকে লোকটার সঙ্গে আলাপ শেষ ক'রে সে যখন প্রতিদিন ঘরে ঢোকে, তখন কেমন যেন একটা অদ্ভুত উত্তেজনা তা'র মনে মনে। লোকটা যেন তা'র পায়ে পায়ে জড়িয়ে তা'র সঙ্গে ঘরে এসে ঢোকে। আন্দ্রে যেন লোকটার সম্বলিত পদক্ষেপ অবধি গ্রাস করে—কম্পিত দু'খানা হাতও—ঠিক অমনি ক'রে ঘন ঘন নিজের চোখ রগড়ায়, ঠিক অমনি ক'রে হাঁটু দুটো আগে বাড়িয়ে চলতে থাকে! এর মানে কি? এ কোথায় গিয়ে থামবে?

একদিন বুড়োকে রাত্রে খাবার সময় দেখা গেল না। বাড়ীর গিন্নি বাপের অসুখের জন্য হাউমাউ ক'রে কেঁদে জানালো, আসছে কাল হাসপাতালে বুড়োর শরীরে অস্ত্রোপচার হবে।

পরদিন আন্দ্রে বেরিয়ে পড়লো একটি চামড়ার ব্যাগ হাতে নিয়ে, এবং কোথায় যেন ছোট একটা হোটেলে গিয়ে একটি ঘরভাড়া নিল। সেখান থেকে সে যখন বেরুলো তা'র মুখখানা যেন সেই ইভারসেনের মতন, সেই পাটকিলে রংয়ের পরচুলা, রাঙা চোখ, মুখে বলিরেখা—বয়সে বৃদ্ধ। তা'র সঙ্গে ছিল চামড়ার ব্যাগ, তা'তে রয়েছে কতকগুলি এক্সচেঞ্জ বিল,—তারপর তা'র নিজের পা দু'খানাকে সোজা চালিয়ে দিল ক্রেডিট্ ব্যাঙ্কের পথে। হ্যাঁ—সে ইভারসেন—অন্তরে বাহিরে। এই কাজ ক'রে ক'রে সে যেন কত অবসন্ন, কত ভারাক্রান্ত! হয়ত তাকে হাসপাতালে যেতে হবে, হয়ত বা অস্ত্রোপচারই করাতে হবে! ঠিক এই মুহূর্তে, ঠিক এই সময়ে আর একটা মানুষ তা'র ভিতরে প্রবলভাবে জাগ্রত রয়েছে—সে চায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি, সে চায় উন্মাদনা। কিন্তু—কিন্তু সে কী ভাবে?

ব্যাঙ্কে সে ঢুকলো। বাইরে কুয়াসা, পথে আলো টিমটিম করছে। ভিতরে বেশ কাজকর্ম চলছে,—লোকদের আনাগোনা, কলকোলাহল—অনেকে অপেক্ষা করছে কতক্ষণে তাদের ডাক পড়বে। ক্যাসিয়ার নাম ধরে ডাকছে—যারা টাকা পাবে অথবা জমা দেবে, তারা যাচ্ছে এগিয়ে। পিতলের খোপরের ভিতর দিয়ে একটি যুবক বুড়ো গোমস্তার দিকে লক্ষ্য করলো, তারপর মিষ্টকণ্ঠে ডাকলো, এই যে ইভারসেন, আজ এখানে যে?

আন্দ্রে ব্যাগ খুলে বিলগুলি বাড়িয়ে দেবার আগেই কাসলো, তারপর গলা পরিষ্কার ক'রে জবাব দিল, এই সামান্য কাজে—

নম্বর মার্কা চাকতি সে নিল, ধীরে ধীরে এক জায়গায় বসলো। নিজের নাকটা ঝাড়লো, চোখ রগড়ালো, কপাল মুছলো। বুড়ো হওয়া সত্যিই যে কঠিন। ধরো, দুর্ভাগ্যক্রমে যদি ইভারসেনের ওখান থেকে আর কোনো

গোমস্তা এসে বেয়াড়া প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে? দাঁড়াও, আর কয়েকটি মুহূর্ত—হয় হাতভ'রে টাকা আসবে, ঐশ্বর্য আসবে—নয়ত, নয়ত, কারাগার! তবু আন্দ্রে ব'সে রইলো শান্তভাবে, নির্বিকারভাবে—ঠিক এইভাবে, যেন সে ইভারসেনের বাস্তব ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করেছে। সে স্মরণ করতে থাকে এই মস্ত বড় ব্যাঙ্কের জন্য সমস্ত জীবন ঢেলে কত কাজ সে করেছে! বাড়ীতে রয়েছে তা'র একটি মেয়ে। মেয়েটি অন্যায় ক'রে ফেলেছে বৈ কি—দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হয়! মেয়েটির একটি সন্তান রয়েছে। থাকগেঁ, আর কিছু না—জীবনটা যেন একটা বোঝা!

এমন সময় ক্যাসিয়ার তা'র নম্বর ডাকলো।

পরিচ্ছেদ—৮

সব দিন সহজে ঘুম আসে না, দীর্ঘরাত অবধিও নয়। আন্দ্রে স্পষ্ট চোখে জেগে থাকে। আসল কথা সেই ধর্মপ্রচারক তা'র পিছু পিছু আসে, যেন এসে প্রবল কণ্ঠে তাকে তিরস্কার করে। সে চোর, সে প্রতারক, সে পাজি। গরীব লোকেরা তাদের সঞ্চয় রাখে ব্যাঙ্কে, তোমার অন্যায়ের জন্য তা'রা দুঃখ পাবে। তা ছাড়া বুড়ো ইভারসেনকে চাকরি থেকে তাড়ানো হবে, কারণ সে চোর! ভাবো দেখি, এর পরে কেমন ক'রে তা'র চল্‌বে? কিন্তু আন্দ্রে ইতিমধ্যে যে অনেক পড়াশুনো ক'রে পণ্ডিত হয়েছে, সে ওই ধর্ম-প্রচারকদের দাবিয়ে রাখার জন্য আর একটা মানুষ খাড়া করেছে। সে মানুষটা তরুণ, ফুরফুরে সিগারেট-টানা তরুণ। অনেকটা রাসায়নিকের মতন—

দরকার হ'লে বোমা তৈরী করতে পারে। বিশেষ ক'রে একজন বক্তৃতাবাজ, বিপ্লব প্রচারক—অর্থাৎ আধুনিক আদর্শবাদী। সেই যুবকটি যেন বলছে, টাকাগুলো হ'চ্ছে একদল পুঁজিবাদীর, তা'রা গরীবকে দোহণ করার জন্য সোনা খাটায়। নিজেদের ধনদৌলত বৃদ্ধির জন্য তা'রা কত প্রতারণা প্রবঞ্চনা ক'রে চলেছে? অগণ্য, অপরিমেয়—নিশ্চয়ই। তুমি কি বিশ্বাস করো তাদের বিবেক দংশন করে? তুমি একটুও ভেবো না, আন্দ্রে! তুমি ত সেই ডাক্তারকে দু'হাজার ক্রোনার ফিরিয়ে দিয়েছিলে! আর যাই হোক, তুমি সাধু লোক!

বিছানায় শুয়ে মাথা নেড়ে ধর্মপ্রচারকের দিকে চেয়ে আন্দ্রে বললে, হ্যাঁ, সাধু আমি নিশ্চয়ই! এরপর তোমাতে আমাতে আর কোনো কথা নেই, বুঝেছ? আমার যেদিকে ঝোঁক সেইদিকে চলবো, আমার স্বাভাবিক বুদ্ধি যা বলে তাই শুনবো। যাও, নমস্কার। এতক্ষণ দু'জনে কাটিয়েছি তা'র জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। যাও।

একটু পরে আন্দ্রে চোখ খুলতেই এসে দাঁড়াল তা'র বিছানার প্রান্তে বুড়ো ইভারসেন—এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে ব্যাগ। বুড়ো বললে, ভয় পেয়ো না, আমি! আমি বৃদ্ধ ইভারসেন—আমার ছাঁচ কেন থাকে হাসপাতালে—জানতে চাই! এ কেবল তোমার জন্যে। তুমি একটু একটু ক'রে আমাকে গিলেছ! একটু একটু ক'রে তুমি আমার ভঙ্গী আয়ত্ব করেছ, তোমার নিজের স্বার্থের জন্যে আমার মেদ-মজ্জা-মাংস চেটে চেটে খেয়ে আমাকে ছিবড়ে ক'রে দিয়েছ! এখন সেই ইভারসেন, অর্থাৎ আমি—এখন হাসপাতালে!

হঠাৎ আন্দ্রে বিছানায় উঠে বসলো। বিড়-বিড় ক'রে বললে, একি মাতলামি? বার বার ধরা না প'ড়ে কি আমার মাথা খারাপ হয়েছে! কই, এখানে কেউ নেই ত?

ধরো যদি কেউ ভ্রমণ করতে চায়—নিজের ওপর কারো বিশেষ দৃষ্টি না পড়ে—এমনভাবে ঘুরতে চায়—তবে সে বহু লোকের মাঝখানেও অতি সহজে তা পারে। সে যদি জানায় সে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী—কেউ কিছু ধরবেও না। ধরো সেই ভ্রাম্যমাণের নাম মিঃ হানসেন—সে কিছু ব্যক্তিত্ব নয়, সে হোলো সাধারণ লোক—সে একই পথে যতবার খুশি আনাগোনা করতে পারে, কেউ কিছুই সন্দেহ করবে না।

গ্রীষ্ম ও বসন্তে তীরগামী স্টীমারে বেড়ানো কী সুন্দর! প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা কত মজার লোক। অনেক সময় সরকারী কর্মচারীরা থাকে, বিদেশী ভ্রাম্যমাণরাও—এবং আবার হয়ত কখনও পার্লামেন্টি কমিটির দল চলেছে তদন্তে। হয়ত একজন পারস্য রাজকুমার, কিম্বা ভ্রাম্যমাণ রঙ্গালয় কোম্পানী, —অর্থাৎ যত রকমের লোক। তরুণী মেয়েরা অনেক সময় একা বেরিয়ে পড়ে ভ্রমণে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান সঙ্গী জুটে গেলে খুশি হয়,—আন্দ্রের জানা ছিল।

ক্রিষ্টিয়ানায় তা'র শেষ কীর্তির পর নিজের সম্বন্ধে তা'র প্রবল আস্থা জন্মেছিল। সে বেশ জানে, লোককে বিশ্বাস করাতে সে আগুন-খাপরার কুলী থেকে আরম্ভ ক'রে স্টেট-সেক্রেটারী পর্যন্ত—যে কোন ভূমিকায় সে অভিনয় করতে পারে। তবে কেন সে সকলের মধ্যে একজন হ'তে পারে না। যাত্রীরা কোন ছোট শহরে নামে, আন্দ্রের কেমন যেন একটু উত্তেজনা হয়। তা'র অজ্ঞাতে অনেক কিছু হয়ত ঘটতে পারতো। কিন্তু স্টীমার ছেড়ে দিত, জীবনটা আবার চলতো তরতর ক'রে।

স্টীমার-ডেকের ওপর একখানা আল্‌গা চেয়ারে গা এলিয়ে আন্দ্রে সিগার টানে—সামনে দিয়ে পাহাড়, পাথর আর দ্বীপগুলি পেরিয়ে যায়। কোথায়

চলেছে সে? সে চলেছে নূতন দুঃসাহসের পথে, অভিনব ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পথে। সম্ভবতঃ আগামী কাল সে হ'য়ে উঠবে রাজপুত্র। তা'র সমস্ত জীবনটাই যেন রূপকথা, সে যেন এই যাদুর বিরুদ্ধে তা'র সব প্রতিরোধ ঢিলে ক'রে দিয়েছে। সে সীজারও নয়, সিপিয়োও নয়, কিন্তু সে অশ্রুতপূর্ব মূঢ় দুঃসাহসিকতায় সমর্থ, সমগ্র জগতের বিপক্ষে সে একা। নিজের খেয়াল খুশিমতো পৃথিবীকে সে মানিয়ে নিতে চায়,—এবং সে তা পারে বৈ কি!

পায়চারি করতে করতে নিজেকে সে আর একটি মনের মধ্যে ডুবিয়ে সকৌতুকে ভাবে, আমি ত ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী!—আপন মনকে সে আর একটি কল্পিত ব্যক্তির অন্তরে তলিয়ে দিয়ে মনে মনে বলে, আমি মিঃ হানসেন, ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী! আমার মায়ের নাম ছিল মেরী, বার্গেনে আমার এক বোন আছে। সেখানে আমি ইস্কুলে পড়তুম। আমার কি মনে পড়ে সেই ল্যাটিন শিক্ষককে? কত দিন হোলো আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি? হ্যাঁ, গ্রীণউইচ এণ্ড সন্স কোম্পানীর তরফ থেকে বছর পাঁচেক হোলো বৈ কি। তা বেশ।

হয়ত কোনো একজন পাইপ মুখে দিয়ে পাশ থেকে ব'লে যেতো, চমৎকার সন্ধ্যা, মিঃ হানসেন!

সত্যি চমৎকার—হানসেন বলে—কিন্তু শোনো ভাই, আচ্ছা, ডেকের ওপর একটা নাচের আসর করা যায় না? ওই যে মেয়েদের দেখে মনে হচ্ছে ওরা রাজি হবে।

দেখি তবে চেষ্টা ক'রে—লোকটি ব'লে যায়!

একদিন একটি কৃশকায় যুবক উঠলো স্টীমারে। আন্দ্রের চোখ পড়লো তা'র দিকে। পোষাক চমৎকার—সহজ গাম্ভীর্যে নিজেকে সে মস্ত একজন বলে যেন প্রকাশ করছে। কথা বলার সময় ঈষৎ হাসি ফোটে তা'র মুখের

কোণে—মানুষটার মতনই যেন সে হাসিটুকুর আকর্ষণ! কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটি অসামান্য পরিপূর্ণতা। নিজের অজ্ঞাতেই আন্দ্রে সেই নবাগতর দিকে এগিয়ে যায়। অনেক লোক আছে যাদের ব্যক্তিত্ব অতি মধুর, চুম্বকের মতো তারা টানে। সহসা আন্দ্রে নিজের প্রতি যেন বিতৃষ্ণ হ'য়ে উঠলো। সেই নবাগতর মতো হ'য়ে ওঠার জন্য যেন তার অস্পষ্ট পিপাসা জাগতে থাকে; নিজেকে বদলে নেবার, স্বভাবকে ওল্‌টাবার—এমন কি, ওই যুবকটির অবিকল ব্যক্তিত্ব টেনে নেবার কী যেন পিপাসা! যুবকটির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার কী উল্লাস, কী আনন্দ! তা'র কথাবার্তা শুনতে শুনতে কী যেন চাপা মধুর গীতিময়তা! ওর মতো হ'তে পারিনে? আমার স্বভাবে কি ওই রকম গুপ্ত যন্ত্র নেই যার থেকে উঠে আসে এমন সুষমার মাধুর্য?

নবাগত একদিন নেমে গেল তীরভূমিতে। আন্দ্রের জন্য রেখে গেল দিবাস্বপ্ন আর আনন্দ কল্পনা। একদিন আন্দ্রে নেমে গেল কাপ্তেন আর বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে। বলে গেল, আশাকরি আবার দেখা হবে।

সেই দিন থেকে আন্দ্রে হোটেলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাজ আরম্ভ ক'রে দিল। তোমাকে যদি আলাস্কা প্রত্যাগত নরউইজীয়ন ইঞ্জিনীয়র হ'তে হয়, তবে তা'র বাইরের নিখুঁৎ চেহারাটাই সব নয়, তা'র জীবন-কাহিনীও য়, তা'র স্বভাব-চরিত্র অথবা মুদ্রাগুলিও নয়। স্টীমারে ব'সে ওই বিষয় করার মতো কিছু বিদ্যাও তা'র মতো হওয়া চাই। আন্দ্রে গ্রন্থ প্রকাশকের কাছে গেল,—বই পড়তেও সময় লাগে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই লোকটার মতো মুদ্রাভ্যাস করতেও সময় ক্ষেপ করতে হয়; তা'র হাসি, তা'র তো কাশি ও গলা পরিষ্কার করা, তা'র মতো উচ্চারণের ঝোঁক—সমস্তই। তা'র বিশেষভাবে বসবার কায়দা, তা'র বক্তৃতার সময়কার বিশেষ প্রকারের,

ছন্দোময় হাতনাড়া—এরাও। প্রথম ও প্রধান হোলো তা'র আশ্চর্য হাসি! এসব কাজ দুরস্ত করতে আন্দ্রের সময় লাগবে সন্দেহ নেই,—গুন-গুন ক'রে একটা সুর ধ'রে সে অভ্যাস করতে থাকবে। অনেক-সময় শ্রান্তভাবে সে ব'সে পড়ে, অনেক সময় সে সব ছেড়েছুড়ে দেয়—আবার অনেক সময় অনুপ্রাণিত শিল্পীর মতো সে তন্ময় হ'য়ে কাজ ক'রে যায়। এইভাবে দিন চলে।

হোটেলের ঝি সিঁড়ি ঝাঁট দিচ্ছিল, এমন সময় একজন আগন্তুক ঝি তা'কে আগে উপরে উঠতে দেখে নি—নেমে এসে বললে, একটা কথা বলছিলুম তোমাকে। আমার বন্ধু হানসেন এইমাত্র উত্তুরে যাবার পথে স্টীমারে গেছে। সে আমায় ব'লে গেল তোমাদের পাওনা টাকাকড়ি চুকিয়ে দিতে—আর তা'র মালপত্তরগুলো যদি বাপু তোমরা মাল-তোলানি ভেলায় চড়িয়ে দাও!

আগন্তুকের কাছে মোটা বকশিস পেয়ে মেয়েটি রক্তাভ মুখে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, দেবো বৈ কি!

আর একবার আন্দ্রে ভ্রমণে বেরুলো। এই অভিনব ব্যক্তিত্বের মধ্যে সে ডুব দিল এবং তার মনে হোলো, সে দেখে চলেছে নতুন চোখে নতুন দৃশ্যাবলী—এর আগে এমন ক'রে সে আর যেন দেখে নি। যেন তা'র নব আবিষ্কার—অভিনব বিশ্ব-সৌন্দর্যে সে যেন উত্তীর্ণ। এত দূরে-দূরে এসে আপন অভিজ্ঞতাবলীকে বারম্বার উপলব্ধি। আলাস্কার সম্বন্ধে যা কিছু সে বইতে পড়েছে—সব যেন তা'র আপন জীবন-স্মৃতি! সে ছিল সোনার খনির পরিচালক। তার বেশ মনে পড়ে ছেলেরা কেমন ক'রে রিভলভার ধরতো,—তা'র মনে পড়ে সেখানকার উজ্জ্বল তারকাঙ্কিত আকাশ; মনে পড়ে ভারতীয় তরুণীদের মধুর সঙ্গীত! এমন জীবন তা'র কাছে মনোরম বৈ কি। সে

চলেছে, এগিয়ে চলেছে। আগেকার ভ্রমণকালের অনেক বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা,—কিন্তু তা'রা আন্দ্রেকে চিনতে পারলো না। সব চেয়ে কৌতুকের কথা, জনৈক হাকিম—এর আগে যিনি মিঃ হানসেনকে উপেক্ষা করেছিলেন—তিনি এবার ইঞ্জিনীয়র মিঃ স্টারকে অভ্যর্থনা ক'রে পাশে বসতে বললেন। কেউ কোথাও তাকে সন্দেহ করছে না, সুতরাং নিজের মনে নিজেই আন্দ্রে বক্র হাসি হাসতে পারতো বৈ কি। এই ধরো যেমন, তা'র কাছাকাছি ছিলেন গাঁয়ের ডাক্তারবাবু—তিনি বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরে গরীব-দুঃখীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তদন্ত ক'রে বেড়ান, অথচ নিজে তিনি তামাক আর মদে ডুবে থাকেন,—নিজের আঙ্গুলের ময়লা নখগুলির দিকেও তা'র গ্রাহ্য নেই! যে-ব্যক্তিবিশেষকে আন্দ্রে নিজের থেকে উদ্ঘাটন ক'রে তুলেছে,—সে ওই ডাক্তারের চেয়ে বড়। স্টীমারের টেব্‌ল-এ বসে জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে যত রকমের মতবাদ—সে সব শুনলো। কা'রো মুখমণ্ডল বিশ্বাসে কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে, কারো সংশয়ে—কারো নিষেধ বুদ্ধি ওলোটপালট হ'য়ে ওঠে রাজনৈতিক উত্তেজনার মতো—অর্থাৎ একজন আরেকজনের ঘাড়ে নিজের মতামতটা চাপাতে চায় জোর ক'রে। কিন্তু আন্দ্রের উদ্ঘাটিত ইঞ্জিনীয়র শান্ত ও সুরুচিসম্পন্ন। ধূমপানের ক্যাবিনে ঢুকে সোডা আর মদ ঢালাঢালি করতে করতে পরচর্চা উন্মত্ত হয়ে ওঠে—গ্রাম্য মেয়েলি জটলার চেয়েও সেগুলি কুশ্রী—সেখানে খ্যাতিমান লোকেরা নিন্দিত আর কলঙ্কিত হয়—অথচ সেটা নাকি ভদ্র অভিজাত সমাজ! কিন্তু ওরা এটাকেই বলে আদর্শ, এটাই নাকি নির্ভুল প্রত্যয়! আন্দ্রে-সৃষ্ট ব্যক্তিটি এদের থেকে অনেক উঁচুতে।

এমনি করেই দিন গড়িয়ে যায়।

একদিন সকালে বোধ হয় দাঁতে বুরুশ ঘষার সময়ে আন্দ্রের মাথায় ঢুকলো নতুন কল্পনা। সে ভাবলো, ছদ্মবেশের ছাঁচে আর অভিনয় নয়! কিশোরকাল থেকে তা'র বাসনা, তা'র বালকোচিত স্বপ্ন—মোটামুটি ঠিক এমনিধারা একটা মানুষে নিজেকে পরিণত করা চাই। এবারে তাই হোক। সপ্তাহখানেক ধ'রে তা'র কল্পিত মানুষটাকে সে গ'ড়ে তুলবে, মৌলিক ভঙ্গী যোগ ক'রে দেবে—তারপর একদিন বহির্জগতে তা'কে বার ক'রে দেবে। যেমন ভাবা অমনি কাজ। আন্দ্রে তীরভূমিতে নামলো। কাপ্তেন এবং তা'র সহকারী আন্দ্রেকে টুপি তুলে অভিবাদন জানালো,—নমস্কার, আবার যেন দেখা হয়!

আশা করি!—ব'লে আন্দ্রে চলে যায়।

নতুন শহরে নামতে আর তা'র ভয় নেই। পুলিশ সেখানে যেন কা'কে খুঁজে বেড়াচ্ছে—কিন্তু সে ব্যক্তির কোনো অস্তিত্ব নেই! আন্দ্রে এক জীবন থেকে অন্য জীবন ঘুরে বেড়ায়; যেন বারম্বার মৃত্যুর পর বারম্বার নূতন দেহে নব জন্মলাভ। আন্দ্রে স্টীমারের ডেক-এ প্রায়ই চুপ ক'রে ব'সে থাকতো—আপন কল্পনার পথে স্বপ্নজাল বুনে চলতো! কোনো ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী অসুস্থ হ'য়ে মরতে পারে, কোনো ইঞ্জিনীয়র তা'র নিজের লোকদের হাতে নিহত হ'তে পারে—কিন্তু সে, সে নিজে,—সে এদের ওপরে, সকলের ওপরে। অশ্রান্তভাবে নিজের জীবনকে সে পরিবর্তন ক'রে চলেছে,—মৃত্যু আর মহাকালের ফাঁদ যেন তা'র কাছে হার মেনেছে। মানুষের জগতে সে যেন ছোট একটি নদী,—যেন অনন্তকালের পথে অক্লান্ত প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। ভাবতে ভাবতে সহসা চকিতজাগ্রত তা'র মন গুপ্ত হাসির ফেনায় যেন ফেনিয়ে উঠতো,—পরিহাস বোধ তা'র নিত্য জাগ্রত ছিল।

বন্দী বিহঙ্গ

শহরে একদিন এক বিদেশী এসে উপস্থিত। লোকটি জনৈক ইংরেজ—যেমন খাড়া তেমনি শক্ত! তা'র সঙ্গে বারোটা বাক্স—প্রত্যেকটায় লেখা—"কাঁচ, সাবধান!" জাহাজ থেকে সেগুলি নামাবার সময় লোকেরা সাবধান-সতর্ক হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল। বারোটা বাক্স অত সাবধানে নামানো হোলো বটে, তবে সেগুলোর মধ্যে পাথরের টুকরো আর পুরনো খবরের কাগজ ছাড়া আর কিছু ছিল না। কাগজগুলোতে খবর পাওয়া গেল, কিছুকাল আগে ক্রিষ্টিয়ানায় এক ব্যাঙ্কে মস্ত প্রতারণা হ'য়ে গেছে। বহু টাকার প্রতারণা—অনেকগুলি বড় শিরোনামা। সমগ্র দেশ-ব্যাপী উত্তেজনা। বিস্ময়ের কথা এই, ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর বিলগুলি দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ মিঃ ইভারসেন এত সুপরিচিত এবং বিশ্বাসী যে ডাইরেক্টর টাকা দিতে কোনো সঙ্কোচ করেন নি। তাছাড়া গভর্ণমেণ্ট হাসপাতালের বইতে দেখা যায় যে, ব্যাঙ্কের গোমস্তা বুড়ো ইভারসেনের শরীরে ঠিক সেইদিনই অস্ত্রোপচার করা হয় এবং সেজন্য সম্ভবত সেই বিশেষ দিনে ব্যাঙ্কে সে আসতে পারে নি। উকীল আর পুলিশরা মাথার চুল ছিঁড়িতে আরম্ভ করেছে; সমগ্র দেশ হতচকিত, বিমূঢ়।

উত্তর দেশের একটি ক্ষুদ্র শহরে একজন কঠিন ধর্মনীতিপরায়ণ ব্যক্তি এসে ঢুকলেন। সমবেত জনমণ্ডলীর ভিতর থেকে প্রধান ব্যক্তিরা তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য নৌকাযোগে উপস্থিত। পুরোহিত মহাশয় জাহাজ থেকে বেরিয়ে পাটাতন পথে এগিয়ে এলেন—ভদ্রলোকেরা তখনই তাঁকে চিনলো,—মেথডিস্ট মাসিকপত্রে এঁরই প্রতিকৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘকায় সুদর্শন পুরুষ, কেইজারের মতো গোঁফ। একহাতে একটি সুটকেস, অন্য হাতে বর্ষাতি। বললেন, নমস্কার, ভাই সব!

বয়স্ক একজন বললে, শনিবারের আগে আসতে পারবেন ভাবি নি। মনে হচ্ছে আপনি শনিবারে আসবেন বলেছিলেন।

পুরোহিত বললেন, যতটা পথ মনে করেছিলুম, তা'র চেয়ে কম।

নব পুরোহিত ঠাকুর একটি বিবাহ উৎসব সমাধা করলেন। কয়েকটি শিশুকে দীক্ষিত ক'রে জাতে তুললেন—এবং পরবর্তী শনিবারে গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী তাদের সভাস্থলে পুরোহিতের জন্য একটি অভিনন্দনের আয়োজন করলেন। অতঃপর সন্ধ্যার পরে সহসা ফটকের কাছে একটা গোলমাল শোনা গেল। একজন আগন্তুক ভিতরে ঢোকবার জন্য চেষ্টা করছিল। সকলেই সেদিকে ফিরে তাকালো। রাঙা রঙের গোঁফওয়ালা একটি খর্বকায় লোক—গোঁফ জোড়া ঠিক কেইজারের মতো—সটান এসে দাঁড়ালো, উদভ্রান্তভাবে তাকালো—সমবেত জনমণ্ডলীকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিরীক্ষণ করলো।

একটি লোক তা'কে দেখিয়ে দিল, ওই যে নতুন পুরোহিত ঠাকুর—!

নতুন পুরোহিত ঠাকুর তখন একদল তরুণীর দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে কোকো পান করছিলেন।

আগন্তুক চশমা তুলে সেদিকে স্পষ্ট চোখে তাকালো। তা'র নিজের চেহারা অপরের মুখমণ্ডলের উপর সুস্পষ্ট প্রতিকৃত দেখে ভদ্রলোক উত্তেজিত ভাবে দ্রুত নিশ্বাস ফেলছিলেন। অবশেষে বললেন, হ্যাঁ, কিছু মনে করবেন না—আমি—আমিই নতুন পুরোহিত!—এই ব'লে তিনি এগিয়ে এলেন।

অপর অভ্যাগতটি কোকোতে চুমুক দিয়ে বন্ধুর মতো বললেন, আমিও ভাই।

দু'জনে দু'জনকে শ্রদ্ধা জানালেন। জনমণ্ডলী তাঁদের ঘিরে দাঁড়ালো। আগন্তুক বললেন, আমার বিশ্বাস কোথাও কিছু ভুলচুক হ'য়ে থাকবে। আমার নাম জনসন—মানে, হ্যারি জনসন।

অপর পক্ষ বললে, হ্যাঁ, আমারও যে তাই নাম।

কিয়ৎক্ষণ চুপ। তবে কি আপনার নামও হ্যারি ক্রিষ্টিয়ান জনসন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!—ব'লে পুরোহিত ঠাকুর কোকোর পেয়ালাটা রেখে দিলেন টেবিলের ওপর।

আগন্তুক একজনের থেকে আরেকজনের দিকে তাকালেন। নিজের কপাল মুছলেন—অর্থাৎ দু'খানা হাত নেড়ে নিজে উপলব্ধি করতে লাগলেন, নিজের হাতে চিম্‌টি কেটে ভাবতে চেষ্টা করলেন, তিনি বাস্তবিক জাগ্রত আছেন কি না।

কিছু একটা ঘটনার কথা জানালে যদি কিছু সুবিধা হয়, এইভাবে জড়িতস্বরে তিনি বললেন, আমি এইমাত্র স্ট্যাভাঙ্গারের জনসভা থেকে আসছি।

বিস্ময়কর জবাব এলো, আজ্ঞে আমিও।

কি?—দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে খর্বকায় আগন্তুক বললেন, আপনিও এসেছেন স্ট্যাভাঙ্গার থেকে?

নিশ্চয়ই!—মেকি-পুরোহিত রুমাল দিয়ে মুখ মুছে উত্তর দিল, আমি স্ট্যাভাঙ্গারে চার বছর ধ'রে পৌরহিত্য করেছি।

চার বছর! আপনি? স্ট্যাভাঙ্গারে? অসম্ভব!

আগন্তুককে দেখে মনে হয়, তিনি যে এখনও পাগল হন নি, এজন্য সমবেত জনতার কাছে মার্জনা চাইছেন।

পুরোহিত ঠাকুর রুমাল দিয়ে আঙ্গুল মুছে রুমালখানা পকেটে রেখে বললেন, এবার গুরুদেব আমাকে এখানে পাঠালেন, এখানকার জনসমাজে কাজ করবার জন্ত।

আমাদের গুরুদেব পাঠিয়েছেন আপনাকে? আপনি বলছেন…… আপনাকে?—বেঁটে লোকটি যেন সমর্থন লাভের জন্ত থতিয়ে থতিয়ে কথা বলছে!

সমবেত প্রত্যেকে নির্বাক। অবশেষে জনৈক তরুণ গৃহসজ্জা-ব্যবসায়ী মিঃ অলসেন সাহসভরে বললে, এ ঘটনা অদ্ভুত বটে। একথা বলতে চাইনে যে, দু'জনেই প্রতারক। কিন্তু আপনি…এই আপনি আজ এসেছেন এখানে—আপনার মাথায় দেখছি টাক—কিন্তু কাগজে যে লোকের ছবি ছাপা হয়েছে, তা'র মাথায় টাক নেই।

খর্বকায় লোকটি মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, টাক! হ্যাঁ, কয়েক বছর আগে ফটো নেওয়া হয়েছিল বটে! কি মুস্কিল! আমাদের যে কোনো লোকের মাথাতেই ত টাক হ'তে পারে!

সমবেত লোকদের অনেকেই নিজ নিজ মাথায় যন্ত্রচালিতের মতো হাত বুলালো, এবং আগন্তুকের কথা স্বীকার ক'রে নিল। কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচায়ির পর দীর্ঘকায় পুরোহিত ঠাকুর বললেন, ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আপনি এসে নালিশ জানাচ্ছেন আমি অন্ত কেউ, এবং আপনি হ'তে চাইছেন আমি! এ আমি সহ্য করতে রাজি নই। আপনার সাক্ষ্যসাবুদ নিয়ে কাল বেলা বারোটার সময় একেবার থানায় আসতে পারবেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবো। আমাদের দু'জনের কাগজপত্র নিজের নিজের কাছে আছে—কেমন? এতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। কাল

বারোটায় নিশ্চয়ই দেখা করবো আপনার সঙ্গে! এই ব'লে আগন্তুক নত নমস্কার জানালো, অর্থাৎ এমন প্রস্তাবে সে খুব রাজি। নিজের চেহারা আর পরিচয়ের ভিতটা যেন তা'র ন'ড়ে গেছে,—বাস্তবিকই তা'র গুলিয়ে গেছে সে রাম, না শ্যাম!

দীর্ঘকায় পুরোহিত ঠাকুর যখন বিদায় নিলেন, সকলের দৃষ্টি চললো তাঁর পিছনে পিছনে, তারপরে সেই দৃষ্টি ফিরে এলো যুক্তকর খর্বকায় আগন্তুকের প্রতি। কম্পিতকণ্ঠে আগন্তুক বললে, এসো ভাই-বোনেরা, প্রার্থনা করি!

পরদিন দীর্ঘকায় পুরোহিত আর এলেন না,—পুলিশ গিয়ে তাঁর হোটেলে খোঁজ করলো। জানা গেল, মেথডিস্ট মিঃ জনসন, সেদিন সারারাত ঘুমোন নি। তাঁকে বহুদূর ল্যাপ-ক্যাম্প থেকে একটি মুমূর্ষুর তরফের কে যেন ডেকে নিয়ে গেছে। তাঁকে তাড়াতাড়ি একটি হরিণ-টানা গাড়ীতে তুষারপথে ল্যাপল্যাণ্ডে চ'লে যেতে হয়েছে।

পুলিশের দারোগা বিদ্রূপ-স্বরে বললে, আহা, তাঁর পক্ষে একদল পুলিশের সাহায্য দরকার ছিল বৈ কি।

পুলিশ শশব্যস্তে তা'র খোঁজ করতে ছুটলো, কিন্তু কেউ এটা লক্ষ্য করলো না—সেইদিন সেই গ্রামে জনৈক বেহালা বাদক এসেছে। লোকটি গরীব—কাসির রোগী,—গায়ে তা'র ছেঁড়া কম্বল! যন্ত্রটি সঙ্গে নিয়ে পুলিশের দারোগার নিজ বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে সে বাজিয়ে চলেছে করুণ ক্রন্দন-কম্পিতস্বরে। অবশেষে সেই সুযোগ্য কর্মচারি হন-হন ক'রে বেরিয়ে এসে ভিখারীকে কয়েকটি পয়সা দিয়ে বললে, যাও—চুলোয় যাও।

ভিখারী বললে, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। এই ব'লে পয়সা ক'টি নিয়ে পকেটে পুরে হাসিমুখে যন্ত্রটি নিয়ে টলতে টলতে চ'লে গেল!

এইভাবে ছোটখাটো ঘটনা ঘটিয়ে আন্দ্রে পুলিশের দলকে কর্মতৎপর ক'রে রাখার আয়োজন করলো। উত্তেজনায় তা'র প্রয়োজন ছিল; সে চাইল তা'র নিজের আনন্দ-উপভোগের জন্য সমগ্র জনসমাজ যেন এই ভাবে বিভিন্ন ভূমিকায় রঙ্গাভিনয় ক'রে চলে।

এমন জীবন কী অপরূপ! মানুষগুলো যেন মুখোস ব'নে চললো, আর সেই মুখোসের নীচে ঘড়ির কলকাঁটার মতো যে-যন্ত্রটা—সেটা আন্দ্রে যেন নাড়াচাড়া করে। ধরো, একবার সহসা এক বিখ্যাত ধাত্রীবিদ্ জার্মাণ এক জলাশয়ের ধারে উপস্থিত। লোকটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা নরওয়ের ভাষা বলে, বেশ মিশুকে লোক—ফলে ক্রিস্টিথানার কয়েকটি মহিলা এই সুযোগে দেহ-পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে এলো। ভদ্রলোক টাকা চায় না, দিলেও 'না' বলে না। রোগীকে পরীক্ষা করার পর হাত দু'খানা ধুতে থাকে বহু যত্নে; সাবান-ধোয়া নখ-পরিষ্কারের বুরুশ দিয়ে হাত দু'খানা খুব ক'রে ঘষে—তারপর অভিমত বলার আগে জানলার বাইরে কেমন যেন একবার তাকায় কিছুক্ষণ। মাসখানেক পরে হঠাৎ জানা গেল, লোকটি ছদ্মবেশী,—কিন্তু আর তা'কে দেখতে পাওয়া গেল না! আর কি পাওয়া যায়?

পুলিশ হায়রাণ হোলো। আর একবার কাগজে-কাগজে ছাপা হোলো—"অনুমান হয় অপরাধী দেশান্তরে পলায়নে সমর্থ হয়েছে।"

অন্ধকার রাত্রে নিঃশব্দে চোখ বুজে আন্দ্রে দেখতে পায় তা'র সামনে মানুষের প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা—সে মানুষরা তা'র নিজেরই সৃষ্টি,—কিন্তু তারা প্রত্যেকে পালিয়ে চলেছে পুলিশের ভয়ে। এক একবার সে যেন ওই ছায়ামানবদের জন্য উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠতো, উদ্বিগ্ন হোতো তাদের নিরাপদ ব্যবস্থার জন্য! এইভাবে চলতে চলতে অবশেষে ঘটনার স্রোত বদলালো।

পরিচ্ছেদ—৯

গ্রীষ্মকাল। কোনো একটি বাংলোর বাগানে নানাদিকে ফুল ধরেছে। পথে পথে সমুদ্রের স্নিগ্ধ বাতাস ব'য়ে চলেছে। সেই বাংলোর ভিতর মহলে মাতা ও কন্যায় কথা হচ্ছিল।

মা বললে, শিলভিয়া, একটা কথা বলি শোনো মা। একেবারে অচেনা অজানা লোকটা···ওর সম্বন্ধে তুই আর একটু সাবধান হ', মা।

তরুণী মেয়েটি লেস বোনা থেকে মাথা তুলে জানলার দিকে তাকালো। প্রবীণা জননী একধারে ব'সে কি যেন একটা বুনছেন। মেয়ে বললে, মা, তুমি মিঃ উইলম্যানকে অচেনা অজানা বলছ?

হ্যাঁ, আমরা কতটুকু জানি ওর সম্বন্ধে?

কাগজে যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকুই জানি। উনি আসামাত্র এখানকার দু'খানা কাগজের লোক ওঁর সঙ্গে দেখা করে। ওঁর বক্তৃতা শুনে আর সকলের মতন তুমিও ত উৎফুল্ল হয়েছিলে, মা?

হ্যাঁ, তা অবিশ্যি। তবে কিনা ব্রেজিল দেশের জীবনের কথা ভালো ক'রে গুছিয়ে বললেই ত' আর,—এই ব'লে ডাক্তার-পত্নী মাঝপথে থেমে বোনার কাঠি দিয়ে ওর চুলটা নাড়লো।

কিন্তু স্টীমার চলাচল সম্বন্ধে ওর কত জানাশোনা—সেটা কিছু নয় বুঝি? কত ব্যবসায়ী লোকের দরকার ওই সব কাজে,—আর নরওয়ের মালপত্র নিয়ে কত বড় কারবার চলতে পারে বাইরের বাজারে—এই সব আলোচনাগুলো?

তুমি ত জানো ভদ্রলোক দিনরাত কী খাটেন! আমার নিশ্চয় বিশ্বাস উনি বড় বড় মহৎ কাজ সমাধা করবেন।

মা বুনে চলেছেন। বললেন, হ্যাঁ, তা মানি। আমিই ত ওকে এ বাড়ীতে আসতে বললুম। ওর কথাবার্তা চালচলন ভারি চমৎকার! ওর মতন বাইরের লোককে যদি একবার মেনে নেওয়া যায়, তবে এসব লোক সকলেরই প্রিয় হ'য়ে ওঠে। তবে কিনা—

কি, মা?

তুই ত বুঝিস মা, আমাদের সাবধান হবার কারণ আছে?

কথাটা সত্য। শিলভিয়ার বয়স বাইশ চব্বিশ—দু' দু'বার তা'র বিবাহের পাকা কথা হয়,—কিন্তু দুটো বিয়েই যায় ভেঙে। এ নিয়ে নানাপ্রকার কানাকানি আছে বৈ কি। শিলভিয়ার মতামত শুনে অনেকদিন থেকেই মা বাপের মনে দুর্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু নবাগত ব্যক্তিটির আসবার পর থেকেই দেখা যায় শিলভিয়ার লঘুচঞ্চল পদক্ষেপ, মুখখানি পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল,—এবং তা'র মলিন বিমর্ষ দু'টি চোখ যেন সস্নেহ কৌতুকে প্রাণময় হ'যে উঠেছে। মায়ের কথা শুনে শিলভিয়া ছুঁচের কাজটা পাট ক'রে উঠে দাঁড়ালো। গুন-গুন করতে করতে জানলার কাছে গেল।

এখন যাচ্ছিসনে ত ওর সঙ্গে দেখা করতে?

শিলভিয়া জবাব দিল না, কেবল মাথাটা হেলিয়ে কপালের উপর থেকে কালো ঘন চুলগুলি দুলিয়ে ফিরিয়ে নিল। তারপর দু'হাতে মায়ের গলা ধ'রে মুখের ওপর গাল পেতে কিয়ৎক্ষণের জন্য চোখ বুজে রইলো। তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল।

মাথায় ঝাপ্টাওয়ালা একটি নতুন টুপি প'রে সে বাইরের সিঁড়িতে এসে নামলো। উপর দিকে তাকিয়ে দেখলো কার্ণিশে একদল ঘুঘু বসেছে। ছুটে

সে আবার ভিতরে গেল, এবং একমুঠো মটরের দানা নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘুঘুর জন্য। মনে হোলো আর সকলের আনন্দ না হ'লে নিজের আনন্দের ভার তা'র নেওয়া চলবে না।

ফুলে ফুলে ভরা উদ্যান—চারদিক মধুর উত্তাপে ভরা; মধুর—মধুর বাতাস। চকিত চিন্তায় সে ভাবলো, হয়ত আড়াল থেকে কেউ দেখছে কোথায় আমি যাই! কিন্তু এদিক ওদিক—আর কোনোদিকে চাইবো না!

শহর থেকে একটু বাইরে ঘন সবুজ দুর্বায় ভরা একখণ্ড প্রাঙ্গণ উঁচু হ'য়ে উঠে গেছে পাহারের গায়ে,—সেখানে উইলম্যান থাকে তা'র অপেক্ষায়। লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান যুবক—মাথায় কালো ঘন চুল, পরিচ্ছন্ন কামানো মুখ, দুধে-আলতায় মেলানো গায়ের রং। গরমকালের পাংলা জামা ও সজ্জায় তাকে চমৎকার মানায়। বাঁ-হাতের কব্জিতে জড়ানো সোনার একটি চেন্—পায়ে মার্কিনি চামড়ার জুতো।

এতক্ষণে এলে?

অপেক্ষা করছিলে বুঝি?

বালি-পাথরের পথ বেয়ে তারা উপর দিকে চলে—একটি ডালপালা ছাওয়া পরিচ্ছন্ন বিতানে। শিলভিয়া বলে, বন্ধু, তোমার ছোট-বেলাকার কথা কই কিছুই ত বললে না?

সত্য নাকি?—উইলম্যান বলে, তোমার ছোটবেলাকার কথা শুনতে যে আরও আনন্দ, শিলভিয়া!

শিলভিয়া বলে, না, আজ আমার কথা রাখো, আমি জানতে চাই—তোমার দেশ-ঘর কোথায়! ছোটবেলা তোমার জীবন কেমন ছিল? আমি যে তোমার সব জানতে চাই, বুঝতে পারো না বুঝি?

উইলম্যান বলে, প্রিয়ে, ছোটবেলা ব'লে আমার কখনো কিছু ছিল না। 'আমি রূপকথার সেই দূত—আমার কেউ নেই, মা-বাপ কাকে বলে জানিনে। তুমি কি সেজন্যে আমাকে ঘৃণা কর ?

শিলভিয়া তা'র হাতখানা ধ'রে কঠিন মধুর চাপ দিল। এই নিষ্ঠুর জগতে এত মেহন্নত করা সত্ত্বেও ওর হাতখানা কী চমৎকার! এই রূপকুমারের সব কথা কেনই বা তা'র জানার এত দরকার? দূরের থেকে এসেছে এই বলিষ্ঠ তরুণ—ঝড়ে ঝাপ্টায় দুঃসাহসিক অভিযান-কাহিনীর ভিতর দিয়ে—এর কত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা! এরাই ত সামান্য কুঁড়েঘরে জীবন আরম্ভ ক'রে একদা স্বকৃত হ'য়ে ওঠে! ভগবানের ইচ্ছা, সে কি এমন পুরুষের সহচারিণী হ'তে পারে না?

আবার তাদের আলাপ মনোহর প্রলাপে ভ'রে ওঠে! নির্জনে দু'জনে চলতে চলতে একজন আর একজনের দিকে হাসিমুখে তাকায়। দু'জনের আলাপ যেন মধুর সুরে গাঁথা একটি দ্বৈত সঙ্গীত—যেন কথার চেয়ে সুরের দিকে তাদের অন্তরের যোগ। আগামী শরতে উভয়ের বিয়ের কথাটা দু'জনে তোলে, ব্রেজিল ভ্রমণের কথা বলে। এ ছাড়া নব বিবাহিতার জন্য কি-কি সামগ্রীর দরকার, বিবাহিত নরনারীর প্রণয়-সম্পর্ক, মৃত্যুর পরে জীবনের স্বরূপ,—এই সব আলোচনার মাঝখানে এক একবার থেমে একজন আরেকজনের চক্ষুর ভিতরে তাকায়।

পাহাড়ের মাথায় উঠলো তারা দু'জনে। দূরে অবসন্ন সন্ধ্যা কী মনোরম সোনার গৌরবের মধ্যে মলিন হ'য়ে চলেছে—এমন দৃশ্য আর কোথাও নেই। দূর দিগন্তে আকাশ ও সাগর মিলেছে—একটি সুস্পষ্ট কম্পিত স্বর্ণাভায়। তারই রেখাপথ বেয়ে ভেসে চলেছে ছোট ছোট দ্বীপের উপর দিয়ে সমুদ্র-পক্ষীর

বলাকা—তাদের দীর্ঘ শীর্ণ কণ্ঠস্বর দূর থেকে দূরে শূন্যলোকের অসীম আনন্দের বার্তা নিয়ে ছুটে চলেছে।

উইলম্যান বললে, একটু বসবে না এখানে, প্রিয়ে ?

শিলভিয়া বললে, না, এক্ষুণি বাড়ী ফিরবো !—এই ব'লে সে বসেই পড়লো। তারপর তা'র মাথাটি কাৎ হয়ে এলিয়ে পড়লো পুরুষের কণ্ঠের পাশে।

সেদিন গভীর রাত্রে তরুণ যুবকটি একা চললো জলাশয়ের তীর বেয়ে। এক সময় সে ব'সে পড়লো। ভাবতে লাগল আপন জীবনের রূপক-কাহিনী। একদা একটি বালক ছিন্ন মলিন বসনে টুপিটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, আর তা'র সামনে দিয়ে বনপথ বেয়ে চ'লে যেত একটি তরুণী। দু'জনের একজন এসেছে তা'র কাছে, এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু সেই বালক আর সেই অরণ্য ! তা'রা কি শুধু স্বপ্ন ? সত্য কোন্‌টা, কোন্‌টা বা কল্পনা ? এটা ত সত্য, এডল্‌ফ্‌ উইলম্যান একজন বাস্তব ব্যক্তি ! সে চোখ বুজলো, ব্রেজিলকে স্মরণ করলো; সেখানে তা'র পল্লীগৃহ, তা'র সেই জ্বর হওয়া, সেই সর্দি-গর্মি লাগা—সেই সেখানকার বিষাক্ত সরীসৃপ আর বন্য জানোয়ার ! সব কি সত্য নয় ? শুধু কেবল এইটুকু যে, এডল্‌ফ্‌ উইলম্যানের কিছু পরিচয়-পত্রের দরকার—যা দেখালে ঘটা ক'রে তা'র বিয়ে হ'তে পারে— কিন্তু সেগুলি কোথায় সম্ভবত তা'র মনে নেই। কিন্তু তারপর ? একজনকে সে জানে যে, আসল পরিচয়-পত্র দাখিল করতে পারে ! কিন্তু মিঃ উইলম্যান হোলো একজন ভদ্রলোক—বিশ্বপৃথিবীর বিনিময়েও সে কোনো তরুণীকে সংশয়ের মধ্যে ফেলতে রাজি নয়। তা'ছাড়া শিলভিয়ার মতো তরুণী—যার এত করুণ নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা—তাকে ত নয়ই ! আর কিছু না হোক—এই জীবন তা'র

কাছে একটি রোমাঞ্চকর প্রণয়ানন্দ রস বহন ক'রে এনেছে। এই মেয়েটি জীবনে দু-দুবার ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে প'ড়েও তা'র আহ্বানে উঠে দাঁড়িয়েছে, দু'হাত বাড়িয়ে ধরেছে তা'র দিকে। বলেছে, "বিশ্বের মানবতার প্রতি আজো আমার একবিন্দু বিশ্বাস রয়েছে, আমি সেটুকু তোমার কাছে নিবেদন করছি!" সে দেখেছে শিলভিয়ার দু'টি গাল ভ'রে উঠেছে আনন্দময় স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে! আ, কী সুন্দর, কী অপরূপ—তবু অন্যদিকে এ যেন ক্ষণিক বিস্ময়। এর আগে সে এমন কোনো ছদ্ম-মানুষ সৃষ্টি করে নি, যে-মানুষ মৃতকে জাগিয়ে তুলতে পারতো। কিন্তু এর শেষ কোথায়? অনেক সময় আন্দ্রে অবসন্ন বোধ করে—যেন মাঝ-পথে থেমে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে নিজের স্খলিত বিক্ষিপ্ত বৃত্তিগুলিকে তুলে নেয়। কোথায়—,আমি কোথায় এখন? এই দেশেই কি ডন জুয়ান বাস করে?

সেটা গ্রীষ্মকাল। গোধূলিরাত্রে সমুদ্রপথে অভিযানের সময়। তাদের শাদা নৌকাখানি তীরভূমি ছেড়ে দূরে চ'লে যাবে সন্ধ্যার মৃদু-মন্দ বায়ুভরে; সূর্য নামবে অস্তাচলে; পালতোলা নৌকার কৃষ্ণ-ছায়াটি দেখা যাবে পিছনের দূর দিগন্তে স্বর্ণাঙ্কিত রেখাবলীর পটভূমিকায়। তা'র চোখ দু'টি শিলভিয়ার মুখের উপর বুলিয়ে সে শুধু ভাববে, একি সত্যিই তুমি আর আমি, শিলভিয়া? এ যদি সত্য হোতো, যদি কোনোদিন আমাদের এ নৌকা কোনো ঘাটে কখনো না দাঁড়াতো!

ছোট ছোট কলহ, তাই নিয়ে চোখের জল, তা'র পরেই হাসি, তা'র পরেই আদর আর চুম্বন। হয় ত শিলভিয়া বলতো, এডল্‌ফ্, তুমি সব সময় সত্যি কথা বলো না ত? দোহাই, তোমাকে আমি বিশ্বাস করিনে।

সে হয়ত বলতো, তবে এত যে গল্প বললুম, এসব কি শুনি?—তা'র

প্রশ্নের উত্তরে শিলভিয়া হয়ত ধরিয়ে দিত, তা'র আগেকার বলা কাহিনীর সঙ্গে পরের বলা গল্পের মিল ঘটেনা অনেক সময়ে। বাস্তবিকই, শিলভিয়ার ভারি মুস্কিল,—মুখের কথায় বিশ্বাস করা ছাড়া তা'র ত আর কিছু নেই! তাকে বিশ্বাস করাতে গেলে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হয়, অনেক আদর জানাতে হয়। কিন্তু এসব যেন হোলো,—তা'র পরিচয়-পত্রের কথাটা? সত্যি, একটি তরুণীর আওতার মধ্যে থাকা কী অদ্ভুত! তা'র মতামতের সঙ্গে নিজের মতামতটা কখন্ নিঃশব্দে যেন জড়িয়ে যায়। একদিন শিলভিয়া জিজ্ঞেস ক'রে বসলো, আচ্ছা, শ্রমিক আর ধনীকের মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক কি রকম বলো ত? —শিলভিয়ার মাথার মধ্যে এই সব সমস্যা ভিড় করে, এজন্যে সে বিমর্ষ হয়ে উঠলো। সুতরাং সে যে প্রকার উত্তর শোনা পছন্দ করে, আন্দ্রে সেই রকমই উত্তর দিল। শিলভিয়া যেভাবে চিন্তা করে, সে করে না কেন? যাই হোক, এইভাবে আহরণ করা অভিমতগুলি সোহাগের মতো ক'রে শিলভিয়া তার প্রাণের মধ্যে নিঃশ্বাসের মতো ভ'রে দেয়—এবং সেইজন্যই সেগুলি এত দরকারী, এত মূল্যবান। সে যতটা মধুর, তা'র চেয়েও শিলভিয়া যেন তাকে মাধুর্যে রূপান্তরিত ক'রে তোলে। শিলভিয়ার কাছে থাকলে সে যেন সকল মিথ্যা আর প্রতারণা থেকে মুক্তিলাভ করে, যেন মুহূর্তে উপলব্ধি করে ওরই মতো সে নিষ্পাপ। সহসা সে যেন ভাবে, তা'র পায়ের তলায় পৃথিবী তাকে এই মুহূর্তে গ্রাস ক'রে নিক্।

কিন্তু তা'র কাগজপত্র?

আন্দ্রের চমক ভাঙে। একই জায়গায় সে ব'সে ব'সে এক মনে কী যেন ভাবছে—ওদিকে দূর দ্বীপাবলীর প্রান্তে রক্তিম প্রভাত উঠেছে জেগে। আনত উড্ডীন সমুদ্র-পাখীর ডানার ঝাপটে জলবিন্দু ঠিক্‌রে পড়ছে। নূতন

প্রভাত দেখা দিয়েছে, একটি দিন আরেকটি দিনের অনুগমন ক'রে চলেছে! আর দেরী করা চলে না, শীঘ্রই এ-ব্যাপারটা মীমাংসা করা দরকার।

তবে কি সে স্বীকারোক্তি করবে? কিন্তু তা'র ফলে শিলভিয়া আবার যে ভেঙ্গে পড়বে! তা'হলে উইলম্যানের জায়গা কে নেবে? আর বাস্তবিক, উইলম্যান কেই বা? আন্দ্রেকে খুঁজে বার করার জন্য সে পৃথিবী পরিক্রমা করতে পারে! কতদূরে আন্দ্রেকে সে ফেলে এসেছে,—এবং কতকাল ধ'রে সে কেবল একটা ভূমিকা, একটা কল্প-কাহিনী, একখণ্ড শিল্প—সে ত' আর কিছু নয়। সে ত মানুষ নয় যে, কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করবে! স্বর্গে অথবা মর্তে এমন শক্তি কি কোথাও নেই যে, তাকে সাহায্য করতে পারে?—উইলম্যানকে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে?—যে সব-কিছুকে সত্য ক'রে তুলতে পারে?

প্রার্থনায়, বিশ্বাসে, কর্মে, ত্যাগে, বদান্যতায় অথবা ভিক্ষায় এমন সহায়তা কি কোথাও নেই? মুক্তি পাবার পথ কি নেই, একটিও নেই?

তবে কি সে এই বাঁধন ভেঙে দিয়ে মেয়েটাকে খুন করবে? নিরুদ্দেশে পালাবে কোথাও?—তা'হলে হয়ত মেয়েটা তা'র স্মৃতিকে জাগরূক রাখবে নিজের মনে চিরদিন!

আহা, বেচারী শিলভিয়া!

পাঠচ্ছেদ — ৯০

বড়দিনের ঠিক আগে ক্রিষ্টিয়ানা নগরের কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে কটি নূতন বন্দী এসে জুটলো। আর সকলের থেকে তা'র আচরণ সম্পূর্ণ থক—সে একগুঁয়ে জেদীও নয়, ভগ্নহৃদয়ও নয়। সোজা সহজ দৃষ্টিতে তাকায়—কোনো জিনিস চায় না, কোনো কিছুর সম্বন্ধে জানতেও চায় না। অতি যত্নে কারাগারের পোষাকটি পরে—যেন এখনি নৈশভোজনের সভায় যাবে। তা'র প্রকোষ্ঠের নম্বর ১৪, এবং তাকে ঝুড়ি তৈরী করতে হয়। তা'র কোনো আত্মীয় তা'র কথা জানতে চায় নি। সে কখনও চিঠি লেখার অবসর চায় নি। কারাগারে সাধারণত বড়দিনের পূর্ব-সন্ধ্যাটি বন্দীদের উদ্বিগ্ন ও অস্থির ক'রে তোলে। তখন হয়ত ফুঁপিয়ে কান্নাও শোনা যায়, অথবা তীব্র হাস্যস্বরও কানে আসে। কেউ হয় ত উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনায় বসে, কেউ বা অস্থির পদক্ষেপে প্রকোষ্ঠের এধার থেকে ওধার অবধি অশ্রান্ত পারচারি করে। ১৪ নম্বরটি কিন্তু প্রতিদিনের মতো আজও নীরব। বড়দিন ব'লে তা'র গ্রাহ্যও নেই, এসব তা'র কাছে যেমন তেমনি।

একজন যুবক কারাপরিদর্শনের ও বন্দীদের সঙ্গে আলাপ করার অনুমতি পেয়েছিল। একদিন সে ১৪-নম্বরে এসে ঢুকলো। নবাগতর চেহারা একহারা, চোখে চশমা, কিন্তু তা'র চোখে যেন আগুন দপ-দপ করছে। বন্দীর সঙ্গে করমর্দন করলো—যেন উভয়ই সমান, অথচ তা'র গায়ে পড়া বন্ধুত্বভাব নেই। বন্দীর জীবন-কাহিনী শোনার অনুগ্রহটুকু সে ভিক্ষা চাইল। ১৪-নম্বর তাকে অভিবাদন জানালো। তারপর চোখ বুজে হাসলো। বললে, আমার কাহিনী?

সে কি? আপনার নিজের ব্যবহারের জন্যে বুঝি লিখে নিতে চান সত্যি নাকি?

কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে সে নিজের কাহিনী বলা সুরু করলো।

একটি উৎপীড়িত বালকের কাহিনী ধীরে ধীরে গভীর বেদনাময় হ'
এলো। বালকটি মার খেতো, পদাঘাত সইতো, উপবাস করতো, এবং জাম
কাপড় পেতো না। মা ছিল মাতাল, সৎ-বাবা হোলো চোর। অ
নোংরা জীবনযাত্রা। পরবর্তীকালে সে এক হাত থেকে অন্য হাতে ঘুর
লাগলো, যেখানেই যায় সেখানেই উৎপাড়ন। এবং দিনরাত খেটে খেটে
অসুখে পড়লো। এর ফলে যেটা স্বাভাবিক পরিণতি তাই হোলো,—তাই এখ
সে এখানকার কারাগারে।

যুবকটি নিজের ঠোঁটে পেন্সিল ভিজিয়ে তাড়াতাড়ি লিখে নিতে লাগলো-
মাঝে মাঝে কেবল বিষণ্ণ নিশ্বাস ফেলে। অতঃপর সম্পূর্ণ গল্পটা লিখে নি
কাগজপত্র গুছিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

তোমার এত অশান্তি কিসের জন্যে বলতে পারো?

বন্দী গম্ভীরভাবে ভাবলো। তারপর বললে, পাপের জন্যে, শয়তানে
জন্যে।

পাপ! শয়তান!—যুবক হেসে উঠলো—না আমি কখনও···উহুঁ···এ
সাংঘাতিক দায়িত্ব কে বইবে আমি তোমাকে বলবো। তুমি কি কোনোদি
একথা ভাবো নি?

বন্দী ঘাড় নাড়লো।

সমাজ এর জন্যে দায়ী!

বন্দী চোখ খুললো, চোখে যেন নতুন আলো এসে পড়লো।

বললে, এমন কথা বলবেন না, আমি কখনো সেকথা ভাবি নি। হ্যাঁ, সমাজ ত বটেই।

নানা কথা ক'য়ে যুবকটি এক সময় ক্লান্ত হ'য়ে এগোয়। ১৪-নম্বর তাকে দরজার কাছে দু'পা এগিয়ে দিয়ে আসে। জেলের ওয়ার্ডার চাবি বন্ধ ক'রে দেয়। ঝুড়ি নির্মাতা তা'র কাজ আরম্ভ করে হাসিমুখে মৃদু মৃদু গান গেয়ে।

কারাগারের কঠিন জীবন। একজন আর একজনকে দেখতে পায় না। অনেক সময় প্রকোষ্ঠগুলিতে উত্তাপও দেওয়া হয় না। ফলে, কোনো বন্দী হয়ত কাসতে কাসতে গলা ভাঙে। কেউ হয়ত নিউমোনিয়ায় নিঃশব্দে রাত্রের দিকে মারা পড়ে। চারদিকের ধূসর প্রাচীরের বাইরে সে খবর পৌছয় না। সংসার আবার তেমনি চলে। বাইরে মানুষের সুখ-দুঃখ, নানা সংঘাত—কিন্তু কারাপ্রাচীরের ভিতরে আনাগোনার পথে কেবল পদ-শব্দের ঘটনা ছাড়া আর কিছু নেই। প্রত্যেকটি পায়ের শব্দ পৃথকভাবে পরিচিত,—সেই শব্দে যেন বাইরের জগতের নানা কাহিনী লুক্কায়িত। কান পেতে শোনো। ওটা প্রহরীর পদশব্দ, ওটা তদন্তকারীর। আর একটু শোনো: একেবারে নির্ভুল, ওই শব্দটা ডাইরেক্টরের নিজের।

একদিন কারা-পুরোহিত মশাই ১৪-নম্বরে ঢুকলেন। লম্বা চওড়া লোক, জুলীয়স সীজরের মতন লাল মুখ, মাথায় কালো টুপি, বেশ হোমরা চোমরা লোক। তিনি এখানে আছেন গত বিশ বছর। সুতরাং মানুষের কোনো কিছুতে তাঁর বিস্ময় নেই।

নমস্কার বন্ধু, ভালো ত?—এই বলে তিনি বাইরে থেকে আনা একখানা টুলে বসলেন। বললেন, তাহলে এতদিন পরে আমাকে ডাকলে? আমার বিশ্বাস, এতে আমরা দু'জনেই উপকৃত হবো।

জানলায় আলো কম। বাইরে হয়ত চৈত্র মাসের তুষারপাত। বন্দী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মলিন হেসে তাকালো। বললে, আমি ভাববার সময় চেয়েছিলুম, অনেক জটিল গ্রন্থি খুলতে হবে কিনা।

সে ত বটেই, ছ'মাস ধ'রেই তোমাকে ভাবতে গেলো। আচ্ছা, কী ভাবছিলে, একথা জিজ্ঞেস করা কি খুব বাচালতা হবে?

পিছন দিকে হাত দু'খানা রেখে বন্দী কয়েকবার ছোট ঘরটিতে পায়চারি করে নিল। তারপর বললে, আমার মনে পড়ে, আমি যখন হ্যানোভর নগরের ইঞ্জিনীয়রিং কলেজে পড়তুম…

কি? হ্যানোভরে ইঞ্জিনীয়রিং কলেজে পড়তে তুমি?—পুরোহিত অবাক হ'য়ে তাকালেন।

বন্দী চোখ বুজে নিজের কপালে টোকা দিয়ে বললে, ক্ষমা করবেন… আমি বলতে যাচ্ছিলুম গ্রীণউইচের এক কারবারে আমি যখন তা'র ভ্রাম্যমাণ এজেণ্ট ছিলুম…

পুরোহিত আর একবার বাধা দিলেন, কোনো কারবারে তুমি কি কখনো এজেণ্ট ছিলে?

প্রশ্নটা এড়াবার জন্য বন্দী একবার হাতখানা ঝাড়া দিল। বললে, হ্যাঁ, তা যাকগে—আমি ভাবছিলুম ব্রেজিলে আমি যখন একখণ্ড কফি বাগানের মালিক ছিলুম…

পুরোহিত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এসবের মানে কি? তোমার কি ধারণা আমরা তোমার সম্বন্ধে কিছু জানিনে? তোমার নাম আন্দ্রে বার্জেট; উত্তরের লোক তুমি, অনেকবার তুমি জেল খেটেছ; এক সময় তুমি অভিনেতা ছিলে। তুমি নানা পরিচয় নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও তোমার

আসলে কোনো কাজ ছিল না। আমার সঙ্গে যদি আলাপ করতে চাও, ভণিতা বাদ দাও। তুমি কি মনে করো, এতদিনে তোমার একটুও সংস্কার হবার সময় হয় নি ?

বন্দী মুখ ফিরিয়ে বললে, সংস্কার ! কা'র ?

কা'র বলই না ?

আমিই জিজ্ঞেস করছি, কা'র—বলুন ?—একটা মানুষ হোলো কতকগুলি মানুষের জটিল সমন্বয় !

হুম !

তা'রা সবাই সমান মন্দ নয়। এবার ভাবুন—ধরুন, একজন সাধারণ ধর্মধ্বজী, একজন চাষী, একজন ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী, একজন ইঞ্জিনীয়র, ব্যাঙ্কের একজন গোমস্তা, একজন ধাত্রীবিদ্ এবং আরো কতকগুলির মিশ্রণ,—এদের সবাইকে নিয়েই ত' আমি !

হ্যাঁ, এই সব লোকগুলোই ত' তুমি নিজে !

বলতে পারেন, এদের মধ্যে কা'কে আমি সংস্কার করবো ?

শোনো ভাই—পুরোহিত বললেন—তুমি যদি মনে ক'রে থাকো আমি এসেছি বলেই তুমি আমাকে বোকা বানাতে চাও···

বন্দী বললে, আপনি নিজে কি একই লোক ?

পুরোহিত বললেন, যদি ভালো ক'রে কথা না বলো আমি চলে যাবো।—অতিশয় ঠাণ্ডা বোধ হওয়ায় পুরোহিত পকেটের মধ্যে হাত ভ'রে দিলেন।

বন্দী বললে, যাকগে, ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে আমার কিছু বলবার ছিল, হয়ত একটু অনুগ্রহও চাইতুম। কিন্তু যদি আপনি আমাকে না বুঝে থাকেন, দুঃখের সঙ্গে বলি, আপনাকে এখানে আসতে ব'লে বিরক্তই করেছি !

এই ব'লে নত হ'য়ে সে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

পুরোহিত ইতস্তত ক'রে দরজার দিকে ফিরলেন। এই মানুষটা তাঁর প্রার্থনা স্তোত্রের সময় সম্পূর্ণ বিমনা ছিল, এই এতক্ষণ অবধি যার কাছে পৌছানো কঠিন ছিল—সে ডাকলো তাঁকে অবশেষে! তবে একি পাগলের ভাণ করার মতলব এঁটেছিল?

বন্দী হাসলো। পুরোহিত ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, কি বলবার আছে তোমার?

তা'র সুন্দর চুল এখন রুক্ষ, মুখখানা নিষ্প্রভ। কিন্তু হাসিটি সে বজায় রেখেছিল—নিজের প্রতি, জগতের প্রতি। দাঁতগুলি তা'র পরিচ্ছন্ন মার্জিত। বললে, ধরুন, আপনি একটা কিছু মনোস্থির করবেন, তখন কি আপনার মনে হয় না আপনি কেমন যেন প্রকাশ্য সভাস্থলে দাঁড়িয়ে? আপনার ভিতরে একজন মানুষ আরেকজনের সঙ্গে তর্ক করে—প্রত্যেকের ভিন্ন মতামত! আমার মধ্যে একজন ধর্মপ্রচারক মাথার চুল ছেঁড়ে, আর একজন ধাত্রীবিদ্ সিগারেট টানে নিশ্চিন্তে বসে। কোন্‌টা নির্ভুল, কা'কে আমি বিশ্বাস করবো? ধরুন, একদিন আপনি কোনো কিছুতে একটা অভিমত দিলেন; তখনই সহসা আপনি উপলব্ধি করলেন আপনি কোনো প্রধান এক ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি ধার করলেন! কেবল যে প্রশ্ন করলেন নিজেকে, প্রধান ব্যক্তিটি থাকলে এখানে কি বলতেন,—শুধু তাই নয়, আপনি সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অনুভব করেন! সে আপনাকে গ্রাস করে, আপনি তাকে গিলে খান্—তাই না? এরকম অবস্থা দিনের মধ্যে আমার প্রায়ই হয়!

পুরোহিত আবার বসলেন, সশব্দে নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, হাঁা, তারপর? আমরা, আমরা সবাই—কঁমবেশী সহজ বৈ কি!

সহজ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!—বন্দী হেসে উঠলো। পুরোহিত তাঁর গায়ের ওভারকোটটা বেশ ক'রে জড়িয়ে বসলেন।

সহজ!—শুনুন, সেদিন একটি লোক এলো চশমা প'রে আর পেন্সিল হাতে নিয়ে। সে শুধু পাগল নয়, জীবন্ত বিজ্ঞাপন। কিন্তু আপনি, আপনি একজন মানুষ, নিতান্তই মনুষ্য! আপনার প্রাণটা কাগজের তৈরী নয়! আপনি নিশ্চয় একজনকে পাগল ব'লে মনে করেন না, যে আপনাকে আপনার সম্বন্ধে ভাবিয়ে তোলে!

পুরোহিত আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি আমায় কি করতে বলো?

হ্যাঁ, তা বটে! আমরা ত কেবল—ধরুন, কেবল মানুষ ত,—কিন্তু আমরা কেউ এক নই; আমরা দেহ ও আত্মা উভয়ের সঙ্গে উভয়কে বিনিময় করি। অনেক সময় বলা কঠিন, এটা আর ওটা—ঠিক কোনটা? আপনার জীবনে কি কোনো বড় বেদনা অথবা বড় আশা ছিল না, যাকে আপনি মানবিক আকার দিয়েছেন? আপনি কি রেলপথে যেতে একবারও ভাবেন্ নি: এই ট্রেণে পুরোহিত চলেছেন? আমি সেই? শূন্য সমাধি ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মৃত মানুষ দেখে কি আপনার একবারও মনে হয় নি, ওই মৃতদেহ আমিই? ইতিহাস পড়তে পড়তে নেপোলিয়নের ঘোড়ায় কি আপনি চড়েন নি কখনো, অথবা মার্টিন লুথারের বক্তৃতামঞ্চে? সেন্টপল কে ছিলেন? আপনি কি কখনো বলেন নি, আমি সেন্ট পল?

আড়ষ্টভাবে পুরোহিত তা'র দিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন, তারপর, এসব বলার আসল উদ্দেশ্যটা কী তোমার?

নিজেকে প্রকাশ করা। আমার অপরাধ হোলো অন্য লোককে অনুকরণ করা। একই ভাগ্যের মধ্যে আবদ্ধ থেকে আমি সুখ-শান্তি পাইনে, আমার নবনব,

জীবনের ক্ষুধা। নবনব বেশ ধারণ করার মধ্যে কেন এত আনন্দ, কেন এত উল্লাস? পুরনো দেহ থেকে নতুন দেহে মুক্তি পাবার জন্তেই কি এই আনন্দ নয়? কেন আমরা আদর্শ বদলাই, বন্ধু বদলাই—কেন আমরা একসময়ের শত্রুর সঙ্গে মৈত্রী পাতাই? পুরুষ মানুষ কেন স্ত্রী বদলায়, কেন উন্নতির চেষ্টা করে, কেন নতুন পদ চায়? সেটা কি ভিতরের মানুষটাকে নতুন মানুষের মর্যাদায় দেখার আকাঙ্ক্ষায় নয়? আমি তাই করেছি! আমার মধ্যে সেই সব বাসনার চীৎকার ছিল, যারা নব নব মানুষের আকার চেয়েছে আমার কাছে। এদের জন্যই আমার পড়াশুনো, আবর্তন-বিবর্তন, অন্তহীন জীবনের আকাঙ্ক্ষা, অপরিমেয় প্রাণতৃষ্ণা!

পুরোহিত বললেন, কিন্তু এটা বিস্ময়ের কথা নয় যে, তোমার সকল ব্যক্তিত্ব-সৃষ্টি হোলো প্রতারণা!

বন্দী বললে, উপন্যাস কিম্বা নাটক, পাথরের ভাস্কর্য—সেগুলোও ত প্রতারণা? তবু সেগুলো যদি নিখুঁত হয়, সেই মহৎ সত্য!

কিন্তু তুমি পাথরের ভাস্কর্য ছিলে না!

বন্দী হেসে জানলার দিকে তাকালো। বললে, আমার সব চেয়ে বড় শিল্প হোলো—মানুষ! আমি বিশেষ অনুপ্রাণিতভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছি। কবি স্বপ্ন দেখে, কিন্তু বাস্তবে তা সার্থক করতে পারে না; সুতরাং কবিতায় তা'র স্বপ্ন সত্য হ'য়ে ওঠে; আমারও তাই। তফাৎ কেবল এইটুকু, আমার স্বপ্ন পুস্তকের ভিতরকার মানুষের মধ্যে আবদ্ধ রাখিনি, পাথরে বেঁধে রাখিনি, আমি নিজের হাত পা দিয়েছিলুম তাদের। আমি তাদেরকে স্টীমারে কিম্বা ট্রেণে চলাফেরা করিয়েছিলুম।

পুরোহিত বাধা দিয়ে বললেন, তাদের অপরাধী বানিয়ে তুলেছিলে সেটাও অনুপ্রেরণা?

বন্দী বললে, শিল্পী জগতের কাছে চায় স্বীকৃতি, তা'র শিল্পকলায় চায় জগতের অনুমোদন। তার শিল্প জীবন্ত—এই আশ্বাস সে দাবী করে। ব্যাঙ্কে যখন আমি মিথ্যা চেকখানা দিলুম, আপনি বলতে পারেন সে কেবল টাকা পাবার জন্য—কিন্তু আমি বলবো তা নয়! আমি বলবো আমার শিল্পসৃষ্টিকে হাজির করেছি নিষ্ঠুর সমালোচকদের চোখের সামনে! শুধু এইটুকু জানার জন্যে,—এটা জীবন্ত হয়েছে কি? একে তোমরা মেনে নেবে কি? আমার শিল্প কি সম্পূর্ণ অভিভূত করে? একি বাস্তব জীবনের মতো নির্ভুল?

পুরোহিত এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, কিন্তু ভালো-মন্দর প্রশ্নটা?

বন্দী বললে, সেটা স্বভাবত নির্ভর করে সেই ব্যক্তির ওপর, যিনি ঠিক সেইকালের একছত্র নায়ক। একজন সাধারণ ধর্মযাজকের বিচারবুদ্ধির সঙ্গে আলাস্কার একজন ইঞ্জিনীয়রের বুদ্ধির কিছু প্রভেদ আছে বৈ কি।

পুরোহিত নিজের ওষ্ঠাধর চেপে আর একবার চলে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সহসা তিনি থেমে নিজের পায়ের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, ভারি ঠাণ্ডা এখানে।—আচ্ছা, তোমার ওপর এখানে কি কিছু মন্দ ব্যবহার করা হয়?

না না—বন্দী বললে, বেশ আছি আমি—এই ব'লে সে আপন তুষারক্ষত হাত দু'খানা পকেটের মধ্যে গোপন করলো।

তোমার আত্মীয়-স্বজন কি কেউ নেই? মা-বাপও নেই? এমন কেউ নেই যে তোমাকে ভালবাসে?

বন্দী মুখ নত করলো, আপন সর্বাঙ্গে তা'র কেমন একটা শিহরণ প্রবাহিত হ'য়ে গেল। বললে, তা···হ্যাঁ···সম্ভবত একজন আছে।

সত্যি? আছে নাকি একজন?—যখন এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, কি করবে তখন?

ভগবান জানেন! অনেক অসার্থক স্বপ্ন আর কল্পনা আছে প্রাণের মধ্যে··· কিন্তু এর পর আর কিছু করতে পারবো ব'লে মনে হয় না। আচ্ছা, আপনি আমাকে একটু অনুগ্রহ করবেন?

সেটা নির্ভর করে······

বন্দী বললে, আমার জন্তে চেষ্টা ক'রে কিছু একটা সন্ধান ক'রে দেবেন।

হুম!

হাঁ,—সেটা এক তরুণী মহিলা সম্পর্কে! আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় তিনি বেঁচে আছেন কিনা। তাঁর এখনও বেঁচে না থাকা অসম্ভব নয়। তাঁর সঙ্গে ব্রেজিলবাসী এক কৃষকের বিয়ের কথা ছিল—কিন্তু বিয়ের এক সপ্তাহ আগে যুবকটি ফয়োর্ডের জলে ডুবে মারা যায়,—তা'র শূন্য নৌকাটাকে ভাসতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সে কৃষক কে জানেন? সে আমি!

পুরোহিত শান্ত স্তব্ধভাবে তা'র দিকে তাকালেন। পরে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন, সে কি!

কিছুকাল পরে—বন্দী বলতে লাগলো, সেই তরুণীদের গ্রামে একটি বৃদ্ধের আবির্ভাব ঘটলো—শাদা মাথার চুল, শাদা এক মুখ দাড়ি। বুড়ো পথে পথে ভিক্ষে করতো, ভোজবাজী দেখাতো। সে বুড়োও হলুম আমি।

ভ্রূকুঞ্চন ক'রে পুরোহিত বন্দীর দিকে তাকালেন। বন্দী হাসলো, দেওয়ালে হেলান দিয়ে ব'লে চললো।

আমি সাহসভরে তা'র মায়ের রান্নাঘরে ঢুকেছিলুম,—দেখি সেখানে একজন সুদক্ষ নার্স রয়েছেন। অনেক রাত্রে আমি বাড়ীর সামনে দিয়ে পেরিয়ে গেলুম, দেখি একটা জানলায় একটু আলো দেখা যায়। তা'হ'লে হয়েছে কি? ওই আলোটুকু দেখে সেদিন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। পরের

দিন রাতে আবার গেলুম। ওখানে দাঁড়িয়ে ওই দিকে তাকিয়ে আমি, এমন কি অন্যায় করেছিলুম? আমার সময়টা আমার নিজের। যদিও তখন শীত, মাঝে মাঝে বরফ পড়ে, রাতের বাতাস খুব ঠাণ্ডা, তবুও সে-শীতকালটা যেন খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল।—হ্যাঁ, আবার বসন্ত এলো,—এক রবিবার সকালে তা'র বাড়ীর সামনে দিয়ে পার হ'য়ে যাচ্ছিলুম। এমন সময় তরুণীটি একখানি ধর্মগ্রন্থ নিয়ে মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে এলো। কত বদলে গেছে সে, পরণে তখন তার শোক-সজ্জা, কিন্তু তা'র কালো ওড়নার ভিতর দিয়ে তা'র মুখ দেখেই চিনলুম আমি! হ্যাঁ, বুড়ো ভিখিরি নিশ্চয়ই বড় রাস্তা দিয়ে ভদ্রলোকের পাশে পাশে যেতে পারে—অবিশ্যি মাঝখানে সশ্রদ্ধ ব্যবধান বজায় রেখে। ভগবান সাক্ষী, আমিও তাই করলুম। আমি মহিলা দু'টিকে অনুসরণ ক'রে গীর্জায় গেলুম। তাঁরা দু'জন অন্যদের থেকে আলাদা বসলেন। মা যোগদান করলেন সঙ্গীতে, কিন্তু তরুণীটি নতমুখে রইলেন দু'হাতে মুখ ঢেকে! এখনও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

তোমাকে সে চিনতে পারে নি?—পুরোহিত প্রশ্ন করলেন।

কি? আমাকে?—কটাক্ষে বন্দী তাঁর দিকে চেয়ে বললে, না, কিন্তু সাহস ক'রে আমি আর একবার তাঁদের রান্নাঘরে ঢুকেছিলুম, যদি ভিক্ষে চেয়ে পেট ভ'রে খেতে পাই! আমি ভাগ্যবান, মেয়েটি এলো রান্নাঘরে। আমার দিকে চেয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করলো। আর আমি! আমি ছিন্নবস্ত্র ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ, আমার ঘাড় কাঁপে বার্ধক্যে, হাত দু'খানা কাঁপে ঠাণ্ডায় অসাড় হ'য়ে। মেয়েটি আমাকে খাবার আর পয়সা দুই দিল। তা'র হাত থেকে ভিক্ষে নেবার সময় আমার কেমন একটা অদ্ভুত চেতনা ঘটলো!—বন্দী চোখ বুজলো।

তারপর ?

তারপর ঘুরে বেড়াই, নতুন ছদ্মমানুষ সৃষ্টির কাজে লাগি,—কিন্তু আগেকার মতো এবারকারগুলো যেন আর নিখুঁৎ ক'রে তুলতে পারিনে। কেন জানেন ? এ নিয়ে অনেক ভেবেছি এবং আমার বিশ্বাস, আমার যে-মূর্তিটাকে ওই মেয়েটি ভালো বেসেছিল, সেই মূর্তিটা আমার নিজের মনেই যেন বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে,—সেটাকে মন থেকে মুছে অন্য ছদ্মমানুষ গড়া আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। এবং তারপর ? তারপর আমার ছদ্মমূর্তিগুলো যেন জড়িয়ে গুলিয়ে গেল,—আর অমনি আমি পুলিশের নজরে প'ড়ে গেলুম। প্রত্যেক মানুষেরই সাধ্যের সীমারেখা আছে ! সুতরাং আজ আমি এখানে।

পুরোহিত নিজের থুঁতনির উপর,আঙুল ঠুকে বললেন, মেয়েটি কে ?

বন্দী তা'র চোখ খুললো, বা'র কয়েক পায়চারি করলো, পকেটে হাত পুরলো. চোখ নত করলো। বোঝা গেল, নামটি সে বলতে চায় না।

পুরোহিত বললেন, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারো, যদি তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই, তা'র নামটিও জানা দরকার !

বন্দী অবশেষে দেওয়ালের দিকে দেখিয়ে বললো, এদিকে দেখুন, আমার নিজের বিদ্যে অনুসারে দেওয়ালে কিছু নক্সা করেছি।—এই ব'লে সে হেসে উঠলো। পুরোহিত এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালের আঁচড় পরীক্ষা ক'রে নাম আর ঠিকানা প'ড়ে নিলেন।

আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি ভেবে দেখবো—এই ব'লে পুরোহিত দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে পুনরায় বললেন, কিন্তু তোমার নিজের ব্যাপারটা ?

ক্ষমা করবেন আপনাকে বিরক্ত করলুম ! আমার ব্যাপার ? আমি কিছু জানিনে।

কিন্তু তোমার ত' আর মাত্র কয়েক মাস ছাড়া পেতে বাকি! তারপর?

যুবক বললে, কেমন ক'রে বলি বলুন? আমি নিজে ঠিক কে তাও জানিনে আমি হলুম ভিন্ন ভিন্ন মানুষের একটা স্মৃতি মাত্র—আমি ছিলুম তাদের সকলের মধ্যে। এখান থেকে যেদিন ছাড়া পাবো, সেদিন কে আমি! জানিনে! মুক্তির দিন পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকি সেদিন আমার মনে হবে আমি যেন ··মুখখানা যেন আমার নিজের নয়। আমার প্রথম কাজ হবে, আমার নিজের জন্য একটা নতুন মানুষের ছাঁচ গ'ড়ে তোলা! আর—আর একটুমাত্র আশার ক্ষীণ রশ্মি রয়েছে······কিন্তু সে অসম্ভব!

আশা?

হ্যাঁ আশা ·····আশা কেউ ছাড়ে না······নির্বোধ আশা হলেও...... হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

তুমি কি সেই তরুণীর কথা আজো ভাবো?

যদি সে এখনও বেঁচে থাকে······সুস্থ থাকে······হয়ত·····কে জানে? হয়ত তা'র কাছে যেতুম, হয়ত তা'র সাহায্য চাইতুম—যদি গোড়া থেকে নতুন কিছু একটা গ'ড়ে তুলতে পারি!—বলতে বলতে মুহূর্তেই কি যেন মনে ক'রে নিজের প্রতিই যেন বন্দী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলো, যেন অনুশোচনায় নিজের হাতের মুঠো পাকালো। শেষ দিককার কথাগুলো ব'লে ফেলে সে যেন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

পুরোহিত বললেন, হ্যাঁ, এ নিয়ে আমি ভাববো!—এই ব'লে তিনি দরজা খুললেন। ওয়ার্ডার তাঁর টুলটা নিয়ে বেরিয়ে এল এবং তারপর সেই দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ আনাগোনার পথে উভয়ের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

বন্দী যেন কতকটা নির্বোধের মতো বিমূঢ় হ'য়ে সামনে চেয়ে রইলো, তারপর,

দাঁতে দাঁতে চেপে নিজের মনেই বললে, কেন ওর কাছে আমি প্রকাশ করতে গেলুম আমার প্রাণের নিগূঢ় চেহারা—মূর্খ, নির্বোধ আমি!

দিন আসে, দিন চ'লে যায়। কচিৎ কোনোদিন তা'র চোখে পড়ে সূর্যের আলো পড়েছে কারাপ্রাচীরের গায়ে। আগের মতো তা'র ধামা তৈরী আজকাল তাড়াতাড়ি হয় না। সে একটা পরিবর্তনের ক্ষুধা বোধ করে, নতুন কাজ চায়, অন্য কিছুতে আঙুল চালাতে চায়। কিন্তু এ-বাসনা কেন? ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ'লে যায়—পায়ের শব্দ দূর থেকে কাছে আসে, কাছ থেকে দূরে গিয়ে মিলোয়। ওদিকে প্রহরী আছে, তদন্তের লোক আছে। একদিন ডাইরেক্টরের পায়ের শব্দও শোনা গেল। বন্দী চোখ বুজে কাজ থামালো। আবার কবে আসবে সেই পুরোহিত? একদিন সন্ধ্যায় সে চমকে উঠলো, কান পেতে শুনলো। কিন্তু পদধ্বনি মিলিয়ে গেল।

সময় যায়, ওখানকার সময়ও চ'লে যায়,—আর একটা ঝুড়িও সে শেষ করলো। এই রকম সময়টায় বাইরে পরিপূর্ণ বসন্ত ঋতু; প্রতিদিন সূর্যের আলো প্রাচীরের গা থেকে নিচের দিকে নামছে। তা'র প্রাণসত্তার ভিতর থেকে কিসের যেন অঙ্কুর দেখা দিচ্ছে, নব ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির কামনা; সৃজনেচ্ছা! একটি পরিতৃপ্ত সুখী মানুষ সে সৃষ্টি করতে চায়।

ধূসর দেয়ালের গায়ে হরিদ্রাভ সূর্যরশ্মির দিকে চেয়ে সে ভাবলো, সূর্যালোক···রৌদ্রময় দেশ, উজ্জ্বল মানুষ···সেই ভূমধ্যসাগর।

রোমান নৌবহরের কার্থেজ অভিযান সম্বন্ধে সে যে পড়েছিল সেই দৃশ্য দেখলো সে অন্তর-সত্তার সমুখে। সিপিয়ো কেমন দেখতে ছিল? তা'র হৃদয়ের কোনো বাসনা অপূর্ণ ছিল কি? আমি কি তা'র আকার পেতে

পারিনে? হ্যাঁ, তা'র সেই নির্জন প্রকোষ্ঠ হ'য়ে উঠলো ভূমধ্যসাগর। একটি নগর অবরোধের কথা যে ভাবে, তা'র আঙ্গুলগুলো ঠিক সেই সময় একটি ঝুড়ি করতে পারে—এ খুবই সম্ভব! তা'র মনে হোলো তা'র বাঁ-কাঁধটা উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে অস্ত্রশস্ত্রের ভারে, কিন্তু কার্থেজ নগরকে ভস্মীভূত করার আগে অস্ত্রশস্ত্র সে নামাবে না। তার পড়া বইয়ের আরো অনেক স্মৃতিতে তা'র মন ভ'রে ওঠে, এবং সে প্রত্যেকটাকে একটি মানবিক ছাঁচ দেবার চেষ্টা করে। এই ভাবে হেঁট হ'য়ে ঝুড়ি তৈরী করতে করতে গুন-গুন ক'রে সে স্তব পাঠ করে; এবং তারই সঙ্গে নব নব কল্পনা আর নব নব স্বপ্ন তা'র মস্তিষ্কের ভিতরে ভিড় করতে থাকে। সে ভাবে, হাজার দশেক বছর পরে এমন একজন আসবে, যে, এই পৃথিবীকে শাসন করবে! কিন্তু সে দেখতে কেমন হবে? আমি কি তা'র ছাঁচ আনতে পারিনে? কিন্তু একলক্ষ বছরের মধ্যে আবার এমন একজন আসবে, যে, তিনটি লোক-অধ্যুষিত ঘূর্ণ্যমান গ্রহকে এক-সংযুক্ত ক'রে এই অসীম বিশ্বলোকে একটি প্রতিরোধ শক্তি গ'ড়ে তুলবে,—একজন সম্রাট, যিনি তারকালোকে রাজত্ব করবেন! তাঁকে কেমন দেখতে হবে? আমি কি তাঁর ছাঁচ আনতে পারিনে?

আশপাশের প্রতিবেশী প্রকোষ্ঠগুলির কয়েদীরা কান পেতে শোনে, একজন আনন্দ-বিহ্বল বন্দী বারম্বার পায়চারি ক'রে গান গেয়ে গেয়ে—গান গেয়ে গেয়ে—

পরিচ্ছেদ—১৭

জনৈক আগন্তুক এসে পৌছলো উপত্যকায়। স্টীমার থেকে নেমে সমুদ্রতীরে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ। বললে, কী সুন্দর জায়গা!

স্টীমারের এজেন্ট বললে, হ্যাঁ, সবাই একথা বলে। আগন্তুক নিজের টুপি তুলে বিদায় জানিয়ে বড় রাস্তাটা ধ'রে সোজা চললো লোক-বসতির দিকে। শহুরে লোকের মতন ওর ফিটফাট পোষাক-পরিচ্ছদ। হাতে একগাছা ছড়ি, পিঠে একটা ঝোলা। মাথার চুল ধূসর, মুখভরা দাড়ি। রোগা মুখখানা বিবর্ণ। অসম্ভব নয় যে, এ লোকটা অনেককাল বন্ধ জায়গায় অবরুদ্ধ ছিল!

এক জায়গায় থেমে ছড়ির উপর ভর দিয়ে সে ভাবলো, হ্যাঁ, আবার বসন্ত এসেছে! ভগবান জানেন আমার যাবার পর থেকে এই উপত্যকায় কতবার বসন্ত এসেছে, আর চ'লে গেছে!

লোকেরা কাজ করছে মাঠে; কেউ আলু পুঁতছে মাটিতে, আরেক দিকে একটি লোক নিড়েন দিচ্ছে। রোদের উত্তাপ বেশ। আকাশে বসন্তের মেঘ আকাশপথে ভেসে চলেছে, চাতকের গান বাতাসকে পূর্ণ করেছে; দোয়েল পাখীগুলো বেড়াচ্ছে নেচে নেচে। প্রাঙ্গণের চারিদিক ফুলে ফুলে ভরা। পথের দু'ধারে ফুটেছে ছোট ছোট তরুলতা ফুল। হেঁট হ'য়ে একটি ফুল সে তুলে নিল: এই যে, কত দিনের পুরনো বন্ধু তুমি! চারিদিকে বসন্তের অগণ্য সুগন্ধ, ভিজা মাটির ঢেলা, লতাপাতা, ডালপালা। নিজের জন্মভূমি ভিন্ন বসন্ত আর কোথাও এত মধুর, এত সত্য নয়! এখন আমি এখানে, তবু এখানে আমি নবাগত। আর কেউ আমাকে চিনবে না।

ধীরে ধীরে আগন্তুক চললো। কোথায় চলেছে তা'র নিজের স্থিরতা নেই। মাঠের লোকেরা মাঝে মাঝে সোজা হয়ে উঠে তা'র দিকে তাকায়। অদ্ভুত একজন বিদেশী লোক বটে! হয়ত পুস্তক-বিক্রেতা, হয়ত জমির জন্ত কৃত্রিম সার বেচে, কিম্বা হয়ত ধর্মযাজক। লোকটা আবার দাঁড়ালো, এদিক ওদিক তাকালো। বাস্তবিক, কত ধরণের অকেজো লোকই ওই বড় রাস্তাটা দিয়ে চ'লে যায়।

অবশ্য প্রায়ই তাকে থামতে হয়। প্রত্যেকটি কুটীর, প্রত্যেক আঁকাবাঁকা পথটি তা'র জানা, প্রত্যেক পাহাড়টির নাম তা'র জিহ্বার ডগায়—তা সেটা যেখানেই হোক! চোখের সামনে বাল্যকালের চিত্রাবলী তুলে ধরলে তোমাকে বিহ্বল হতেই হবে। ছোট ছোট তরঙ্গের মতো অদ্ভুত চেতনা হৃদয়ে আঘাত করতে থাকে। সময় চ'লে যায়—কিন্তু মানুষ ছাড়া এখানে আর কোনো বৈচিত্র্য নেই, পরিবর্তন নেই। যুগের সঙ্গে মানুষের অভ্যাস অদ্ভুতভাবে বদলে যায়।

দু'একজনকে দেখে সে চিন্‌লো। দু'চারজন পথের এত কাছাকাছি কাজ করছে যে তা'র চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা হোলো, আরে, ওলা যে? একি, এযে বেরিট!—কিন্তু সে কিছুই বলে না। এসব আজকে বলার নয়। কিন্তু সে বুঝতে পারলো, মহাকাল ভারি মজার লোক, সকল নারী ও পুরুষের মুখের চেহারা বদলে দেয়, নতুন মুখের চেহারা আমদানি করে। এটা তোমার মুখ, ওগুলো তোমাদের মুখ। নতুন মুখ দেবো পরে. এই চেহারা আগে চড়িয়ে নাও। একই মানুষ—কখনও তা'র মুখ তারুণ্যময়, কখনও প্রবীণ, আবার কখনো জরাজীর্ণতা। আমরা এর বেশী কিছু চাইনে—এই নিয়েই জগতের রঙ্গমঞ্চে আমরা দরিদ্র পথচারি!

ওই যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে, ওই না সেই র‍্যাবেন? আমার সমকালের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিল বটে! মনে পড়ে না কি, ননীতে গড়া মুখখানি ও গোলাপের মতন! রঙীন মুখখানি কী যে রসে ভরা ছিল,—উৎসুক চুম্বে কেউ স্বর্গলাভ করতে পারতো! এখন—ঐ ভাখো……ভাখো। বয়ঃক্রমে পিঠ নুয়ে পড়েছে,—যেন শুকনো চামড়া মুচড়ে গেছে! চোখ দুটো বিবর্ণ ঠোঁট দুখানা শুষ্ক, নিরক্ত! তবু কাজ করে মাঠে আর গান গায়,—জীবন যাত্রার কাছে আমরা এমনই ক্রীতদাস, এতই দাসত্ববন্ধন! হায় দুর্ভাগা নারী হায় সুখী রমণী!

সে আবার হাঁটে। যেতে যেতে প্রায় সবাইকেই চিনতে পারে, তাকে কেউ চেনে না। না, এমন কোনো অভিসন্ধি তা'র নেই। কিন্তু তবু আছে একটা উদ্দেশ্য এখানে আসার; হ্যাঁ, একটি সংবাদ সে এনেছে! বিস্তীর্ণ প্রসারিত প্রাচীরের অন্তরালে নির্জন বন্দীশালায় ব'সে জগতের সব কিছু সম্বন্ধে একটা অত্যুগ্র অদম্য লালসা জাগতে থাকে, আর সেখানে ব'সে যুগ-যুগান্তর কালের বিরাট বিপুল জীবনকে এই জীবনেই উপলব্ধি করা যায় কেন না যেখান থেকে একদিন তোমাকে ঠেলে বাইরের পথে তাড়িয়ে দেওয়া হোলো, সেখানে কেবল একটি যুগই বর্তমান—সেটা বর্তমান কাল! বাস্তবে মধ্যে ছিটকে এসে পড়াটা যেন ঠিক নূতন কোনো গ্রহলোকে ঠিক্‌রে পড়া কোথায় চলেছ? আজ তুমি কে? অন্যান্য ব্যক্তির মতো যদি প্রাণধারণ করতে চাও, তাহ'লে তোমাকে একটা বিশেষ বিন্দুতে স্থির থাকতে হবে তুমি ছাড়া আর সবাই তাদের জন্মভূমিতে ফিরে তাদের হারানো শৈশবে কোনো মতে খোঁজার চেষ্টা ক'রে বেদনা লাঘব করতো নিশ্চয়ই। হয় তারা নতুন জীবন আরম্ভ করতো নতুন পন্থায়। দূরের থেকে এসা সং

দেখায়, অবশেষে তা'রা এসে পড়ে। এই উপত্যকা ঠিক সেই আগেকার মতোই রয়েছে। কিন্তু তাদের সেই শৈশবকাল কোথায় ?

সে আবার থামলো, একটি ক্ষুদ্র কুটীর তা'র চোখে পড়লো। স্বামী-স্ত্রী এবং ছোট ছোট সন্তানের উপযোগী একটি ক্ষুদ্র গৃহ। একটি স্ত্রীলোকে যাচ্ছিল পাশ কাটিয়ে। সে প্রশ্ন করলো, ওখানে কা'রা আছে গা ?

ওখানে ? ওটা এলিয়াস মাইরেনের বাড়ী।

সে কি কথা ? সেই বেটে পা-বাঁকা লোকটা না কি ?

স্ত্রীলোকটি থামলো। হাসি-মুখে বল্‌লে, হাঁ, তা বলতে পারো বৈ কি।

লোকটা বিয়ে করেছে ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ! শেষকালে এ-গাঁয়ের জোনেটাকেই বিয়ে করলো। এখন ওদের বড় বড় সব ছেলে মেয়ে !—স্ত্রীলোকটি চ'লে গেল !

সে মনে মনে বললে—'ওঃ তাহ'লে তুমি জোনেটা, তুমিই তবে বাসা বেঁধেছ। তা বেশ, ছোট্ট সুন্দর ঘরকন্না ! আচ্ছা, নমস্কার !—সে টুপিটা একটু তুললো।

স্ত্রীলোকটি দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করলো, সে চওড়া রাস্তা থেকে নেমে ছোট কুটীরের ধারে অঙ্গনে এসে দাঁড়ালো। জোনেটা, তা'র স্কুলের বন্ধু, সে এখানে থাকে—এজন্যে তা'র এত উত্তেজনা কেন হয় ? ছোট ছোট ঘর, ছোট বাসা, গোয়াল ঘর, জঙ্গল কেটে বা'র করা একটুখানি চায়ের জমি—এটুকু লক্ষ্য ক'রে তা'র কেন এই উত্তেজনা ? দূরের প্রান্তর এবং প্রাঙ্গণের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে সে রইলো। কাজ ? কী কাজ ? ধরো, তা'র সঙ্গে যদি জোনেটার বিয়ে হোতো ! সেও ওই জমিটুকু কোদ্‌লাতো, কতকগুলো কাচ্চা-বাচ্চার জন্ম দিত, ভালো-মন্দ কাজ করতো মেপে জুপে,

অন্তিমকাল অবধি জীবনটা বেশ মসৃণভাবে কেটে যেতো। এই টুকুতেই বলা যেত তা'র ভাগ্যলিপি। সে যেন সব দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে! পলকের জন্য সে অনুভব করলো, সে যেন মাটির বাঁধনে বন্দী এক ক্রীতদাস—ভাত কাপড় ছাড়া জীবনে সে যেন আর কোন স্বপ্ন দেখে নি!

কিন্তু সে তা নয়, এই চিন্তাটাও যেন তা'র মধ্যে বিদ্রোহ বাধিয়ে তুললো। সে রকম মানুষের ছাঁচে গড়া সে নয়! রাম বলো!

এগিয়ে গিয়ে সে কড়া নাড়লো, তারপর একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঘরখানা ঝুপসি, ওপাশে জানলার ধারে একটা ফুলদানির ওপর আধমরা-ফুল। এদিকে আগুনের ধারে ব'সে একটি রোগা স্ত্রীলোক চরকা কাটছে। ওধারে একটি বাড়ন্ত গড়নের মেয়ে কাঠ গোছাচ্ছিল; বছর বারো বয়সের একটি ছেলে পায়ের ওপর একটি বিড়ালকে বসিয়ে খেলা করছে। অভিভাবক নেই বটে, তবুও যেন সমস্তটা মিলিয়ে একটি পারিবারিক কাব্য। সে বললে, নমস্কার।

স্ত্রীলোকটি চরকা থামালো। আঃ জোনেটা, কী ফ্যাকাসে হয়েছে তোমার মুখ, কী খানাখোন্দল! জোনেটা বললে, হ্যাঁ, এই যে, বসো।

টুপিটা তুলে সে দরজার কাছে বসলো, কথা বলতে লাগলো। এখানকার জল-হাওয়া সম্বন্ধে সামান্য আলাপ। মনে মনে একটু আশা আছে, জোনেটার সঙ্গে একটু কথা ব'লে যদি বাল্যকালের কথা একটু নাড়াচাড়া করা যায়। কিন্তু সে চেয়ে দেখলো, তা'র বাল্যসঙ্গিনী হ'য়ে উঠেছে এখন একটি তরুণীর ধ্বংসাবশেষ।

জোনেটা একটু গুছিয়ে ব'সে বললে, ঘুরে ঘুরে বেড়াও বুঝি?

হ্যাঁ, তাই বটে। সে ঘড়ির কাজ করে। লোকের ঘড়ি সারিয়ে বেড়ায়।

স্ত্রীলোকটি তা'দের দেওয়ালে নিজেদের ঘড়িটার দিকে তাকালো। ঘড়িটা আজকাল ভীষণ ধীরে ধীরে চলে। ওটায় তেল দিয়ে পরিষ্কার করলে মন্দ হয় না। কিন্তু মজুরি হয়ত অনেক বেশী পড়বে।

ঘড়িটি হাতে নিয়ে লোকটি টেবিলে গিয়ে বসলো। মনে মনে নিজেকেই বললে, হ্যাঁ, সাবধানে কাজ ক'রো—চাকাগুলো খুললে আবার ঠিক ক'রে বসানো চাই। জোনেটা আবার বসলো চরকাটি নিয়ে। কথা কইতে কইতে লোকটি ঘড়ির ধুলো ঝেড়ে কলকব্জায় তেল পূরে দিতে লাগলো। কথায় কথায় সে বললে, এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য হোলো জোনেটাকে বিশেষ একটা সংবাদ জ্ঞাপন করা। আমেরিকার সমুদ্রপথে যাবার সময় এখানকার একটি লোকের মুখে সে জোনেটার নাম শুনেছে বার বার। সেই লোকটি না কি জোনেটার ছোটবেলায় স্কুলের সাথী ছিল—হয়ত আর কিছুও ছিল। সে লোকটা তা'র নাম বলেছিল, আন্দ্রে।

চরকা থেমে গেল। কিশোরী মেয়েটি হাসিমুখে তাকালো তা'র মায়ের দিকে। মা-বাপের যৌবনকালের কোনো একটা কীর্তির উপর থেকে যদি পর্দাটা একবার স'রে যায়—তবে ছেলেমেয়েদের পক্ষে ভারি বিজয়গর্বের কথা। মা বললে, আমার মনে হচ্ছে তা'র নাম আন্দ্রে বার্জেট।

হ্যাঁ তাই, এই নামই বটে—তা'র বেশ মনে পড়ে। ঠিক, আন্দ্রে বার্জেটই তা'র নাম।

জোনেটা বললে, সত্যি, তুমি তা'কে দেখেছ আমেরিকায়? হ্যাঁ, আন্দ্রে! কী করে সে এখন?

কি করে? সে হোলো আমীর! মস্ত জমিদারী, দুশো গরু, পঞ্চাশটে ঘোড়া! আর বাড়ীঘর? প্রাসাদে সে থাকে, প্রত্যেক দিন স্ফটিকের

গাড়ী চ'ড়ে সে বেরোয়—সোনার ফ্রেমে আঁটা প্রকাণ্ড আয়নার সামনে সে বসে।

মহিলাটি মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বললে, না, আমি কখনো.....
আচ্ছা, আন্দ্রে কি বিয়ে করেছে?

বলাই বাহুল্য! ইংলণ্ডের এক লর্ডের বোনকে সে বিয়ে করেছে! মহিলাটি এমন সৌখিন যে, সকল সময়ে রেশমী চটি প'রে থাকেন।

হা কপাল!—জোনেটা বললে, স্রেই আন্দ্রে! কে জানতো আমাদের এই গ্রামের সেই ছেলেটার ভাগ্য এমন কিরে যাবে!

কিন্তু সেই আন্দ্রে মানুষটা ছিল কেমন? এখানে কি সে ভদ্র আর শান্ত ছিল না? ধর্মভীরু ছিল না কি?

আ, পোড়া কপাল!—জোনেটা বলে, ধর্মটা ছির তা'র ভারি মজার। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সবাইকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতো। চুরি-দারি অবিশ্যি কখনো সে করে নি, কিন্তু কিছু একটা কুকাণ্ড বাধাবার আগেই সে জেলে যায়। লজ্জায় দুঃখে আন্দ্রের মা যায় ম'রে। এমন যে ছেলে, সে কিনা আজ এমন উন্নতি করলো! হ্যাঁ, সেই আন্দ্রে!

ঘড়ির কাজ করতে করতে ও চেয়ে দেখলো, ওপাশে পুরনো একটা শেলাইয়ের কল। বললে, আচ্ছা তা'র মনে কি একটু স্নেহমমতাও ছিল না? অনেকে কি তা'র কাছে অনেক উপহার পায়নি?

উপহার? ঈশ্বর রক্ষা করুন! আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমি কিছুই পাইনি। যা কিছু সে লোককে দিত, কোনোটাই সাধুতার পথে আসেনি! সে যদি কিছু ব'লে থাকে বলেছে, কিন্তু আমি তা'র কাছে কিছুই পাইনি।

আগন্তুক হাসিমুখে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করলো। যদিও ঘড়িটা দেওয়ালে টাঙাবার পর টিক-টিক করতে লাগলো, কিন্তু যা ছিল তা'র চেয়েও খারাপ হ'য়ে গেল। কয়েক আনা পয়সা সে নিল, তারপর মাখন-রুটির সঙ্গে কফি খেয়ে কিশোরী মেয়েটার হাতে পাঁচটাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়ে বললে, তোমার সুন্দর চেহারাটি তোমার মায়ের তরুণ বয়সের মতো মনে হয়।

মেয়েটা হতচকিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো।

আচ্ছা, চললুম।—ব'লে লোকটা উঠে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

হ্যাঁ, তা'র কাজ হ'য়ে গেছে। আশ্চর্য, জোনেটাও তাকে চিনতে পারলো না। এতবার এত রকমের মুখোস সে পরেছে, যে, সেদিনকার অরণ্য-পথের সেই বালক আজ হারিয়ে গেছে। হায় জোনেটা, আমার যখন পাহাড়ের পথে দোকান ছিল, আমি যখন লোককে ধারে অথবা অল্প মূল্যে জিনিসপত্র দিতুম—সেই সময় তোমাকে উপহার দিয়েছিলুম ওই শেলাইয়ের কলটা—ওটা অস্বীকার করা তোমার পক্ষে উচিৎ হয়নি। এটা ভালো করলে না, জোনেটা! কিন্তু এইটিই তা'র পক্ষে একমাত্র শোচনীয় অভিজ্ঞতা নয়! চরম অভিজ্ঞতা হোলো জোনেটার সেই রূপের এই ধ্বংসাবশেষ! ওরই মতো—ওই জোনেটারই মতো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মেয়ের ওই একই দশা···অমনি কঙ্কালসার, জরাজীর্ণ,—তাদের শীর্ণ আঙুলগুলির বাইরে তাদের আর কোনো আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। ওরা কি ওই পাহাড়ি পথের আগাছার মতো নয়?—একদিন ওরা অনাদর আর অবহেলায় গজিয়ে ওঠে, জরা এসে ওদের গ্রাস করে—একদিন ম'রে যায় নিঃশেষে। ওরা কি এছাড়া আর কিছু?

তাড়াতাড়ি সে চলতে লাগলো বড় রাস্তাটা ধ'রে। কোথায় সে যাবে তা'র কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। পিছন দিক থেকে কেউ যেন তা'কে ধ'রে ফেলবে এই ভয় ছিল...পাছে অমনি একটা অখ্যাত অবজ্ঞাত জীবন তাকে বেঁধে রাখতে চায়। মেরুদণ্ডের ভিতরে যেন তা'র ঠাণ্ডা স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। সে দূরে পালাতে চায়, ছুটে চ'লে যেতে চায়, কিন্তু কোথায় ?

একটু দাঁড়াও,—যত কিছুই হোক না কেন, কান পেতে একটা কথা শুনে যাও। ওরা যতই বাঁধনের মধ্যে থাকুক না কেন, একটা জিনিস ওদের আছে—যা তোমার নেই। তোমার মতো ওরা ঘর ছাড়া নয়, ওদের শান্তি আছে। দুঃসাহসিক জীবনের কামনায় অথবা অনন্ত প্রাণসত্তার ক্ষুধায় ওরা তোমার মতো বাসনার আগুনে জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হয় না! আর, এমন কি তুমি, আন্দ্রে, তোমাকেও এবার থামতে হবে। একটি স্ত্রীলোক রয়েছে এক জায়গায়। তুমি জানো, কোথায়! আজো সে অপর কোনো পুরুষের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়ায়নি,—এও তুমি জানো। তুমি আজো তা'র কাছে যাওনি—সাহস হয়নি, তাই। আগে তুমি নিজে পরিষ্কার হও। এবার কি তুমি তোমার জঞ্জালগুলি ঝেঁটিয়ে সাফ করতে চাও না? দূর অরণ্যপথে আজো প'ড়ে রয়েছে একখানি কুটীরের ভগ্নাংশ,—হয়ত কেউ সেখানে ঘর তুলেছে। সেখানে এখন সবই নতুন। তুমি সেখানে এখনই যাও, আন্দ্রে, সেখানে গিয়ে আবার নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করো। তোমার ত' এক সময় কল্পনা ছিল, আগে যা কিছু অন্যায় করা গেছে, তা'র একটা মোটামুটি প্রতিকার করা যায়; মনের বক্রতা কাটিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ানো চলে বৈ কি। যে-ডাক্তারের কাছে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ

যে-রোমারকে তুমি প্রতারিত করেছ,—তা'রা আজ কেউ বেঁচে নেই, কিন্তু আর যাদের ঠকিয়েছ তাদের ক্ষতিপূরণ তুমি করতে পারো। তোমার বার্ধক্যে পদে-পদে তুমি হোঁচট খেয়ে চলো, লোককে ক্ষতিপূরণ দাও, আঘাতকে সারিয়ে তোলো, নিজেকে পরিষ্কার করো—অবশেষে চলো তুমি সেই নারীর কাছে। তাকে গিয়ে বলো, আমাকে ভেঙে চুরে ছাঁচে তুমি গড়ে তোলো—তোমার যেমন ইচ্ছে! আমার ভগ্ন ব্যর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ খণ্ডবিখণ্ডগুলিকে তোমার দু'হাত দিয়ে পথ থেকে তুলে নাও,—আমাকে কিছু একটা নির্মাণ করো। আমাকে যুবা বানাও অথবা বৃদ্ধ বানাও, আমাকে সুন্দর অথবা কুৎসিত করো; তোমার নিজের খুশি অনুযায়ী আমাকে গঠিত করো। কিন্তু, ভগবানের দোহাই, যে গঠন তুমি আমাকে দেবে—তা'র থেকে তুমি আমাকে পালাতে দিয়ো না, আর আমাকে চ'লে যেতে দিয়ো না! আমাকে থাকতে দাও তোমার করতলের মধ্যে, ওর মধ্যেই আমার বার্ধক্য আসুক, মৃত্যু হোক—কিন্তু সেদিনও যেন আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটে!

তাড়াতাড়ি সে হাঁটতে লাগলো। পথটা উঠে গেছে পাহাড়ে—সেটা গিরিপথ! সে লক্ষ্য করেনি তা'র শ্বাসপ্রশ্বাস হ'য়ে এসেছে ঘন দীর্ঘ, তার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত! এক সময় সে ঘুরে দাঁড়ালো, কপাল থেকে টুপিটা সরালো, —তারপর চেয়ে দেখলো দূর সমুদ্রের খাঁড়ির দিকে। দুইধারে নীলাভ পর্বতের ভিতর দিয়ে এসে পড়েছে সন্ধ্যার সোনালী আলো। তা'র মনে পড়লো তা'র এই তীর্থযাত্রা যে-নারীর উদ্দেশে,—একদা শীতের নিস্তব্ধ রাত্রে সে তা'র একটি নামকরণ করেছিল! কিন্তু সে-নামটি উচ্চারণ করা যায় একটি সুমধুর সুরের ঝঙ্কারে!

পরিচ্ছেদ—১২

সুনীল-স্বর্ণাভ সন্ধ্যায় রঙীন মেঘের দল ভেসে চলেছে, তা'র নীচে সমুদ্রের স্বচ্ছ মুকুর—এমন দৃশ্য এই উপত্যকা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। প্রান্তর ও প্রাঙ্গণ, ফসলের ক্ষেত্র, লাঙ্গলের ফলা আর যন্ত্রপাতি—দূর থেকে তাদেরও যেন কেমন নিঃসঙ্গ দেখায়! ঘোড়াশালায় ঘোড়ারা দাঁড়িয়ে চিবোয়, লোকেরা একান্ত কুটীরে ব'সে পান-ভোজন করে,—তাদের মুখের ওপর এসে পড়ে পশ্চিম আকাশের রক্তাভা। সর্বশেষ মানুষটি ঘরে চ'লে যায়, কুটীরের চাবিটি বন্ধ করে—তারপরে সবাই নিঃঝুম। কেবল বনময় পাহাড়ের আশপাশে বনমুরগীগুলো ডাকতে থাকে, এবং অদূর সাগরবেলায় ছোট ছোট ঢেউগুলি বালুর উপরে আছাড় খেয়ে ঝলমল ক'রে ওঠে।

'বিদেশী' ব্যক্তিটি চললো বনময় পথের ভিতর দিয়ে। পুরাতন ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি এসে পড়া—এ একটা কেমন বিচিত্র অনুভূতি: হয়ত নতুন মানুষের দল এসে আবার ঘর বেঁধে ব'সে গেছে। না, ওই যে সে জায়গাটা দেখা যায় এখান থেকে। একটা চেনা জায়গায় এসে সে দাঁড়ালো, তারপর পাশের বেড়া ডিঙিয়ে এধারে সে এলো। পায়ে-চলা পথটায় কত যে আগাছা গজিয়েছে! বাস্তবিক, এখানে ফিরে আসাও তা'র পক্ষে বিচিত্র।

তাদের বাড়ীর ভিতর দেওয়ালের কয়েকখানা পাথর আজও প'ড়ে রয়েছে। এগুলো আগেও ঠিক এমনি ছিল—কয়েক বছর আগে একবার এসে সে ঠিক ওইভাবেই দেখে গেছে। একদিন এটাকে নিজের আশ্রয় ব'লে সেও মনে

করতো! ছড়িটির উপর ভর দিয়ে আন্দ্রে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো, এদিক ওদিক তাকিয়ে একবার শিস দিল। আশ্চর্য, বালককালে এখানে কী আনন্দ পেত সে! স্থূলদেহা জননী ছিল আলাদা ধরণের—কিন্তু তা'র মামা, মামা কিরকম মুখব্যাদান ক'রে খেতো! তারপর বুড়ো রোমার? সেই মোড়ল? প্রাচীন স্মৃতিগুলি যেন ছুটে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। আজ সে আর উচ্চৈঃস্বরে হাসতে পারলো না; কেবল মলিন হাসি হাসলো।

একখানা পাথরের ওপর সে চেপে বসলো। মনে হোলো তা'র মায়ের সেই কফির কেৎলী থেকে গরম বাষ্প এসে তা'র মুখে চোখে লাগছে। ওই যে সব্জি-বাগানটা, ওই যে আলু পোঁতার জায়গাটা। আর সত্যি, ওই যে সেই পাশাপাশি পাথরের টুকরো দুটো—ওরা যেন পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রী—এখনও রয়েছে তেমনি ক'রে। জলে ঝড়ে শীতে গরমে বাইরে থেকে ওদের সর্বাঙ্গে শ্যাওলা পড়েছে! আশ্চর্য, এতকাল পরেও ওদের দেখা গেল! তাইত, আন্দ্রে, তুমি কি ভেবেছিলে তোমার ভাগ্যসূত্রের শেষ প্রান্তটুকু আঁকড়ে ধ'রে তুমি এখানে বাস ক'রে আবার মানুষ হ'য়ে ওঠার চেষ্টা করবে? বেশ, সেদিনকার সেই বালকটাকে এখানে খুঁজে বা'র করো, তা'কে ধ'রে ফেলো। ওঠো, উঠে দাঁড়াও, একবার চেষ্টা ক'রে দেখো!

মরীচিকা! হায় আন্দ্রে, জলের তলায় তলিয়ে গেছে যে দ্বীপ, তা'কে তুমি খুঁজে বা'র করতে চাও! তুমি কি সত্যি সত্যিই অন্তরের সঙ্গে আশা করেছিলে? সেদিনকার সে-বালক এখন শুধু স্মৃতি! সে হোলো একটি দ্বীপ যা সমুদ্রের তলায় তলিয়ে গেছে। তুমি সাগরে ঝাঁপ দিয়ে তা'র তীরে উঠতে পারবে না। কিন্তু তুমি সেই চিরকেলে নির্বোধ, তাই এসব আবার কল্পনা করেছ। বরং যাও, সিপিয়ো আফ্রিকেনাসকে খুঁজে বেড়াও গে!

ধর্মযাজক কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে! সে বলে, জীবন শুকিয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে! সেই মেষশাবক আর সেই দানসর্বস্ব বালক। সে বলে, রূপান্তরিত হও, প্রার্থনা জানাও। ধাত্রীবিদ্ বলে, বিকারচিত্ত রোগীর কথা। আলাস্কার ইঞ্জিনীয়র তোমাকে বলে, নতুন কারখানা খুলে কারবার জমাও। কিন্তু ব্রেজিলবাসী কৃষক—নাঃ তা'র কথা মনে করো না। কারণ, তা'র পাশে পাশে শাদা নরম জামা পরা একটি নারী হেঁটে যায়। সে-কৃষকের কথা থাক্।

ব্যাঙ্কের সেই বুড়ো গোমস্তা! সে বলে, তুমি আমার নকল ক'রে আর একটা বড় কিছু কীর্তি সম্পাদন করতে পারো। তারপর আরও দামী দামী কীর্তি। কিন্তু না, থাক, ধন্যবাদ, মহৎ কীতির ক্ষুধা তোমার ম'রে গেছে। এবার কি তুমি মানুষ হ'য়ে উঠবে না?

দুই হাতের ওপর সে মাথা নত করলো। যদি সে এখনই সেই নারীর কাছে যায়, কি হয়? নাঃ নিজের কাছে মিথ্যা সে বলতে পারবে না। গভীর আতঙ্কে তা'র মন কুঁকড়ে উঠলো—এই একই মানুষের কাঠামো নিয়ে সে আর কারাবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না! নিজের সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়—না, কখনো না, আর কখনো সে সেই নারীকে প্রতারিত করবে না!

এটা কি তুমি অস্বীকার করতে পারো, আন্দ্রে, জীবন্ত প্রাণী ছায়ার মতো তোমার পিছু নেয় না? সেই নারীকে তুমি যখন খোঁজার উপক্রম করো, ছায়ামূর্তিরা এসে কি তোমার পথ অবরোধ করে না? দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। আগে আমাকে আকার দাও—না, আগে দাও আমাকে; না, না, কিছুতেই না, আগে আমাকে আকার দাও!—ওরা সবাই ঘিরে তোমাকে

এই বলছে! তুমি নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে দূরে পালাতে পারো—কিন্তু ওরা ছুটবে তোমার পিছু পিছু, চারিদিক থেকে তোমাকে অবরোধ করবে। তুমি তাদের কুহকে বন্দী!

আন্দ্রে, তোমার প্রথম কাজ কি জানো? তোমার মুখের ওই বক্র হাসিটি মুছে ফেলতে হবে। কোনো একটা সত্যের উপরে তোমাকে নিশ্চিত হ'য়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু সত্য কি? সত্য এমন একটা কিছু যেটা কেবল একটিমাত্র চোখে দেখা যায়। বেশ, তাহলে তাই চেষ্টা করো। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারটা? সমাজ সংস্কারের কথাটা? আজকের রাজনীতির বিতণ্ডা? সেই নারীটি একদিন—তা'র যত অল্প বয়সই হোক সেদিন—সব বিষয়ে তা'র নির্ভুল অভিমত বলতো। তোমার অভিমত কি বলো ত? কেবল একটি চোখে দেখার চেষ্টা করো। কিন্তু ঈশ্বরের দিব্যি, বাঁকা হাসি হেসোনা।

এইভাবে সে যখন ব'সে রয়েছে, রাজ্যের দিবাস্বপ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তা'র মাথার মধ্যে। একটা অনুপ্রেরণা তা'র, প্রাণের দিগদিগন্ত ভ'রে তুললো, তাকে সব কিছু ভুলিয়ে দিল—সেটা হচ্ছে সর্বভূতে প্রাণ ধারণ ক'রে যাবার একটা ঘন নিবিড় অতলস্পর্শ অনুভূতি!

সে দেখলো, কোনো এক গ্রামে এক বিরাট রাজনীতিক সভা। গ্রীষ্মকাল। সবুজ পাহাড়গুলির পটভূমিতে দেখা যায় হরেক রকমের ঝলমলে নিশানের সমারোহ। প্রাঙ্গণ জনতায় মুখরিত। বক্তৃতাদি চলছে। কতকগুলি যুবক মাঝে মাঝে আনন্দধ্বনি ক'রে উঠেছে।

তারপরে সব নীরব। একজন নগর-সমাগত ব্যক্তি একখানা গাড়ী চ'ড়ে গ্রামে এসে ঢুকলেন! লোকেরা তাকালো সেইদিকে। হ্যাঁ, নিশ্চয়,—ওই

যে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী—উনি ভগ্নস্বাস্থ্যের অজুহাত জানিয়ে সভায় যোগদান করার অক্ষমতা জানিয়েছিলেন। অবশেষে এলেন তিনি। আনন্দে টুপিগুলো উড়লো শূন্যে ; র‍্যাডিক্যাল নেতারা লাফিয়ে সামনের দিকে এলো। ওঃ, কী উত্তেজনা !

কিন্তু ওই প্রধান মন্ত্রীটি কে ? ও হোলো সেই লোক, যে-লোকটি বনের মধ্যে এই পাথরখণ্ডের উপরে ব'সে রয়েছে আপন মনে। নিজের আকৃতি আন্দ্রে পেয়ে গেছে এবার। একি নিজেকে নিয়ে আমোদ, না কৌতুক ? না শুধু তাই নয়, সে একটা পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে চায়।

মন্ত্রী গাড়ী থেকে নেমে এলেন গম্ভীরভাবে। বেশ হাসেন তিনি সবাইকে উদ্দেশ ক'রে, চশমাটা মুছে নেন। ভাবটা এই, নির্বাচনকারীদের চোখে তিনি উপরওয়ালা হ'য়ে থাকতে চান না,—হাত দিয়ে নাকটা মুছে ফেলেন। তারপর প্লাটফরমে উঠে দাঁড়ালে হাততালি দিয়ে তাঁর জয়ধ্বনি করা হয়। জাতীয় পোষাক পরিহিত একটি তরুণী তাঁর প্রতি তাকায়—যেন স্বর্গে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করছে। অতঃপর শ্বেতধূসর জননেতাটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন। যে-মানুষটি এখন এই প্রস্তরখণ্ডের উপর ব'সে রয়েছে, সে কি ওই সব বক্তৃতা জানে না ? কিন্তু মন্ত্রী হলেন মৌলিক মতবাদী, লোকে তাঁর কাছে মৌলিক মতবাদের বক্তৃতা শুনতে চায়। কিন্তু মৌলিকতাবাদটি কি,—দেখা যাক্।

কিন্তু বক্তা রক্ষণশীলদলোচিত তর্কযুক্তি উদ্গীরণ করতে থাকেন। অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল। শ্রোতারা কি হতাশ হোলো ? তা'রা কি তাঁকে ব্যঙ্গোক্তি ক'রে বসিয়ে দিতে চায় ? মোটেই না। তা'রা জয়ধ্বনি করে, কারণ তা'রা গোঁড়া লোক। যদি মৌলিকমতবাদী মন্ত্রী এইভাবে বক্তৃতা

করেন, তবে ত নিশ্চয়ই তিনি মৌলিকতাবাদী! শুনুন, শুনুন!! একজন অপরের দিকে চেয়ে সম্মতি জানায়। ওই দেখো। এসব রক্ষণশীল দলের মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ উনি ত' ভিন্নপ্রকার অভিমত পোষণ করেন।

জনতার ভিতরে তিন-চারটি লোক গোঁজ গোঁজ করে, কিন্তু চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস তাদের নেই। প্রধান মন্ত্রী চ'লে যান, তাঁর দলের লোকেরা তাঁর জয়ধ্বনি করতে থাকে।

নমস্কার, বন্ধুগণ, নমস্কার! আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করার পথে জয়ধ্বনি করো বার বার।

ঘণ্টাখানেক পরে আর একখানা গাড়ী চ'ড়ে এলো শহর থেকে আর একটি লোক। কি? না, তা হ'তে পারে না—হ্যাঁ, আমরা আজ হোমরা চোমরা লোকদের দেখছি; এ লোকটি এবার রক্ষণশীলদলের নেতা হবে! প্রধান মন্ত্রী হবে বৈ কি এ লোকটা, যদি আগামী নির্বাচনে এর দল জয়লাভ করে। সভায় কতক কতক রক্ষণশীলদলের লোক রয়েছে, তা'রা ও লোকটাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে আনলো। সে এসেছে যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতন—একটু আগে এ সভায় যত কিছু পাগলের প্রলাপ আর ভণ্ডামীর কথা বলা হয়েছে, এ ভদ্রলোক এসেছে তা'র প্রতিবাদ করতে, ওদেরকে আলো দেখাতে!

রক্ষণশীল দলের নেতাটি কে?—এই একই লোক যে ব'সে রয়েছে চারিদিকের এই ধ্বংসস্তুপের মাঝখানে। এই উভয়বিধ নেতার ভূমিকাতেই অভিনয় করবে। এবং নিতান্ত লজ্জার খাতিরে এই মৌলিক মতবাদী সভা তা'র অভিমত মন দিয়ে শুনতে আপত্তি করবে না। ওরা আশা করে তা'র কাছে রক্ষণশীল অভিমত শুনতে। কিন্তু রক্ষণশীলতা কি,—শোনা যাক্।

নেতাটি বক্তৃতা আরম্ভ করে, এবং এও সেই মৌলিকমতবাদীর বস্তাপচা যুক্তিতর্ক! তা'র তরল জিহ্বা যন্ত্রের মতো ব'লে চলেছে। কিন্তু রক্ষণশীলরা কি ব্যঙ্গোক্তি করে? মোটেই না। তা'রা পাগলের মতো হাততালি দেয়, জয়ধ্বনি করে—কারণ, সংখ্যায় তা'রা কম। ওদিকে মৌলিকমতবাদীর তরফ থেকে তিরস্কারভরা হাসি শোনা যায়। আগে থেকেই তাদের জানা, এ লোকটা যা কিছু বলবে সে সবই প্রতিক্রিয়াজনক। হয়ত তা'র মতে মত দেওয়া উচিৎ, কিন্তু যেহেতু সে বিরুদ্ধ দলের তকমা-আঁটা—সুতরাং তা'র যা কিছু বক্তব্য সবই মন্দ—ভাল হ'লেও মন্দ!

অবশেষে রক্ষণশীল নেতা বিদায় নেন। কিন্তু সভাভঙ্গের ঠিক আগের তৃতীয় এক আগন্তুক এসে মঞ্চে উঠে দাঁড়ালো—বড় বড় চুলের গোছা আর মুখভরা দাড়ি নিয়ে যেন স্বয়ং খৃষ্ট। জনতা তাকায়। লোকটা কে বটে?

অতি সম্মানিত ভদ্রমণ্ডলী—মাত্র একটি কথা! র‍্যাডিক্যালরা নিন্দা করে র‍্যাডিক্যালদের নীতি; রক্ষণশীলরা প্রশংসা করে! আপনারা কি বোঝেন কোন্‌টাকে আপনারা বাহবা দেন্, আর কোন্‌টাকে গলাটিপে নামান? কেবলমাত্র প্রসাধনসজ্জার কৌশলমাত্র! আপনাদের নিজেদের কোনো প্রকারই মতামত নেই!

এই কি সত্য নয়? জগত সংসার ঘুরছে একটা চাকার মতন, আমরাও ঘুরছি সেই চাকার সঙ্গে,—সেই একই চক্রান্তে ঘুরে ঘুরে আমরা বেশ খুশী হ'য়ে ভাবছি, আমরা বুঝি বিস্ময়কর দ্রুতগতির সঙ্গে প্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছি। মৌলিকতাবাদ, আর রক্ষণশীলতা! বোঝেন আপনারা এ দুটো কি? একই চাকার দুটো অংশ। একটা হোলো আজকের দিন। গত বছর এটা ছিল বিপরীত। চাকা, শুধু চাকা ঘুরছে চিরন্তন গতিতে। কেন ঘুরবে

না? বড় একটা কল্পনার অজুহাত যদি না পায় তবে তরুণরা কেমন ক'রে তাদের অভিলাষ পূর্ণ করার পথে চলবে? চমৎকার, নতুন কল্পনা! দোহাই, তাদের যেন বলবেন না, এ কল্পনাটা পুরাতনের উপরেই নতুন পোষাক চড়ানো। একথা শুনলে জননেতাদের নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যাবে। সুতরাং চাকাটাকে ঘুরতে দিন—ঘুরুক, অশ্রান্তভাবে ঘুরুক।

এই নিঃসঙ্গ লোকটির চোখের সামনে এই সব দৃশ্য ভাসছে। তা'র নিজস্ব ভূমিকায় অভিনয় করার আগে কি তা'র কোন শাস্তি আছে? এটা কি তা'র বাঁকা হাসি? বেশ, তা'তে কি হোলো? মলেয়ার আর ফ্লবার্গ, এবং তাঁদের আমলে যারা ব্যঙ্গ-লেখক ছিল তা'রা আজ কোথায় সব?

তা বেশ, ভালো। কিন্তু সত্য কোনটা? এ বিষয়ে তোমার নিজের অভিমত কি? নিজের অভিমত কি তোমার কিছু আছে? সেই চিরাচরিত মুখবিকৃতির ফলে তুমি কি নিজেকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে আনোনি? জঘন্যতার ওপারে আর কি কিছু নেই? বরং আরো গভীরে নেমে যাও। কিছু একটা পরম পদার্থ নিশ্চয়ই আছে যা আজো তুমি খুঁজে পাওনি। আন্দ্রে, ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন—যদি তুমি কোনোদিন নিজের কোনো অভিমত আহরণ করতে পারো।

আন্দ্রে উঠে দাঁড়ালো। টুপিটা তুলে কপালটা মুছে ফেললো। হে অরণ্যময় ধ্বংসস্তূপ—বিদায়! এখানে আমার অনেক পায়ের চিহ্ন পড়েছে, কিন্তু আমার সন্দেহ, আর বোধ হয় ফিরবোনা। তুমি শান্তিতে ঘুমাও, বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠো—আমাদের সব চিহ্ন মুছে দিয়ো, কেমন?

আন্দ্রে বিদায় নিল। রাজপথের দিকে সে আর গেল না, গেল বনপথে

উপত্যকার দিকে—বহুদূর অরণ্যের নীচেকার প্রান্ত অবধি যে-উপত্যকা ঘুমিয়ে রয়েছে। সব পথ তা'র জানা, সবগুলি ছোট নদী, সব ছোট ছোট পাহাড়। বসন্তের অস্পষ্ট রাতও তা'র পথযাত্রার পক্ষে যথেষ্ট উজ্জ্বল। শাদা ছালের গাছগুলি, পাথুরে পাহাড়ের গায়ের একাংশ,—প্রত্যেকটি নিশানা তা'র অতি পরিচিত।

হঠাৎ খেলার ইচ্ছাটা যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলো। সে একটা ঢিল কুড়িয়ে কিছু না ভেবেই ফেলে দিল। ওহে আন্দ্রে, তুমি আর সেই বনের বালকটি নও, পাখীদের দিকে ঢিল ছোড়ার অভ্যাস তুমি ছেড়ে দিয়েছ যে!

অবশেষে সে গিয়ে পৌঁছলো পর্বতের শিরে, সেখান থেকে দেখতে পেলো নীচে সমুদ্র আর তাদের উপত্যকা। সেইখানে সে শুয়ে পড়লো, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে। রাতটা বেশ উত্তাপে ভরা। সেটা মে মাস। নীচে তাদের উপত্যকা, উপরে সে। সমুদ্রগামী জাহাজ থেকে আলো দেখা যাচ্ছে, আকাশে স্বর্ণোজ্জ্বল তারকাবলী। তা বেশ, নিজের মাথাটা সে হেলিয়ে দিল পুঁটলীর ওপর, হাত-পা ছড়িয়ে দিল ঘাসে। নীচের উপত্যকায় এখন যারা ঘুমিয়ে রয়েছে, তাদের মতন হ'লে সেও বেশ ভালো থাকতে পারতো। তা'রা আজো যা আছে, কালও তাই থাকবে। এ পৃথিবীর অন্ন যতদিন তা'রা চিবোবে ততদিনই একভাবে থাকবে। কিন্তু সে এখন যাবে কোথায়? এমন কোনো একটা পাখী, কি একটা কাকও আছে, যে, তা'রই মতো গৃহহীন?

তা'র চোখ কি বন্ধ? সে কি নিদ্রিত? পাশে একটা ঝোপ নুইয়ে পড়েছে, সেখান থেকে একটা লোক লম্বা দাড়ি নিয়ে সহসা বেরিয়ে এলো। কিন্তু সে নিশ্চয় সেই মহাপুরুষ—বেরিয়ে এসেছে নির্বাচন সভা থেকে। এখানে সে কি চায়? লোকটা ছড়ি তুলে ধরলো আন্দ্রের দিকে।

শোনো : অভিশপ্ত তুমি চিরদিন, এক আকার থেকে অন্য আকারে ঘুরে বেড়াবে। কোনো দিন সর্বশেষ আকারটি খুঁজে পাবে না। কোনো দিন তোমার মৃত্যু নেই, কোনো দিন মানুষে পরিণত হবে না,—মানুষকে ঘিরে তুমি শুধু কুটিল বিদ্রূপ ক'রে বেড়াবে। যুদ্ধের মহড়ায় তুমি হবে সেনাপতি, তুমি যা হুকুম করবে সে-হুকুম সাধারণ সেনাপতিদের অপেক্ষা এমন কিছু নির্বোধ হবে না; তুমি ঘোড়ার পিঠে বসে দেখবে তোমার সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করছে। তুমি প্রধান পুরোহিত হবে, গীর্জায় গিয়ে ধর্মপ্রচার করবে, তদন্ত ক'রে বেড়াবে। জাতীয় গণপরিষদে তুমি বসবে সভাপতির গদিতে; অধ্যাপকের আসনে বসবে তুমি; ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর হ'য়ে পরম দয়ার সঙ্গে তুমি লোককে টাকা ধার দেবে। তুমি দরিদ্রের বস্তিতে গিয়ে গরীব লোককে সাহায্য দান করবে, দেশ-সচিবের পদে ব'সে তুমি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবে! সবগুলোই প্রতারণা, তবে সমস্তটাই হয়ত অসাধুতা নয়! কারণ প্রত্যেকটি ভূমিকা তোমার মধ্যে শক্তি স্ফুরিত করবে, তোমার অপরিতৃপ্ত অশান্ত জীবনের ক্ষুধাকে কিছু সান্ত্বনা দেবে। পার্থিব সব কিছুরই ওপর তোমার বিতৃষ্ণা, কেবল একটি বস্তুর ওপর নয়—সে হোলো জগতের আর সব প্রাণীর মতো প্রাণময় এক মানুষ হয়ে ওঠা।

সেইজন্য চিরদিন ধ'রে তুমি এক দেহ থেকে অন্য দেহে ঘুরে বেড়াবে। নিত্য নূতন ছদ্মবেশ ধ'রে তুমিই হবে তোমার নিজের প্রেতাত্মা। তুমি সব জানবে, জানবে না কেবল আন্তরিকতা; সব পাবে, পাবে না শুধু শান্তি। হঠাৎ তুমি জেগে উঠেই দেখবে তোমাকে অনন্ত চক্রান্তে ঢুকতে বাধ্য হ'তে হচ্ছে। এত ক্লান্ত বোধ করবে যে, নিজের চোখ খুলে রাখতে পারবে না—তবু তোমাকে ঠেলে নিয়ে যাবে নূতন দেহে, নূতন ভূমিকায়—অনন্ত অশ্রান্ত

পরিবর্তনে। শুনতে পাচ্ছ? তোমার হৃদয়ে জমবে কনকনে ঠাণ্ডা, অন্তরসত্তা হয়ে উঠবে তুষার কঠিন গুহা—তবু তুমি হাসবে নাচবে,—চিত্তের কামনা টেনে নিয়ে যাবে তোমাকে অনন্তের দিকে। এইভাবেই তুমি অভিশপ্ত,—নশ্বর-লোকে সর্বাপেক্ষা তুমি অসুখী।

ঝোপের আড়ালে মহাপুরুষ অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে উঠে বসলো। পুঁটলিটা তুলে নিল, ছড়িটাও নিল—তারপর চেয়ে দেখলো চারিদিকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে। তাকে চ'লে যেতে হবে,—কিন্তু কোথায়?

হুঁঃ—শুধু স্বপ্ন! ওই যে দূরে প্রভাতের রেখা দেখা যায়। পূর্ব পর্বতের গায়ে কী রক্তিম আলো! প্রভাত এসে পৌঁছেছে। যারা শ্রমিক, তাদের কাছে নতুন দিন। একটি মোরগ ডাকলো—'জাগো—জাগো—ওঠো, কাজে নামো।

সূর্যের একটি কোমল রশ্মি মাঠ পার হয়ে ছুটেছে। আলো আর পৃথিবীর মিলন ঘটেছে,—নূতন একটি সৃষ্টি জেগেছে। প্রভাতের সেই আলোয় দেখা যায় সাগরের সোনার মুকুর। হায় সুখী দিন, ঈশ্বরের দান তুমি। যদি এটুকু জানতুম, কেমন ক'রে তোমাকে কাজে লাগানো যায়! এখন যে মানুষটি জেগে কিছু মুখে দিয়ে মাঠে কাজ করতে চলেছে আপন মনে, কত সুখী সে' মৃত্তিকায় যেমন কীট,—যেমন সর্বাশ্রয়ী সর্বাঙ্গব্যাপী জীবন। হায়, পবিত্র প্রাণ! কিন্তু তুমি, আন্দ্রে, তুমি নিজে?—সে হাঁটতে লাগলো,—দ্রুত, দ্রুততর গতিতে হাঁটতে লাগলো। ঘাসের চাপড়ায়, পাথরের ঢেলায় হোঁচট খেয়েও সে দ্রুত ছুটেছে। যে-নূতন দিনটি এইমাত্র জেগে উঠেছে তা'র পিছনে, তা'র হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বিপরীত পথে সে ছুটে চলতে লাগলো।

পরিচ্ছেদ—১৩

শিলভিয়ার মায়ের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু শিলভিয়া দুঃখে অভ্যস্ত। সে জানলো এবার তাকে একা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হবে! তা'র দরকার হোলো কিছু একটা কাজ,—স্কুলে অথবা আপিসে নয়—কিন্তু যে-কাজ দুহাতে শারীরিক পরিশ্রমে করা যায়। তা'র শরীর যেন ক্লান্ত হয়, যেন তা'র ঘুম আসে।

বুড়িঝিকে প্রশ্ন করলো, কি বলো তুমি, হ্যানসাইন?

শক্ত সমর্থ ঝি মুখে দু'খানা হাত রেখে গুরু-গম্ভীর ভাবে বললে, আমার কথা? আমি ঠিক করেছি আমার নিজের দেশে ফিরে যাবো। তিরিশ বছর ধ'রে শহরে কাজ করতে করতে ভাবছি, কবে ফিরবো সেখানে। যাদের জানতুম তারা যদি কেউ আজ বেঁচে থাকে সেখানে,—আমাকে যেতেই হবে তাড়াতাড়ি। কিন্তু যদি আমার কথার কোনো দাম থাকে, বুঝলে দিদি, তোমার উচিৎ গ্রামের হাওয়ায় আর রোদ্দুরে গিয়ে বাস করা, আর সেখানকার মাটি কোদলানো।

তাহলে তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

আমি? সে ত' ভালো কথা। এই যে বাড়ী যাবার জন্য এত জিনিস-পত্র কিনেছি, এসবই তোমাকে দিতে পারি দিদি,—সত্যি বলতে কি, আমি যে তোমাকে এই দুই হাতে মানুষ ক'রে তুলেছি গো।

একদিন ওরা দু'জনে জঙ্গলের মধ্যে একখণ্ড আবাদি জমি পরিদর্শন করতে গেল। গরুর গাড়ীর চাকার দাগ ধ'রে চলেছে দু'জনে—ওইটিই হোলো যাবার

পথ। পাহাড়ের অপর প্রান্তে কোথাও কাছাকাছি ট্রেণ চলেছে ঝকঝক শব্দে; দূরে ঢেউখেলানো গৈরিকাভ পাইন বনের ভিতর দিয়ে দেখা যায় সমুদ্র ঝলমল করছে—দক্ষিণ দিগন্ত অবধি বিস্তৃত—দুই পারে পাহাড়ের শ্রেণী।

কিন্তু এখানকার ঘরগুলি ছোট ছোট। একটি থাকার জায়গা, একটি গোয়াল ঘর, পাশে একটি খড়ের গাদার চালা—আর একটি ভাঁড়ার ঘর চারটি খোঁটার উপর দাঁড়িয়ে—যেন ইঁদুর আর পোকামাকড় তেমন উৎপাত করতে না পারে এমন ভাবে তৈরী। এ-সমস্তই রোদপোড়া মোটা মোটা কাঠের তৈরী এবং এদের চালগুলির উপর ঘাসের চাপড়া দিয়ে সাজানো। যুবতী মেয়েটির সব কিছুতে যত্ন ছিল। ছোটখাটো সামগ্রী, ছোটখাটো কাজ—তাও ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এদের মধ্যে সব চেয়ে প্রিয় ছিল তা'র ওই স্তূপাকার খড়ের গাদা-গুলি আর তাদের উপরে তৈরী সাঁকো। শ্যাওলাপড়া পাথর এনে সাজিয়ে উপর দিকে ওঠার সিঁড়ি বানিয়ে বড় বড় খড়ের গাদা ভিতরে স্তূপাকার ক'রে রাখা। যখন সেখানে সে গিয়ে দাঁড়াতো, পুরনো যব আর ঘাসের সুন্দর গন্ধে আর পুরনো শস্যের খোসবায়ে তা'র যেন নেশা লাগতো।

কি বলো তুমি, হ্যানসাইন?

ঝি বলে, হ্যাঁ, তা যদি তুমি বলো দিদি, তাহলে আসল কথাটাই আমাকে বলতে হয়। সত্যি বলতে কি দিদি, তুমি এখানেই পাখীর মতন সুখে আর আনন্দে থাকতে পারো।

শিলভিয়া বলে, তাহলে এসো, আমার কাজের আরম্ভে সাহায্য করো?

আমি? আ, আমার পোড়া কপাল, তবেই হয়েছে। নিজের চোখেই ত দেখেছ, দেশে গিয়ে সবাইকে উপহার দেবো ব'লে কত জিনিসপত্তর কিনেছি?

আমাকে তাড়াতাড়িই যেতে হবে দিদি, নৈলে সব যাবে নষ্ট হয়ে। তার মানে, হয়ত এক সপ্তাহও হ'তে পারে, আর এক মাসও হ'তে পারে!—

শিলভিয়া এই আবাদি জমিটুকু অল্প দামে কিনলো। শহরে তাদের বাড়ী-ঘর ছিল বড়, কিন্তু সে-সব ছেড়ে একদিন তারা এলো গ্রামে এই কুটীরে। মানুষের অন্তরাত্মা যে-বস্তুর মূল্য স্বীকার ক'রে নেয় তারই দাম বেশী,—তাছাড়া নাগরিক জীবনের নানাবিধ জটলা থেকে বেরিয়ে গ্রামে এসে নতুন জীবন আরম্ভ করার মতো বয়স তা'র ছিল বৈ কি। জনবহুল নগরের অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক, গ্রাম-গৃহে নির্জন শান্ত বিশ্রাম কি মধুর! হ্যানসাইনও যে গ্রামের মেয়ে, এ তা'র ভাগ্য ভালো বলতে হবে বৈ কি, কারণ শিলভিয়া শহুরে মেয়ে—চাষ-আবাদের কিছু জানে না। হ্যানসাইন বলে, বুঝলে দিদি, কাল গিয়ে একটা ঘোড়া কিনে আনবো সেই সমুদ্রের ধার থেকে। ওদিককার ঘোড়া গরুর চেয়ে বেশি খায় না।

শিলভিয়া বলে, হ্যাঁ, ঘোড়া আমাদের একটা দরকার।

এদিকে এসো দিদি, কেমন ক'রে দুধ দুইতে হয় দেখিয়ে দিই।

কত জিনিস আছে শেখবার—হ্যানসাইন তা'র কাজে একটুও আলগা দেয় না।—ওই নাও, অমনি ক'রে কি খোস্তা ধরে গা? হা ভগবান! এসো, এদিকে এসো দেখিয়ে দিই।—এই, এমনি ক'রে···ইয়া!

সত্যি, এটা বই পড়া কিম্বা পিয়ানো বাজানো নয়। শিলভিয়ার হাতখানি রাঙা হয়ে ওঠে, পিঠ ব্যথা করে—কিন্তু তা'র চিন্তাধারা যেন নতুন খোরাক পায়—সেগুলো যেন তার জ্ঞানের সীমানার অতীত কিছু। অনেক বস্তু সে দিব্যদৃষ্টিতে বিচার করে—এমনি করে এর আগে সে এ সব ব্যাপারে চিন্তা করেনি। গাভীর কাছে এসে দাঁড়ালে তা'র মুখখানি রক্তাভ হয়ে আসে, কিন্তু

গোয়ালে এসে সে যখন দাঁড়ায়—তিনটি জন্তু যেন তাকে বন্ধুর মতো অভ্যর্থনা জানাতে থাকে। প্রান্তর আর শস্যক্ষেত্রের দাবি অনেক, কিন্তু রাত্রে সে যখন ঘুমোয়—সে ঘুমোয় নিশ্চিন্ত নিঃস্বপ্নে।

হ্যানসাইন বলে, না, সত্যি দিদি, তোমাকে এ অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া আমি ভাবতেও পারিনে। শীতকালটা আমি তোমার এখানে থেকেই যাবো।

করুণ স্মৃতিগুলি শিলভিয়ার মনকে উৎপীড়িত ক'রে তুলবে এ কেমন ক'রে হয়? সামনে চেয়ে দেখা যায়, শস্যক্ষেত্রে যে বীজগুলি নিজের হাতে বপন করা হয়েছে, সেগুলি অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে মৃদু মধুর বায়ুভরে! প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তটি যেন কানায় কানায় ভরে উঠছে—এটি দেখবার মতো। কাজে উৎসাহ পাওয়া গেলে চিন্তাধারাও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে,—তখন করুণ স্মৃতিগুলিও যেন অন্য রঙে রঙীন হয়ে দেখা দেয়। তখন শিলভিয়া সাহসের সঙ্গে সেগুলি বিচার ক'রে যেন তাদের থেকে নতুন চেহারা দেখতে পায়। তা'র স্বামী যে হোতো, সে বিবাহের সাতদিন আগে দুর্ঘটনায় মারা যায়। এটা সত্য, এটা তা'র ভাগ্য। তার স্বামীর ছবি সে বড় ক'রে তুলিয়ে বাঁধিয়েছে, শোবার ঘরের টেবিলে সেই ছবিখানি রেখেছে সে অতি যত্নে—বিবর্ণ বেগুনি রংয়ের ফুল দিয়ে সে ঘিরে রাখে সেই ছবির ফ্রেমের চারিদিক। সেই তা'র স্বামী। তারপর রাত্রের দিকে শিলভিয়া বাজায় তা'র প্রিয় গানখানি অতি মধুর সুরে, পিয়ানো থেকে মুখ ফিরিয়ে সে তাকায় হাসিমুখে সেই ছবিখানির দিকে; যেন মনে হয় ছবিখানিও হাসিমুখে তা'র দিকে তাকালো! মানুষ আর ছবির মধ্যে মৃদু মৃদু আলাপ চলে। তাদের সেই বনপথে পরিভ্রমণ, গ্রীষ্মের অপরূপ রাত্রে তাদের সেই তরণীবিহার। ছবির মানুষটি যেন শিলভিয়ার কল্পনাটা বরণ ক'রে নিল; বর্তমানকালের

সমস্যাবলীর সম্বন্ধে শিলভিয়ার ধ্যানধারণা সে মেনে নিল; যেন সবগুলি সে সে শিলভিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে পুষ্পপাত্রে সাজিয়ে রেখে দিল। ছবির ওই মানুষটি তা'র চেয়ে কত বেশী জানতো ধনিক ও শ্রমিকের কথা, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের কথা। ইদানীং শিলভিয়া রাত্রের দিকে পড়াশুনো করে,—সেই কথাগুলি বার বার মনে করতে কী চমৎকার লাগে! একদিন হ্যানসাইনকে ডেকে সে বললে, হ্যানসাইন, আজ থেকে আমাদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক থাকবে না, বুঝলে? আমরা দু'জনে আজ থেকে এক টেবিলে খাবো, এক ঘরে শোবো, দু'জনে দু'জনের ডাকনাম ধ'রে ডাকবো।

এসব যেন সেদিনকার সেই অরণ্যযাত্রা আর সমুদ্র ভ্রমণের প্রতি আনন্দ অভিনন্দন। ওপাশের ছবিটি যেন মৃদু মধুর হাসে। সেদিন থেকে হ্যানসাইন তাকে নাম ধ'রে ডাকে। বলে, ঘোড়াটাকে ঘরে তুলতে আজ ভুলে গেছ ত' শিলভিয়া?

শীতকাল সুদীর্ঘ। মাঝে মাঝে পুরনো বন্ধুদের চিঠি আসে, কিন্তু জবাব দেওয়া আর হয়ে ওঠে না। যখন বসন্তকাল এলো, তখনও হ্যানসাইনের কোনো উদ্বেগ দেখা গেল না, সে তখনও রয়ে গেল!

—হ্যানসাইন, বুঝলে, আমার সামান্য যা কিছু ছিল, জমিটুকু কিনতেই সব খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু নগদ টাকার জন্যে কি করা যায় বলো ত?

হ্যানসাইন বলে, বিক্রি বাটার জন্যে কিছু ফল-পাকড় জন্মানো দরকার।

বিঘে দেড়েক জমিতে তা'রা শাক-সব্জী আর ফলের গাছ লাগালো। যখন গ্রীষ্মকাল এলো, হ্যানসাইন গাড়ী বোঝাই ক'রে কতকগুলো সব্জী আর বাঁধাকপি নিয়ে চললো শহরে, শিলভিয়া গেল হাটে কিছু কিছু বেচতে।

খড় বানাবার সময় এলো, এবার একজন মজুরকে ডাকা দরকার। তাছাড়া শরৎকালের দিকে জমিতে চাষ দেবার জন্যও একটি লোক চাই। একজন মজুর রাখতে গেলে বেশী ক'রে তাকে খাওয়া দিতে হবে, এবং ফলমূল বেচা পয়সাও তাকে বেতনস্বরূপ দেওয়া চাই। শিলভিয়া বলে, হ্যানসাইন, আর কিসে নগদ টাকা হয় বলো ত?

হ্যানসাইন বলে, মুরগী আর হাঁস পুষতে হবে, শিলভিয়া!

কিন্তু হ্যানসাইন হয়ে উঠেছিল স্থাণুর মতো। বছরের মধ্যে বার তিনেক সে তা'র সিন্দুক খুলে উপহারের জিনিসগুলি নামিয়ে আনে চ'লে যাবার জন্যে। সেগুলির দিকে তাকিয়ে সে প্রায় কাঁদে আর কি। তবু মোড়কগুলি নিয়ে সে আবার রেখে আসে। এখন সে কেমন ক'রে চলে যাবে,—এখন যে শিলভিয়া আর সে—দুই সহোদর ভগ্নী!

কতদিন উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

ঘরে বাইরে নানান্ কল্পনা নিয়ে শিলভিয়া ঘুরে বেড়ায়, আর তা'র চেহারাটা হয়ে উঠে রোদপোড়া। কিন্তু সকল কাজের পর সে যখন তেমন ক্লান্ত হয় না, তখন একখানা বই নিয়ে সে বসে, পড়তে পড়তে সব কিছু ভুলে যায়। বইয়ের সংখ্যা যখন কম, মানসিক অবস্থাটাকে তখন সজাগ রাখা সম্ভব। বইগুলিও দুবার ক'রে পড়া যায়। আগে বইগুলি তা'র মনে অস্পষ্ট আকারের স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতো। আজকাল সেগুলির পাশে আপন অভিজ্ঞতাবলীকে সে তুলে ধরতে পারে বৈ কি। আধুনিক যুগের সমাজ সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা হ্যানসাইনের কাছে ব'লে লাভ নেই। তবে কাজকর্মের সময় অনেকটা নিঃশব্দে চিন্তা করার অবসর পাওয়া যায়। নিজের জীবনে সে যা অনুভব করেছে, বই থেকে পাওয়া বস্তুর চেয়ে তা অনেক গভীর। একদিন

অঙ্গনে দাঁড়িযে সে যখন গলিত তুষারের দিকে চেয়ে রয়েছে, তখন শূন্যে সে অনুভব করলো বসন্তের স্পর্শ। চির-পলাতক পাখীরা এবার দেখা দেবে শীঘ্রই। হ্যাঁ, ওই যে প্রথম ল্যাজ নাচানো পাখী! পাখী, ভালো ত? শিলভিয়া বড় বড় চোখে তাকালো—আকাশ আর অরণ্য আর পৃথিবী যেন তা'র প্রাণসত্তাকে পরিপূর্ণ ক'রে তুললো,—সেই আবেগ উন্মাদনার কোনো ভাষা নেই, ব্যাখ্যা নেই। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। শুধু একটি মাত্র নিবিড় চেতনা তা'র; সে জীবন্ত, প্রাণময়, সে জাগ্রত। আর একদিন এলো একটি মুরগী কয়েকটি শাবক নিয়ে। এরা ছিল আগে কয়েকটি সাধারণ সামান্য ডিম্ব মাত্র—কিন্তু আজ, আজ ওদের অন্য চেহারা, আজ শিলভিয়ার অন্য চেতনা। প্রতিদিনের বিস্ময়, প্রত্যহের বৈচিত্র্য—কিন্তু তবু প্রতিদিন সে যেন স্তব্ধ বিস্ময় নিয়ে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। নীল নির্মল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের নীচে আসল-মধ্যাহ্নে গীর্জার ঘণ্টা বাজে শান্ত, উদাস বিধুর আওয়াজে—ডিং···ডং...ডিং···ডং!

তা'র কি বার্ধক্য এলো? জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কি তাকে সেই একঘেয়ে জীবনযাত্রার তলায় তলিয়ে থাকতে হবে? সে কি বৈচিত্র্যের স্বপ্ন দেখেনি এর আগে—স্বামী, সন্তান, সংসার—যা দিয়ে হৃদয়ের এপার ওপার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে? তা'র কামনা কি এরই মধ্যে শুকিয়ে যাবে? মরীচিকা কি এরই মধ্যে মিলিয়ে যাবে?

ডিং······ডং······ডিং······ডং!

যদি তাকে কোনোদিন প্রশ্ন করা যায়, তোমার প্রিয়তমের কি মৃত্যু ঘটেছে? শিলভিয়া শান্ত মৃদু হাসে। অরণ্যে সে বাস করেছিল তাকে ভুলে যাবার জন্য, কিন্তু সেই নির্জনতা দিল তাকে প্রাণের জোয়ার! যদি তা'র কল্পনার কোনো

ভালো চিন্তা এসে পৌঁছতো, সেটি যেন তা'র প্রিয়তমর প্রতি অভিনন্দনের মতো মনে হোতো। সকাল বেলা ঘুম ভাঙলে সে যেন তা'র প্রিয়তমকেও জীবনের মধ্যে জাগিয়ে তুলতো। জেগে উঠে তারা দু'জনে পাশাপাশি যেন যায় ভ্রমণে—জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে আলাপ করে, মানুষ আর ঈশ্বরের তত্ত্ব নিয়ে কথা বলতে থাকে। কেন কোনো একটা পথ ধ'রে শিলভিয়া নতচক্ষে মন্থরগতিতে চলে ?—এ প্রশ্নের উত্তরে সে বলতে পারতো, একজনের সঙ্গে সে যে গল্প করতে করতে যায়! পৃথিবীতে অন্যায় আছে, বেদনা আছে - কিন্তু ও-দুটোর প্রকাশ আছে ব'লেই আর সবগুলি যে সহনীয়! দশ বৎসরই হোক, শত বৎসরই হোক—কিছু যায় আসে না! কিন্তু ধর্ম কী ? হৃদয় যখন ছাপিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তা'র থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে যে আলোক-রশ্মি অনন্তের দিকে ছুটে যায়—তাকেই হয়ত ধর্ম বলা চলে!

গ্রীষ্মকালে একদিন দুই নারীই ফসল কাটার কাজ করতে করতে ক্লান্ত হতাশায় যেন ভেঙে প'ড়ে দাঁড়িয়ে গেল। মাঠের মাঝে সকলেই কাজে লিপ্ত, সকলের যন্ত্রই চলেছে ঘর্ঘর শব্দে—কিন্তু তা'রা নতজানু হয়ে পায়ে ধরেও কারও সাহায্য লাভ করতে পারলো না। শিলভিয়া কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, হ্যানসাইন, মনে হচ্ছে এবছর সব খড় আমাদের চোখের সামনেই নষ্ট হবে. কিছুই ক'রে উঠতে পারবো না।

হ্যানসাইন বললে, শিগগির যদি একটা লোককে না পাই, তবে আমি নিজে কি কাস্তে ধরতে পারবো না ? গতরে আমার আগুন লাগুক।

কিন্তু একদিন শিলভিয়া যখন রান্নাঘরে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় মাখন তৈরী করতে করতে ছুটে এসে হ্যানসাইন বললে, দিদিমণি, কে যেন একটা বাউণ্ডুলে লোক এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। মুখপোড়াটা কাজ করতে চায়!

ওমা, ও কি কথা, হ্যানসাইন ? লোকটা কেমন ?

কেমন জানি একটা আধবুড়ো লোক,—ঘটেরও নয়, ঘাটেরও নয় ! শহর থেকে এসেছে ব'লে মনে হোলো না, তবে সত্যিকার ক্ষেত-মজুরও নয়, বাপু। কিন্তু লোকটা বারবার ঝোঁক দিয়ে বলছে, আমরা যে কাজই বলবো, ও সব পারবে !

দেখো, ভগবান বুঝি মুখ তুললেন, হয়ত লোকটা আমাদের কাজকর্মের যোগ্য !—শিলভিয়া বললে।

হ্যানসাইন বললে, দাঁড়াও, কাছাকাছি গিয়ে লোকটাকে ভালো ক'রে আগে দেখি !

পরিচ্ছেদ—১৪

দরজার পাশে লোকটি দাঁড়িয়েছিল। সামনের পথটা মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। শিলভিয়া ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো। কাছেই একটা পাহাড়ী গাছে একটি কাঠঠোকরা বাসা বাঁধছিল—শিলভিয়াকে দেখেই লম্বা ল্যাজ দুলিয়ে চীৎকার করতে লাগলো।

আগন্তুক দাঁড়িয়েছিল বিনীত আকিঞ্চনের মতো, শিলভিয়াকে দেখে একটু সহজ হয়ে টুপি তুলে নমস্কার জানালো। লম্বা চওড়া লোক—বয়সটা ঠিক ঠাহর করা যায় না। মাথার চুল-দাড়ি বিবর্ণ। হাতে একগাছা লাঠি, কাঁধে একটা ঝুলি। শিলভিয়া ঈষৎ বাঁকা চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, কাজ চাও বুঝি ?—তা'র এমনি মধুর ভ্রূভঙ্গীটি অতি পরিচিত।

আগন্তুক নতমুখে বললে, আমাকে দিয়ে যে-কোনো কাজ আপনি

করাতে পারেন, দেবী! শিলভিয়ার চোখ দুটি সহাস্য সুন্দর হয়ে উঠলো; এর আগে তা'কে দেবী ব'লে কেউ সম্বোধন করেনি। সে বললে, চাষ-বাসের কাজ বোঝো?

আগন্তুক স্নিগ্ধ হাসি হাসলো। হাসিটুকুতে যেন তা'র মুখখানা অপরিসীম উজ্জ্বল হয়ে উঠলো! বললে, আমি চাষবাসের ঘরেই মানুষ!

কাঠঠোক্‌রাটি ওদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে কুটীরের চালায় বসলো, সেখান থেকে আবার চেঁচাতে লাগলো ল্যাজ দুলিয়ে। শিলভিয়া পরেছিল একটি শাদা লম্বা গাউন, মাথায় বেঁধেছিল শাদা রুমাল—যেন অতি মধুর প্রকৃতির একজন ধর্মসেবিকা। সে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে মাথা নত ক'রে রইলো। শিলভিয়া বার বার তা'র দিকে তাকাচ্ছিল। এক সময় প্রশ্ন করলো, এখন আসছো কোত্থেকে?

আগন্তুক জবাব দিল, উত্তর দেশে আমি রেললাইনে কাজ করতুম।

শিলভিয়া বললে, মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে এসেছে...কিছু জল-টল আগে খাওয়া দরকার—এই ব'লে সে এমনভাবে ভিতর দিকে তাকালো যাতে মনে হয় আগন্তুককে সে ভিতরেই আসতে বলছে তা'র পিছু পিছু।

ঝোলাটা বইতে বইতে যেন লোকটার কাঁধটা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল. এবার সেটা একটু নাড়াচাড়া ক'রে অন্যপাশে নিয়ে শিলভিয়ার পিছু-পিছু ভিতরে এলো। আজ—আজ তা'র সামনে শিলভিয়া! একটু যেন স্বাস্থ্য ওর ফিরেছে; কিন্তু ওর কোঁকড়ানো চুলগুলি উল্লোলিত হয়ে ঝলকে ঝলকে যেন ভিড় ক'রে নেমে এসেছে ওর মাথার রুমালের ভিতর দিয়ে। চলনের গতিতে তা'র পিছনের ছন্দটি সেই আগেকার মতো আজো নেচেনেচে ঢলঢলে হ'য়ে ওঠে!

রান্নাঘরের কাছে এসে সে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, হ্যাঁ, একটা কথা। তোমার থাকার মত একটা ঘর আশেপাশে কোথাও খুঁজে নিতে পারবে? আমাদের এখানে বাড়তি ঘর আর নাই কিনা—

লোকটি বললে, এখানে আমার চেনা কেউ নেই,—তবে এখন গরমকাল, এই কাছেই জঙ্গলটায় লতাপাতা ডালপালা দিয়ে একটা যা হোক মাথা গোঁজার জায়গা বানিয়ে নিলেই চলবে!

মাথাটি হেলিয়ে চুপ করে শিলভিয়া একবার দাঁড়ালো। তারপর বললে, না, সে ভারি অসুবিধে—সে হয় না। হ্যাঁ, আমাদের খড় রাখার ওই ঘরখানা আছে বটে! বিছানাপত্র আমরা খুব দিতে পারবো।

লোকটি উৎসাহিত হয়ে বললে, ঠিক বলেছেন, দেবী, খড়ের ঘরটায় আমার বেশ চ'লে যাবে। দয়া ক'রে ওখানাতেই আমাকে শুতে দেবেন। নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কোনদিন ওখানে তামাক-বিড়ি ধরাবো না।

ওরা রান্নাঘরে ঢুকলো; আর লোকটি একখানা টুলের ওপর দরজার কাছে বসলো। ওদিকে হ্যানসাইনের মুখে কেবলই জিজ্ঞাসু কৌতূহল দেখা যায়—সে একটা স্টোভে আঁচ দিচ্ছিল ওপাশে। আগন্তুক মনে মনে বললে, চিনতে পারেনি! বড় বড় রুক্ষ আমার দাড়ি দুভাগে ভাগকরা, মুখের ওপরকার বয়স, পুরনো জামাকাপড়, অন্য জেলার বাঁকা উচ্চারণ—এসব দেখে কিছুতেই ওর মনে পড়বেনা, এমন লোককে ও কখনো দেখেছে! কিন্তু তা'র চোখ দুটো ঘুরে বেড়াতে লাগলো শিলভিয়ার গতিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে; শিলভিয়া জানলার ধারে টেবিলের ওপর খাবার রাখলো তা'র জন্যে! তা'র সেই নরম হাত দু'খানিতে কত কাজের দাগ পড়েছে; হাত দু'খানা রাঙা হয়ে উঠেছে; খানাখোন্দল দেখা দিয়েছে। সেই হাত দু'খানি নিজের মুঠোর মধ্যে

নিয়ে সে যদি তা'র ওপর নিশ্বাস ফেলতে পারতো ! হাত দু'খানি যেন ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট।

শিলভিয়া বললে, এইখানে এসে বসো।

খাবারগুলি যে কী, তা'র ধারণা ছিল না। কিন্তু মুখের মধ্যে নিয়ে সে অনুভব করলো, এসব শিলভিয়ারই হাতের ছোঁয়া। দুধের পাত্রটা মুখের কাছে তুলতে গিয়ে এমনি হাত কাঁপতে লাগলো যে, তা'কে আবার নামিয়ে রাখতে হোলো।

শিলভিয়া মাথার রুমালটা এবার খুলে ফেলতেই সম্পূর্ণ মাথাটি দেখা গেল। বয়সে সে বেশ প্রবীণ হয়ে উঠেছে। এখানকার জল-বাতাস যত স্বাস্থ্যকরই হোক, কালক্রমিক দুঃখ ও বেদনার দাগ পড়েছে তা'র সর্বাঙ্গে। আঃ শিলভিয়া, আগে যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হোতো!

সেদিন থেকে চাষ-আবাদের কাজে তা'র চাকরি হয়ে গেল।

সন্ধ্যার দিকে সবেমাত্র সে যখন খড়ের গোলাঘরে গুছিয়ে বসেছে, এমন সময় বাইরের সাঁকোটিতে লঘু পদশব্দ শোনা গেল। শিলভিয়া এসে দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে বললে, তোমার কি শীত করবে মনে হচ্ছে ?

লোকটি একটু হেসে উঠলো। বললে, না দেবী, তেমন মনে হচ্ছে না। বেশ আরামে আছি, যেমন বরাবর ছিলুম।

তা'র কথায় শিলভিয়ারও হাসি এলো। শাদা মুক্তাপাঁতির মতো তাঁ'র দাঁতগুলির মধ্যে একটি দাঁত সোনা-বাঁধানো দেখা গেল। শিলভিয়া যাবার সময় বললে, তাহ'লে আরামে থেকো ঘুমিয়ে, আমি আসি।

তা'র মধুর কণ্ঠস্বরে যেন ওর আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদ্বেগটুকু মূর্ত হয়ে উঠলো। সে শুধু বললে, আচ্ছা, আসুন দেবী, নমস্কার।

শিলভিয়ার পদশব্দ মিলিয়ে গেল। বাইরে গভীর দুর্ভেদ্য নীরবতা। দরজাগুলিতে চাবিতালা লাগিয়ে দুইটি নারী শু'তে চ'লে গেল। গ্রীম্মের রাত ছোট। বড় বড় চোখে তাকিয়ে সে শুয়ে রইলো। সে যেন জাহাজ-ডুবি লোক—সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এসে উঠেছে এক দ্বীপের কিনারায়। সে এখানে স্থায়িভাবে থাকতে পারবে কিনা, এখন সে-কথা ভাববার সময় নয়। কালক্রমে জানা যাবে, শিলভিয়ার কাছে সে আত্মপরিচয় দেবে কিনা। কিন্তু আজ এখন সে এখানে। তা'র অপরিসীম বাসনার লোলুপতা এখানে তৃপ্ত হবে কিনা—ততদূর অবধি এখন ভেবে কাজ নেই। শিলভিয়া যেভাবে বলবে, সেইভাবে থাকাই কি ভালো নয়? তা'র মনে হোলো, খড়ের গোলার এমন মধুর গৃহসৌরভ এর আগে এমন ক'রে সে আর কোনোদিন আঘ্রাণ করেনি; কাটা কাঠের দেওয়ালগুলি এর আগে এমন স্নেহময় ব'লে আর কোনোদিন সে অনুভব করেনি। তা'র চোখ দুটো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো। অনন্ত শান্তির একটি তরঙ্গ যেন এই চাষভূমির কুটীরখানিকে মুগ্ধ আলিঙ্গনে ঘিরে রেখেছে—যেন তাকেও ঘিরেছে; খড়ের গোলাটাকেও যেন মুগ্ধ করেছে। ঘুমাও, ঘুমাও তুমি! শিলভিয়া তোমার সব ভার তুলে নেবে; বাকি জীবনের সবগুলি দিন তুমি তা'র কাজের যোগ্য হবে—তা'র সেবা ছাড়া আর কোনো প্রতিদানের কথা তোমার মনে আসবে না। অবশেষে একদিন মহৎ কোনো শক্তির কাছে তুমি অবনত হবে, প্রণাম করবে। সেটি হবে অভিনব কিছু। সেইভাবে তুমি চলো। নিজের জীবন যদি তোমার চারিপাশে ধ্বংস চূর্ণের মতো ছড়িয়ে থাকে—তবুও তাদের মধ্যে এমন ধাতু আছে, যার থেকে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ একটা মানুষ আবার গ'ড়ে তুলতে পারবে! এখন তুমি ঘুমাও—শুধু ঘুমাও!

কিছুক্ষণ পরে সে উঠলো। বাড়ীর চৌহদ্দিতে শিশিরভেজা ঘাসে সে ঘুরতে লাগলো। তার মনে হোলো, শিলভিয়ার চারিপাশে ঘুরে সে যেন পাহারা দেয়,—অমঙ্গল তা'র ত্রিসীমানায় যেন আসতে না পারে। উপরে উষাকালের মলিন আকাশের নীচে ঘরগুলি নিশুতি। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে পর্যবেক্ষণ করলো, একটি কুটীর, একটি রান্নাবাড়ী,—এবং আশপাশে আর দু-তিনটি চালাঘর। ওরই মধ্যে কোথাও ঘুমিয়ে রয়েছে শিলভিয়া। ঘুমাও, ঘুমাও তুমি শিলভিয়া, আজ রাতে কোনো কিছু তোমার কাছে যেতে সাহস করবে না! পূর্বাকাশের মেঘে-মেঘে তখন রং ধরছে। নবপ্রভাতকে সে বন্দনা জানালো!

সহসা সে থামলো। হাসির শব্দ শোনা যায় যেন কোথা থেকে! যাও, দূর হয়ে যাও তোমরা—বিকৃত ছদ্মবেশের দল! না, শিলভিয়ার আজও জরা আসেনি। কেঁদে কেঁদে শিলভিয়া তা'র চোখের জ্যোতি হারিয়েছে—এ যদি সত্য হয়, সে কা'র অপরাধ? চ'লে যাও, দূর হয়ে যাও,—আর যেন তোমাদের সংবাদ আমাকে জানিয়ো না। যাও!

সকালে উঠে দরজার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে দেখেই হ্যানসাইন আবার ছুটে এলো। বললে, শিলভিয়া, সত্যি সত্যিই এবার একটা কাজের লোক পাকড়ানো গেছে। এর মধ্যেই উঠে খড়ের আটি বাঁধতে বসেছে।

না, সে সাধারণ মজুর নয় যে, যতটুকু বলা হবে ততটুকুই কাজ করবে। কতক্ষণে দিনমানটুকু শেষ হবে, এজন্যেই কাজে আলগা দিয়ে বার বার সে ঘড়ি দেখে না। মেয়েরা কেবল মেয়ে-মানুষ মাত্র—ও-লোকটা অনেক কাজ দেখতে পায় যা ওদের চোখে পড়ে না। ঘোড়ার গাড়ীর ওই কব্জাটায়

তেল দেওয়া দরকার, চাকার একটা নতুন ডাঁটি চাই, কলটার ভিতরে দুটো হুক্ না দিলে চলে না। লোকটা তা'র সব কাজকর্মের পর এই কাজগুলো নিয়ে পড়লো। ছোট টাট্টুর সঙ্গে আন্দ্রের ভাব জমে উঠলো খুব। চামড়া পরানোর দোষে ঘোড়াটার গায়ে ঘা ফুটেছে, ওর পেট-বাঁধা চামড়াটা নিশ্চয় বড় হওয়া চাই। ঘোড়াটার রীতিমতো শুশ্রূষা দরকার—সুতরাং আন্দ্রে তাকে নিয়ে গেল একটা ঝরণার ধারে, জল দিয়ে তাকে ধোওয়ালো, গা-বুরুশ ক'রে দিল। পুরুষ মানুষের যোগ্য কাজ আরো কত আছে। গোয়ালের মেঝেটা যেন কেমন উঁচু-নীচু—বেচারি জীবগুলোর শোবার জায়গাটাও যাচ্ছেতাই। দিনের পর দিন ধ'রে তা'র চারিদিকের যা কিছু সব ঝেড়ে-মুছে ঘ'ষে-মেজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে তুললো।

সন্ধ্যাবেলায় শিলভিয়া বেরিয়ে এসে বলে, না, সত্যি আন্দ্রে, আজকে আর নয়, এবার থামো।

আন্দ্রে একটু হেসে বলে, এ আর কতটুকু,—সময় কাটানো বৈ ত' নয়!

কিন্তু আজও—এখনও সে জানে না সে নিজে ঠিক কে! এক সময় একজন আমুদে লোক কোথাও ছিল—তা'র নাম আন্দ্রে বার্জেট। এখনও তা'র ওই নামই আছে, কিন্তু সেদিনকার সেই আরণ্যক বালকের অবশেষ যেটুকু তা'র কাছে রয়েছে—সেটুকু হোলো অস্পষ্ট ঝাপসা স্মৃতিমাত্র! পরবর্তী কালে সে জীবন-রঙ্গমঞ্চে অথবা বাস্তব জীবনে অনেক মানুষের মূর্তি সৃষ্টি করেছে খেলাচ্ছলে, কিম্বা নমুনা দেখে-দেখে। কিন্তু এখন আর কোনো লোভনীয় নমুনা তা'র সামনে নেই, এখন তা'র প্রাণের চেহারা হোলো একটি জাগ্রত বাসনার মতো। তা'র মুখ, তা'র অঙ্গ-প্রতিঅঙ্গ এখন যেন একটি আদিম ইচ্ছাকে মেনে চলে; কিন্তু তা'র মনের চেহারা হোলো

স্বচ্ছ জলাশয়ের মতো—সেই মুকুরে সব কিছু প্রতিফলিত হয়, আবার তখনই মুছে যায়।

অরণ্যে আর শস্যক্ষেত্রের উপরে আকাশ নীল নির্মল। চক্ষুর পল্লব তুলে সে সেই দিকে তাকালো; নীলাভ ব্যোমের নীচে দাঁড়িয়ে তা'র অন্তর, তা'র সকল প্রাণ যেন আদি অন্তহীন নীলাভায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো। শূন্যলোকে ধাবমান চাতকের দল কী বিস্ময়, কী বিস্ময় সমুদ্রপাখীর ইতস্তত আনাগোনায়। হলকর্ষণের আনন্দভরা ফসলের মাঠে মুক্তাদলের মতো উজ্জ্বল শিশিরবিন্দুরা। সব মিলিয়ে তা'র প্রাণসত্তার উপরে এমন একটি প্রবাহ এসে লাগলো যে শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আন্দ্রের ইচ্ছা হোলো—এ আনন্দ বেদনাকে যেন আর কোনো উপায়ে প্রকাশ করার পথ তা'র জানা নেই। বলা বাহুল্য, এই প্রকার অনভ্যস্ত কায়িক পরিশ্রমে সে অতীব ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছে— কিন্তু অবসাদ প্রকাশ না ক'রে এই প্রকার মেহন্নত ক'রে চলা—এ এক রকমের অপরূপ আত্ম-উৎপীড়ন। হায় আন্দ্রে, কত অসমাপ্ত রয়েছে তোমার জীবনে, যদি তুমি তার কতকটাও সম্পাদন করতে পারতে!

তবে কি আবার সে নতুন ভূমিকা সৃষ্টি করছে? না, মোটেই না। কিছুই না করা কতখানি বিশ্রাম! সাধুসজ্জন হবার মতো কোনো পদার্থ যদি তা'র থাকে,—তবে সে-ব্যক্তি নিজেকে সৃষ্টি করবে শিলভিয়ার অভিরুচি অনুযায়ী—শিলভিয়ারই কাছাকাছি ব'সে। হ্যাঁ, তুমি ব'সে থাকো সেই অপেক্ষায় —সে আসবে, সে আসবে, বৈ কি।

একখানা খোন্তা হাতে নিয়ে শিলভিয়া এসে দাঁড়ালো। ঘোড়াটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলো, এক টুকরো রুটি দিল তাকে। তারপর তা'র কপালে

হাত বুলিয়ে দিল, তা'র মসৃণ ঘাড়ের কাছে নিজের মুখখানা বুলিয়ে নিল। এতক্ষণ শিলভিয়া কা'কে যেন ভাবছিল !

রবিবার, সূর্যের আলো ঝলমল করছে ! আন্দ্রে উঠেছে ভোরেই। তা'র ঝুলিতে যে কাপড়-চোপড় রয়েছে তা এমন কিছু বিশ্রী নয় যে, তাই পরে গীর্জায় যাওয়া চলবে না ! সকালবেলা মেয়েরা অন্দরমহলে ব্যস্ত, আন্দ্রে সেই ঘর-দালান-উঠোন পরিষ্কার ক'রে ঝাঁট দিতে লাগলো ; রবিবারের দিনটা যেন চারিদিক ঝকঝকে তকতকে থাকে। একটা চালার তলায় অন্ধকারে সে দেখলো একখানা কুকুর-টানা গাড়ী ; গাড়ীখানা টেনে সে বা'র করলো, জল ঢেলে ধোয়া-মোছা করলো, কলকব্জায় তেল দিল। মেয়েরা বোধ হয় একটু গাড়ী চ'ড়ে বেড়াতে যেতে চায়। এক সময়ে কা'কে যেন ভিতরে নড়তে দেখা গেল—শিলভিয়া তারপরেই বেরিয়ে এলো। সে পরেছে একটি পরিচ্ছন্ন নতুন পোষাক, কোমরে বেঁধেছে একটি ঘন লালরঙের কটিবন্ধ। ঘাড়ের দিকে নুয়ে পড়েছে তা'র ঘন কালো চুলের এলো খোঁপা। কী সুন্দর সে !

ঘুরে ফিরে দেখে শিলভিয়া বললে, দেখছি বাড়ী ঘর দোর তুমি একেবারে নতুন ক'রে গুছিয়ে তুললে।—এই ব'লে সে আন্দ্রের প্রতি যেন একটু বেশীক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

আন্দ্রে মুখ ফিরিয়ে বললে, ওঃ এ শুধু সময় কাটাবার জন্যে !

শিলভিয়া বললে, আচ্ছা, একটু কষ্ট ক'রে গাড়ীখানা চালিয়ে আমাকে গীর্জেয় পৌঁছে দিয়ে আসবে ? ঘোড়াটা যে রকম খাটছে, ওর বেশী মেহন্নত হবে না ত ?

আন্দ্রে বললে, না না, একটুও না। কাল সারাদিন ঘোড়াটা বসেছিল।

আচ্ছা, তাহলে এসো। সকালের খাবারটা খেয়ে নাও।

রান্নাঘরের টেবিলে একটি শাদা চাদর বিছানো। তা'র মনে হোলো তা'র জন্য কে যেন ছোটখাটো একটি বিয়ের আসর প্রস্তুত ক'রে রেখেছে।

অতঃপর গাড়ীতে উঠে শিলভিয়ার পাশে ব'সে চললো গীর্জার পথে। সে ভাবলো, জীবনে এই যেন প্রকৃত প্রথম চলেছে সে গীর্জার পথে! আকাশ ঘন নীল, সূর্যালোক মধুর উত্তাপে ভরা,—এবং আকাশের উড্ডীয়মান চাতক যেন আজ উদ্‌ভ্রান্ত আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে তাদের দু'জনকে পাশাপাশি দেখে। অরণ্যের ওপারে শোনা যায় দেবমন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি; ওই ধ্বনি যেন তাদেরই দু'জনের জন্য। ক্রমে পথঘাট সুসজ্জিত জন-কোলাহলে ভরে উঠলো। ওরা কি সবাই বেরিয়ে এসেছে পথে কেবল তাদের দুটিকেই দেখবার জন্য?

গীর্জার ভিতরে গিয়ে সে অলক্ষ্যে সকলের পিছনে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু শিলভিয়া নির্দেশ জানালো তাকে অনুসরণ করতে। শিলভিয়া ভাবলো এই কৃষক কেবল যে ক্ষেতমজুর—তা নয়। এর কোনো দাবি নেই, অথচ কর্ত্রীর কাজের দিকে সব সময় এর অক্লান্ত দৃষ্টি। লোকটি যেন সত্যকার আত্মীয়ের মতো এসেছে তা'র সর্বপ্রকার স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য।

অর্গানটা যখন বাজতে লাগলো, শিলভিয়া তা'র স্তবের বইখানি একটু পাশ ফিরিয়ে ধরলো আন্দ্রের চোখের সামনে—যাতে দু'জনেই একসঙ্গে স্তবপাঠ করতে পারে। একদা এক ব্রেজিলবাসী কৃষকও ঠিক এমনি করেছিল। সেই লোকটি তা'র প্রিয়তমাকে সঙ্গে নিয়ে গির্জায় গিয়ে একত্রে বিবাহ ঘোষণা পাঠ করেছিল। সেটা ছিল গরমকাল, আজও তাই।

ওরা স্তবগান করতে লাগলো। শিলভিয়ার কণ্ঠস্বর মৃদু মধুর। আন্দ্রে তা'র ওপর নিজের গলা চড়িয়ে দিল; উচ্চকণ্ঠ দিয়ে দুর্বল স্বরটুকুকে সে

যেন আশ্রয় দিতে চায়,—যেন শিলভিয়ার স্বরটুকুকে নিজের হাতে সে তুলে ধরতে চায়। এই স্তবগানকালে শিলভিয়ার স্বাত্ত্বিক চেহারাটি যেন আন্দ্রের অন্তরে উদ্‌ভাসিতরূপে দেখা দিল। আন্দ্রের মনে পড়ে গেল, শিলভিয়া শ্রমিক সংবাদপত্রের গ্রাহক হয়েছিল, নতুন সমাজ-সংস্কার স্বপ্ন দেখেছিল—যে-সমাজে সবাই থাকবে প্রাচুর্যের মধ্যে। তা'র এই বিশ্বাস সকল যুগের নরনারীর প্রতি এনেছিল তা'র গভীর সমবেদনা। আন্দ্রের সঙ্গীত যেন ভগবৎবন্দনার মতো হয়ে উঠলো,—সে নিজেও শিলভিয়ার বিশ্বাসের অংশ নিতে পারতো। হয়ত শিলভিয়ার এই প্রকার সমাজ-কল্পনা অপরূপ অভিনব কিছু নয়—কিন্তু এ কল্পনা তা'র কাছে অতি পবিত্র। মাথা হেঁট করো, আন্দ্রে,—কেউ অত হেঁট করে না—এত নীচে নামাও। অদ্ভুতের ওপারেও কিছু আছে,—এ তুমি দেখছ - অনুভব করছ। আন্দ্রে গান গাইতে লাগলো—আগেকার মতোই তা'র কণ্ঠ উঁচু পর্দায় উঠলো। হতাশা থেকে সে যেন শিলভিয়াকে মুক্ত ক'রে তুলে নিয়ে যেতে চায়—যত কিছু অমঙ্গল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সে যেন শিলভিয়ার বিশ্বাসকে বাঁচাতে চায়। সে অনুভব করলো, তা'র দুইদিকে যেন দু'টি পাখা জন্মেছে; সে উড়ে চললো শূন্যে শিলভিয়াকে নিয়ে। গান গাও, আন্দ্রে,—গান গেয়ে চলো। তা'রা দু'জনে চললো পৃথিবীর উপর দিয়ে কোথাও—তা'রা শুধু দু'জনে। তাদের পিছু পিছু আরো অনেকে, তা'রা যেন সবাইকে পথ দেখিয়ে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে চলেছে। অবশেষে সমগ্র মানবলোক যেন চলেছে তাদের পিছনে পিছনে হংস-বলাকার মতো,—শ্বেতপক্ষদল বিস্তার ক'রে—গান গেয়ে। আমরা সবাই তোমাদের মতন। প্রতিদিন আমরা মিথ্যা বলি, প্রতারণা করি—কিন্তু আমাদের প্রাণসত্তার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে একটি রাজহংস!

একদিন সে জেগে ওঠে, মুক্তিলাভ করে,—তারপর ডানা দুটি বিস্তার ক'রে শূন্যলোকে উড়ে চলে। চলো, উড়ে চলো, রাজহংস! সত্যের যত কিছু জটিলতা আল্‌গা হয়ে যাক্‌, তা'র ওপারে মানুষের পরম তৃষ্ণা সঙ্গীতময় হয়ে উঠুক। শুভ্র রাজহংসই হোলো সেই পরম তৃষ্ণা। ওই তৃষ্ণাই একদিন আমাদের মুক্তি আনবে, বাঁচিয়ে তুলবে। আন্দ্রে, চলো, উড়ে চলো। আন্দ্রে গান গেয়ে-গেয়ে উড়ে চললো শিলভিয়াকে নিয়ে,—রৌদ্রোজ্জ্বল মহাশূন্যলোকে অগণ্য ঐক্যসঙ্গীতের সুর চললো তাদের সঙ্গে সঙ্গে!

পুরনো গাড়ীখানায় আবার ফিরলো তা'রা বাড়ীর দিকে। আন্দ্রে এবার লক্ষ্য করলো, গীর্জাটি দাঁড়িয়ে একটি সরোবরের পাশেই,—আকাশ এবং পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি সেই স্বচ্ছ জলে প্রতিফলিত। আশপাশে পাহাড়ের সবুজ সানুদেশ,—সেখানকার লাল ও শাদা বাগান-বাড়ীগুলি যেন তাঁদের দিকে চেয়ে হাসছে। আন্দ্রে ভাবলো, তা'রা দু'জন যেন দুজনেরই,—আর, ভগবান জানেন, হয়ত আমরা এই জীবনে এবং এর পরবর্তী জীবনের জন্যও একটি বাণী বহন ক'রে চলেছি। এমন গভীরভাবে সে এসব আগে কখনো ভেবেছে—এ তা'র মনে পড়ে না। এটা তা'র ভাবের চৌর্যবৃত্তি নয়, এ ভাবনা তা'র সহজে উদ্‌গত—একে সে আহ্বান করেনি,—একে ছদ্মবেশ পরিয়ে সে বিকৃত ক'রে তোলেনি। সে আরও মাথা নীচু করলো।

স্তবের মন্ত্র নিয়ে শিলভিয়া আলাপ আরম্ভ করলো! উৎকর্ণ হয়ে আন্দ্রে তা'র কথা শুনতে লাগলো এমনভাবে, যেন শিলভিয়া প্রবুদ্ধভাবে আরও কিছু ব'লে যায়। শিলভিয়া অনর্গলভাবে ব'লে চললো—আন্দ্রে যেন

ভিখারীর মতো ঝুলি পেতে গ্রহণ করলো তা'র কথাগুলি ; যেন স্বর্ণমুদ্রা এলো তা'র হাতে। আন্দ্রে যেন হয়ে উঠলো তা'র কাছে শ্রমিক সাধারণের মূর্ত রূপ! শিলভিয়া জানতে চাইলো তা'র অতীত জীবনের কাহিনী ; জানতে চাইলো তা'র কষ্টক্লিষ্ট জীবনের পরিশ্রমের অভিজ্ঞতা। আন্দ্রের জবাবগুলি সংক্ষিপ্ত। নিজের সম্বন্ধে সে যেন কতকটা নীরব থাকতে চায়। শিলভিয়া উপলব্ধি করলো, এই হোলো প্রকৃত গৌরব ও চিত্তসংস্কৃতি,—অথচ এর পরেও অভিজাত সমাজের লোকেরা নিজের উচ্চ শিক্ষার বড়াই কারে।

ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে আন্দ্রে রান্নাঘরে এলো। হ্যানসাইন তখন বাসনপত্র নাড়াচাড়ায় ব্যস্ত। খুশী মুখে হ্যানসাইন বললে, তুমি বৈঠকখানায় যাও,—শিলভিয়া বলেছে তুমি আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে।

ওঘর থেকে গানের আওয়াজ আন্দ্রের কানে এলো। সে গিয়ে সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকলো। ছোট একটি মাঠকোটা ঘর, জানলার উপরে পর্দা, এপাশে একটি পিয়ানো, ওপাশে ছোট একটি টেবিল। সোনালী রংয়ের চেয়ারগুলি ও সোফাটা সে এনেছে শহরের বাড়ী থেকে। কাঠের দেওয়ালে কতকগুলি চিত্র—তাদের মাঝখানে জনৈক যুবাদর্শন ব্যক্তির একখানি বড় আলোকচিত্র টাঙানো—সেটি ডালপালাযুক্ত সুন্দর ফ্রেমে আঁটা। সে দিকে পলকের জন্য তাকিয়ে আন্দ্রে মুখ ফিরিয়ে নিল,—তা'র চোখ দুটো যেন দ্রুত অন্যদিকে নিবদ্ধ করবার চেষ্টা করলো।

শিলভিয়া সুন্দর পোষাক প'রে পিয়ানো বাজাচ্ছিল! মুখ না ফিরিয়ে বাজনাটির উপরে আঙুল টিপতে টিপতেই বললে, বসো, আন্দ্রে!

কতক্ষণ পরে বাজনা থামিয়ে সামনের দেওয়ালে বড় ছবিখানার দিকে সে তাকালো। যেন তা'র নিজের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ওই যুবা ব্যক্তির কাছে অনুমতি

চাইলো। তারপর সে উঠে দাঁড়ালো, ফ্রেমের পাড় থেকে একটু ধূলিকণা তুলে নিয়ে যেন ছবিটিকে সমাদর জানালো। আন্দ্রের চোখে সমস্তটা যেন অভিনব মনে হোলো।

সহসা শিলভিয়া তা'র দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো, তুমি বিয়ে করেছ?—আচ্ছা থাক্, মনে কিছু করো না—হয়ত তোমার স্ত্রী-সন্তান দুই-ই আছে!

আন্দ্রে বললে, না দেবী, এমন সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি!

শিলভিয়া বললে, আর তুমি আমাকে দেবী ব'লে ডেকো না। ওটা ব'লে কেনই বা ডাকবে?—এই ব'লে সে হাসলো; তা'র মুখখানিতে যেন রক্ত ফেটে পড়লো।

ব্যস্তভাবে সে টেবিলের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগালা, গুন-গুন করতে লাগলো সর্বক্ষণ। কী লঘু গতিভঙ্গী তা'র! যা কিছু স্পর্শ করে সে,—যেন যাদুর স্পর্শ! একবারটি সে বেরিয়ে গেল, তারপরেই সে ফিরে এলো পুষ্প স্তবকের একটি পাত্র হাতে নিয়ে। তা'র বেশভূষায় যেন আবার নববসন্তের বন্যা এসেছে।

খাবার আসরে ব'সে আন্দ্রে যেন সব গুলিয়ে ফেললো। শিলভিয়া জিজ্ঞেস করলো, তা'র কাছে কিছু কিছু বই নিয়ে সন্ধ্যার পরে সে পড়াশুনো করে না কেন? খানকয়েক উপন্যাস আর কতকগুলি সমাজসমস্যাবর্ণিত বই আছে তা'র কাছে। বাইরের ঘরে ব'সে স্বচ্ছন্দেই সে বইগুলি পড়তে পারে। তা'রা সবসুদ্ধ তিনজন—তিনজনের জায়গা এ বাড়ীতে আছে বৈ কি।

ক্ষুব্ধ আনন্দে হ্যানসাইন বার বার উঠে যায়—যেন রান্নাঘরে তা'র কত কাজ প'ড়ে রয়েছে, যেন কিছু আনতে হবে। হ্যানসাইন ভাবলো, শিলভিয়া আজকাল যা কল্পনা করতে আরম্ভ করেছে সেটা একেবারে পাগলামি; এই

লোকটা দেখছি মেয়েটার মাথাটা একদম ঘুরিয়ে দেবে! তা'রা দুজন একসঙ্গে সমানে-সমানে বেশ কাটাচ্ছে, কিন্তু রাম-শ্যাম-যদু এসে যদি শিলভিয়াকে আবার আটপৌরে নামে ডাকতে থাকে এক আসনে ব'সে—তবেই হয়েছে আর কি! এই বেমক্কা লোকটা যত তাড়াতাড়ি স'রে পড়ে, ততই ভালো, বাপু। নৈলে, ভগবানই জানেন, দু'জনের কপালে কি ঘটবে!

পরিচ্ছেদ—১৫

গ্রীষ্মকাল পেরিয়ে চলেছে। সব খড়গুলি গোলাঘরে উঠেছে,—আন্দ্রে মনে মনে কাঁপচে, এবার বুঝি ইঙ্গিত আসে—তা'কে আর দরকার নেই! সে প্রস্তাব করলো, জমিতে নালা কেটে জল নিয়ে যাওয়া দরকার,—শিলভিয়া তখনই রাজি হয়ে বললে, হ্যাঁ, ওটা প্রয়োজন। নালা কাটা শেষ হতে না হতেই সে প্রস্তাব করলো, খালের ওদিককার মাটিগুলো চৌরস করলে ভালো হয়। বললে, দিন পনেরোর মধ্যেই আমি ওটাকে চমৎকার ক্ষেত বানিয়ে তুলবো।

শিলভিয়া বললে, বেশ, যদি অল্প সময়ে হয় তবে এটা শেষ ক'রেই ওটায় লাগো। আন্দ্রে খুশী হয়ে তড়ি-ঘড়ি লেগে গেল। যাক্, এখানে থেকে যাওয়ার আর একটা অজুহাত জুটে গেল। শিলভিয়া অনেক সময়ে তা'র কাজের মাঝখানেই হাতে ক'রে খাবার আনে, যতক্ষণ আন্দ্রের খাওয়া না হয় ততক্ষণ ব'সে ব'সে গল্প করে। সন্ধ্যার দিকে উচ্চকণ্ঠে পড়াশুনা করে, বৈঠকের খোরাক জোটে। একজন মজুরের সঙ্গে এর আগে এত গল্প সে করেনি,—এর আগে একজন নবাগত এত অল্প সময়ে তা'র এতখানি বিশ্বাসও

উদ্রেক করেনি। শিলভিয়া ভাবে, একি ওর নিজের জন্যে, অথবা ও যে শ্রমিক সাধারণের মুখপাত্র, তাদের জন্যে? বাস্তবিক, লোকটি কী বুদ্ধিমান, সংযতবাক আর দক্ষ! অথচ এই বলিষ্ঠ লোকটা যখন হাসে,—যেন শিশু! অনেক লোক আছে যারা একনিষ্ঠ শ্রোতা। অন্যের কথা তাদের মনে প্রতিধ্বনি তোলে,—তাদের সঙ্গে আলাপ করলে নিজের অন্তরও প্রসারিত হয়। যে-চিন্তা ভাষায় প্রকাশ্য ব'লে মনে হয় না, সেই চিন্তাবলী ওরা যেন বক্তার মন থেকে টেনে বের ক'রে আনে। আন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করার সময় শিলভিয়ার মনে হয়, তা'র যা কিছু পড়াশুনা আর ভাবনা—সব যেন আন্দ্রের সম্মত-ভাবের মধ্যে সুন্দর হয়ে ওঠে! পরের দিন দেখা যায়, আন্দ্রে আবার সেগুলি আপন মনে মিলিয়ে স্বাধীনভাবে বিচার করেছে। শিলভিয়া যেন একটি মানুষের মনে বীজ ফেলে ফসল অঙ্কুরিত ক'রে তুলেছে। মেয়েমানুষের মনে এর চেয়ে উল্লাস আর কী আছে? আবার যেন সে একজনের কাছে বিশেষ মূল্য পেয়েছে, এবং এই অনুভূতিই আবার তাকে অপ্রত্যাশিত নবীন আনন্দ এনে দিয়েছে! সামান্য একটু পরিহাসের ছোঁয়া পেলেই সে খিল-খিল ক'রে হাসতে থাকে, একটুতেই কুমারী তরুণীর মতো গান গেয়ে ওঠে।

আবার ঠিক এমনি সময়ে আন্দ্রে যেন বুঝতে পারে, শিলভিয়া তা'র সম্বন্ধে যেন কৌতূহলী। আন্দ্রে নিজের সম্বন্ধে এত নীরব কেন? তা'র জীবনে কি কি অভিজ্ঞতা?—শিলভিয়ার অজ্ঞাতসারে তাদের উভয়ের সম্পর্ক ইতিমধ্যেই এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যে, শিলভিয়া যে-কথা আর কারো কাছে বলে না, সেই কথা সে ব'লে যেতে পারে আন্দ্রেকে। যখন এক কাজ শেষ ক'রে অনির্দিষ্টভাবে আন্দ্রে অন্য কাজ ধরে,—তখন লোকটি কী ভাবে? একদিন মালপত্র ব'য়ে নিয়ে শিলভিয়াকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার পথে—তা'রা

আগেকার কালের এবং এখনকার বিয়ের ব্যাপারটার আলোচনা পাড়লো। কী যে সে বলছে আন্দ্রের কাছে, একথা ভালো ক'রে হৃদয়ঙ্গম করার আগেই, শিলভিয়া তা'র দেওয়ালে টাঙানো ছবিখানার আসল কথাটা ব'লে ফেললো। লজ্জা হোলো তা'র তখনই,—তবে আন্দ্রে নতমুখে নিঃশব্দে চলছে দেখে শিলভিয়া একটু স্বস্তিবোধ করলো। বাস্তবিক, আজকাল আন্দ্রেকে আগে জিজ্ঞেস না ক'রে সে কোনো কাজই স্থির করতে পারে না। আন্দ্রে আবার ফিরে আসবে আগামী বসন্তকালে, কিন্তু তা'র আগে শীতকালটা ভারি দীর্ঘ একঘেয়ে।

এদিকে আন্দ্রে! তা'র অভিজ্ঞতা অপরূপ! সে যেন মানুষ হয়ে উঠতে পাচ্ছে না। শিলভিয়া তা'র কেমন ছাঁচটি চায়, তা'র সঙ্কেত শোনার জন্য আন্দ্রে যেন উৎকর্ণ হয়ে থাকে। ওই নারীর আস্থাটুকু কী মধুর! শিলভিয়া তা'র সৎপ্রকৃতিতে বিশ্বাস করে—আন্দ্রে চেষ্টা করে সেই প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে জাগ্রত ক'রে তুলতে। শিলভিয়া মনে করে, আন্দ্রে জীবনে অসত্য বলেনি; আন্দ্রে স্থির করলো, জীবনেও আর মিথ্যা বলবে না। শিলভিয়ার ধারণা সে ভদ্র, রুচিবান; আন্দ্রে ভাবলো, আমি তাই যেন হয়ে উঠি। শিলভিয়ার বিশ্বাস, চাষবাসে আন্দ্রে ভারি দক্ষ; আন্দ্রে মনে মনে বললে, আর সব কিছুর মতন চাষ-বাসটাও ত আমি ভালো ক'রে শিখতে পারি! এই মনে ক'রে সে পরীক্ষা করতে লাগলো, এই ভূভাগটুকুকে কেমনভাবে আদর্শ ফসলের ক্ষেত বানিয়ে তোলা যায়! একদিন আন্দ্রে যখন প্রস্তাব জানালো, এখানে মৌমাছির চাষ, আর ফুলের বাগান তৈরী করলে বাজারে বেশ দাম হ'তে পারে,—শিলভিয়া তৎক্ষণাৎ অতি উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বললে,' খুব রাজি আমি। ধরো, প্রত্যেক শ্রমিকের যদি এমনি একটি ফুলবাগান থাকে, তাহলে তা'র কত উপরি রোজগার হয়, বলো ত?

জগতের অর্ধেক মানব পরিবারের মঙ্গল কামনা যেন ওই নারীর! হায় বালিকা, কল্পনারও একটি সীমা আছে!

তবু, নবপরিকল্পনা এলো আন্দ্রের মনে, সে নানাপ্রকারে ভাবতে বসলো। আর কিছু না হোক, শিলভিয়া ত যুক্তিহীন নয়! পৃথিবীর সকল মানুষ কি পরস্পরের মুখাপেক্ষী নয়? অন্যায় করলে কেবল একজনের ক্ষতি নয়, বহু লোকের—এমন কি সকলেরই অমঙ্গল ঘটে। যদি কেউ মহৎ কাজ করে, সেটি সকলেরই মঙ্গল বহন ক'রে আনে। আমাদের ভাবনা বাসনার সঙ্গেও সকলে গ্রথিত। সুতরাং ওর পরিকল্পনাটা তাকে সচকিত ক'রে তুললো বৈ কি। শিলভিয়া ঠিক বলেছে,—এই কল্পনাটিকে নিয়েই তা'কে বেঁচে থাকতে হবে। এইটিই তা'র থাকার পক্ষে সঙ্কেত। অনেক সময়ে মুখে সে সম্মতির হাসি হাসে, আর মনে মনে শিলভিয়ার কথাগুলি তলিয়ে সে যেন নিবিড় আনন্দের আস্বাদ পায়।

শ্রমিক সমস্যা,—হায়, কত সমাধান তা'র জানা! এ সম্বন্ধে কত একঘেয়ে সস্তা বক্তৃতা সে শুনে এসেছে; কিন্তু শিলভিয়ার মুখ থেকে শুনলে এরা যেন নতুন দাম পায়। বড় কোনো হোটেলে ব্যস্তসমস্ত চাকরের হাতে খাওয়া এক জিনিস, কিন্তু কোনো সুশ্রী ধর্মসেবিকার হাত থেকে রুটি-জল পাওয়া —সে যে দেবভোগ্য! আন্দ্রে ভাবলো, এসব সমস্যার হাল ছেড়ে ব'সে থাকা কিছু নয়,—অথচ যে ভাবে চলছে সেভাবে চালানোটাও আর চলে না। যদি প্রতিকার করতে না পারো, অন্তত সামনে এসে দাঁড়াও, একটা বোঝাপড়া করো। দূরে লুকিয়ে থাকা ত কাপুরুষতা! যে সব সমস্যার প্রতি আন্দ্রে এতকাল ধ'রে মুখ বিকৃতি ক'রে এসেছে, সেগুলি সে গভীরভাবে ভাবতে বসলো,—যেন নব নব দিগন্ত খুলে যেতে লাগলো

্'র চারিদিকে। পৃথিবীটা যেন বিস্ময় ব্যাপকতায় বৃহৎ হয়ে দেখা দিয়েছে।

একদিন মাঠে কাজ করতে কাস্তেখানায় ভর দিয়ে সহসা সে থামলো। বাতাসের মধুর নিঃশ্বাসে সোনার শস্য-ক্ষেত্রে ঢেউ খেলে চলেছে। গাছে গাছে ধরেছে রাঙা কিশলয়,—রৌদ্রে তখনও রয়েছে উত্তাপ। অন্যদিন অপেক্ষা আজকের দিনটির চেহারা পৃথক—এটি বিস্ময়কর। অনন্তকাল থেকে বিচ্ছিন্ন এই দিনটি যেন উর্মিমুখরতায় ভরা, অথচ এ-দিনটি যেন তা'র আলোকিত প্রাণসত্তায় প্রতিফলিত একটি পরিপূর্ণ মূর্তি। বিস্ময়ে আন্দ্রের চোখ দুটি পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। আগে একথা কে জানতো, একজনের দায়িত্বভার যতই আকণ্ঠ তুলে নেওয়া যায়, ততই শক্তি বাড়ে, প্রাণসত্তার ভিতরে ততই ঐশ্বর্য্যের সন্ধান মেলে। যেন কোন্ অজানা শক্তির স্পর্শে চোখ খুলে যায়, যেন চোখে পড়ে পৃথিবী পরম আশ্চর্য, পরম সৌন্দর্যময়! তখন যেন মনে হয়, মানুষই আপন চৈতন্যলোক থেকে সৃষ্টি করেছে স্বর্গ ও মর্ত্য! আন্দ্রে, এসব কি তুমি আগে কখনও ভেবেছিলে? কখনও স্বীকার করেছিলে সৃষ্টির বিরাটতা,—মানবাত্মার বৃহত্তর সম্ভাবনার কথা? এই মহৎ সত্য উপলব্ধি করার জন্যই কি তুমি এতকাল জীবিত রয়েছ?

এমন সময় একটি নারী দূর্বামসৃণ সানুদেশ থেকে নেমে এলো সাজি হাতে। একে চেনো তুমি, আন্দ্রে? গতরাত্রের শিশির পতনের ফলে ওর পায়ের জুতো দুটি ভিজে চকচক করছে,—সে আসছে, সপ্রতিভ মধুর হাসি হেসে,—মধুর-কৌমার্যের সলজ্জ সংযত হাসি যেন ওর মুখখানিকে আরক্তিম ক'রে তুলেছে। হয়ত সে আবার কিছু একটা ভেবেছে,—আন্দ্রের কাছে আসছে

অভিমত শুনতে। মাথা নত করো, আন্দ্রে,—ওর নিষ্পাপ মাধুর্য উপলব্ধি করো!—আন্দ্রে মাথার টুপি নামিয়ে রাখলো।

শিলভিয়া বললে, মাটি চৌরস ক'রে সব পরিষ্কার ক'রে ফেলেছ দেখছি।

জামার হাতায় কপালটা মুছে হাস্য কৌতুকের সঙ্গে আন্দ্রে বললে, এখানে কাঁকর-পাথর কি কাঠ-কুটো তেমন কিছু নেই! এসব কাজ বৃদ্ধ কুঁড়েরাও পারে।

সাজিটি এগিয়ে শিলভিয়া বললে, এসব শেষ ক'রে কি করবে ভাবছ?

আন্দ্রে হাসলো,—তা যদি জানতুম!—এই বলে কাস্তেখানা নামিয়ে সে পুনরায় বললে, ভাবছি সুতোর কাটিম আর সূঁচ ফিরি ক'রে বেড়াবো।

নিজের হাতখানা সে মুছলো ঘাসে, তারপর পাজামায়,—তারপর শিলভিয়া তা'র হাতে তুলে দিল চকোলেটের পেয়ালাটা।

শিলভিয়া বললে, ওটা তোমার মনের কথা নয়। তুমি জানো ঠিক, এসব কাজ তোমাকে মানাবে না। বরং তুমি কোনো শ্রমিক সঙ্ঘে ভর্তি হও। আমি জানি তুমি ভালো বক্তা হ'তে পারবে।

কিন্তু ও-কাজে অনেক লোক আছে, তা'রা বেশ গলগল ক'রে বলতে পারে!

ও-কথা ব'লে তুমি স'রে থাকতে পারো না।

আন্দ্রে হাসলো। শিলভিয়া বসলো সেখানে,—তারপর দু'জনে আলাপ চলতে লাগলো। তারপর সাজিটি তুলে নিয়ে কিছুদূর গিয়ে উপত্যকার মাঝপথে দাঁড়িয়ে তা'র দিকে হাত নাড়লো! বাস্তবিক, কাস্তেখানা ধরা অথবা খোন্তা দিয়ে মাটি কোদলানো—এসব কি শক্ত কাজ? কিন্তু কাজের মধ্যেই কত চিন্তা তা'র মাথার মধ্যে ছুটোছুটি করে। এই নারীকে দেখলেই মনে

পড়ে স্বচ্ছ সরোবরের প্রতিফলিত সবুজ মাঠ আর নীল আকাশ,—আর যদি তুমি মুখ বাড়াও, তোমারও প্রতিফলিত মুখমণ্ডল! কিন্তু ঈশ্বর জানেন, তোমার মুখে সৌন্দর্য নেই। তুমি দেশ-সচিবই হও আর ক্ষেত-মজুরই হও,—আসল কথাটা হোলো, কী লক্ষ্য নিয়ে তুমি রয়েছ; তুমি আপন সত্তার মধ্যে কেমন জগৎটিকে সৃষ্টি করেছ! তোমার হৃদয়ে যে অপরূপ অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তুলেছ, সেটি কি? ধর্ম? কিন্তু ধর্ম বস্তুটি কি? সেটি কি মজুরদলের বেতন বৃদ্ধির চিন্তা, অথবা অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে নবসমাজ গঠনের ভাবনা—এ ছাড়া কি আর কিছু নয়? পাগল আর কি! সেটা প্রথম ধাপ মাত্র। আজও মানবজাতি রয়েছে প্রবল বিপর্যয়ের মধ্যে,—কিন্তু ওদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা। আমরা চলেছি সেই পথে। সাগরের দূরান্তে দিগন্তলোকে সেটি রূপলোকের মতো,—সেইটির জন্ত অভীপ্সা,—সেটির উপর দিয়ে রক্তিম উষার আলো নেমে আসবে পৃথিবীতে, এই হোলো আদর্শ। চলো আন্দ্রে, সেই পথে চলো। এখন বিশ্বাস করি, তুমি মানুষের মূর্তিলাভ করছ!

রান্নাঘরের পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে হাত দু'খানা ঝুলিয়ে হ্যানসাইন সতর্কভাবে প্রায়ই লক্ষ্য করে—শিলভিয়া কেমন ভাবে ওই মজুরটার কাজের মাঝখানে খাবার নিয়ে মাঠের দিকে যায়। সেদিন শিলভিয়া মাঠ থেকে ফিরে সাজিটি নামাতেই হ্যানসাইন বললে, কেবল একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, শিলভিয়া,—তুমি আর একটু সতর্ক হও।

সতর্ক?

হ্যাঁ, ওই বিদ্‌ঘুটে লোকটা বলতে গেলে তোমায় মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

ওর সম্বন্ধে ঠিক কতটুকু জানো তুমি? চোর-বদ্‌মাইস যা কিছুই হ'তে পারে—কিন্তু ওর সঙ্গে তোমার এমন বন্ধুত্ব······যেন তোমার ····ধরো, যেন তোমার ভাই।

হানসাইন, যাও, তুমি নিজের কাজ করোগে।

হ্যাঁ, তা যাচ্ছি। আমার মরণ হয় না কেন···চিরকাল নিজের চাকাতেই ঘুরে মলুম। পোড়া ভগবানের দেখা পেলে মুখের ওপরেই বলতুম,—যাকগে, আর আমি কিছু বলতে চাইনে। শুধু বলি, একটু সাবধান হও, বাছা। এস উড়নচুড়ে লোকদের কথা তুমি ত অনেক জানো······

আচ্ছা থাক্, চুপ করো তুমি।—শিলভিয়া হনহন ক'রে বাইরে চ'লে যায় পিছন থেকে শোনা যায়, বুড়ি ঝি রাগে থালাবাসন ঝনঝনিয়ে তুলছে।

একদিন রাত্রে গোলাঘরে ঢুকে আন্দ্রে চোখ বন্ধ ক'রে ঘুমের আয়োজন করছে কিন্তু রাজ্যের চিন্তায় মস্তিষ্ক জটিল হয়ে ওঠে তা'র,—ঘুম অসম্ভব।

সুইডেনের এক ব্যাঙ্কে তোমার কিছু টাকা জমা আছে, আন্দ্রে। পুলিশের গ্রাস থেকে তুমি সেটা অদ্ভুত উপায়ে বাঁচিয়েছিলে বটে। তোমার ঝুলির মধ্যে আছে সেই পাস বইখানা। ওতে ছোটখাটো একটা ভাগ্য ফিরে যায় বৈ কি তুমি কোনো সময়ে ক্ষেতমজুরের ছদ্মবেশ ছেড়ে ভদ্রলোক ব'নে যেতে পারো তুমি কোনোদিন সাম্যবাদীদের ঋষি হয়ে উঠবে কিনা,—সে আলাদা কথা,—কারণ তখন তোমার পক্ষে বেশী সোনারূপো চেপে রাখা চলবে না। এখন সে কথাও থাক্। কিন্তু এই টাকাটা তুমি যোগাড় করেছিলে কেমন ক'রে বলো ত? বাস্তবিক, টাকাটা কি তুমি নিজের পরিশ্রমে উপার্জন করেছিলে?

অন্ধকারে শিলভিয়ার ছায়ামূর্তি কী যেন বলতে চায়!

আন্দ্রে হাসবার চেষ্টা করলো। বন্ধু, এবার যেন বিশ্বাস হয় তোমার বিবেক জেগে উঠছে! এতদূর এগিয়েছ তুমি? তাহ'লে আর কি, হয় পাস বইখানা আগুনে ফেলে দাও, নয়ত টাকাটা নিয়ে গরীবদের বিলিয়ে দাও, কেমন?

তাইত! আন্দ্রে ঘুরে ফিরে বেড়ায়।

পাস বইটির মানে স্বাধীনতা। ব্যাঙ্কের গোমস্তা সাজা তা'র সকলের বড় কীর্তি! এটি তা'রই চিহ্ন; এটিকে সে ত্যাগ করবে? কিন্তু শিলভিয়া তা'র অন্তরে সাক্ষ্যস্বরূপ ব'সে রয়েছে। আন্দ্রে, তুমি তোমার হৃদয়কে গুছিয়ে তোলো; যা কিছু জীর্ণ তাকে পরিত্যাগ করো। আন্দ্রে ওলোটপালট খেতে লাগলো,—কে যেন তাকে চাবুক মারছে,—ওই যেন পাস বইখানাই! নতুন মানুষটা তা'র ভিতর থেকে যেন বলছে, ফেলে দাও পাস বইখানা, নৈলে তোমার যা কিছু সবই মৌলিক, সবই ফাঁকা।—কে যেন শক্ত হাতে তাকে দেওয়ালে আছড়াচ্ছে, তা'র আর নিস্তার নেই। পাস বইখানা সত্যিই কি ত্যাগ করা দরকার?

ভালো ক'রে কিছু বুঝবার আগেই সে যেন একটা ছায়ামূর্তিকে সৃষ্টি করেছে, —সেই ব্যক্তি গোলাঘরে ঢুকে তাকে যেন ভালো ক'রে সব বোঝাচ্ছে।

জানো, সেসময় এই টাকার মালিক কে ছিল? তা'রা হোলো ধনবাদী। তা'রা গরীবদের ওপর ডাকাতি ক'রে এই সম্পদ আহরণ করেছে। তুমি একজন সাম্যবাদী, তুমি কি তাদের মালিকানাকে শ্রদ্ধা করো? তুমি নিজে একজন শ্রমিক, তোমার শ্রেণীর লোক যদি এইভাবে সামান্য টাকাও তাদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে থাকে, সেটা কি খুব অন্যায় হয়েছে? যদি তুমি কোনো বড় কাজে নিজেকে ঢেলে দিতে সমর্থ হও, তবে কি এই টাকা কয়টা

সত্যিই তোমার দরকার হবে না? তুমি যখন সত্যের জন্য সংগ্রামে রত থাকবে, তখন কি ভিক্ষা করবে দ্বারে দ্বারে? কেন ছেড়ে দেবে এ টাকা? বরং যেখানে যত ব্যাঙ্ক আছে সবগুলো লুঠ করো। শ্রমিকের এই রক্তপান ক'রে ব্যাঙ্কবোর্ডের তথাকথিত ভদ্রলোকরা অত চিক্কণ আর নধর হয়ে উঠেছে।

ছায়ামূর্তি মানুষটা যুবা, অন্ধ উত্তেজনায় শীর্ণ। এবার সে একটা সিগারেট ধরালো।—

যদি পাস বইখানা ফেলে দাও, আমরা জানবো তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। তুমি জানো তোমার ওই দেবীটি—ওরও একটি ছোটখাটো গচ্ছিত ভাগ্য আছে? ওর বাবা ছিল ডাক্তার, অস্ত্রচিকিৎসক। তা'র বেশীর ভাগ রোগী মরেছে, কিন্তু টাকা নিয়েছে মোটা মোটা! তোমার দেবীটি সেই টাকাই পেয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রে। কথায় কথায় তুমি জানতে চাও, ভদ্রসম্প্রদায় কিভাবে ভাগ্য ফিরোয়। কিন্তু দোহাই, তুমি যেন ওই নারীটিকে বলোনা, ওর অর্ধেক টাকা ছাড়তে রাজি আছে কিনা। মনে আছে তোমার, পাশের প্রতিবেশীর একটি গরু ওর খামারে যেদিন ঢুকেছিল, শিলভিয়া একটা লাঠি নিয়ে জন্তুটাকে কেমনভাবে তাড়া ক'রে বেড়া পার ক'রে দিয়ে এলো? তুমি কি লক্ষ্য করেছিলে কী চাতুরীর সঙ্গে মহিলাটি নিজের এবং অন্যের খামারের সীমারেখাটি নির্দিষ্ট করার জন্য কতখানি পরিশ্রম করেছিল?

আস্রের মনে হোলো তা'র ভিতবে যেন একটা পিশাচ জেগে উঠেছে। ওরে পাষণ্ড, কী বলিস? তুই কি বলতে চাস, শিলভিয়ার সাম্যবাদ গরু পর্যন্ত পৌছয় না?

না,—একখানা বিকৃত মুখ ভ্রুকুটি ক'রে বললে, পাশের প্রতিবেশীটি পর্যন্তও নয়!

সহসা আন্দ্রে অসহ্য লজ্জায় দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকোলো। কী যে আঘাত এই প্রকার চিন্তায়! তবে কি সে শিলভিয়ার প্রতি ভ্রুকুটিভঙ্গী আরম্ভ করেছে?—যাও, দূর হয়ে যাও, শয়তান,—আর তুমি শিলভিয়ার নাম মুখে এনোনা।

কিন্তু তবু—এক এক সময়ে এটা কি স্বস্তির মতো মনে হয় না যে, সুবিধে পেলে যা পবিত্রতম, মধুরতম—তা'কেও পদাঘাত ক'রে তাড়াই?

পরিচ্ছেদ—১৬

সন্ধ্যার সময় শিলভিয়ার সঙ্গে একটি মোট ব'য়ে নিয়ে যাওয়া—সেইটিই কি শিলভিয়ার সঙ্গে তা'র শেষ সন্ধ্যা? ঘোড়াটা সম্প্রতি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে,—সুতরাং তাদের দু'জনকে পাশাপাশি দোকানের দিকে হেঁটে যেতে হচ্ছে। গীর্জার নীচে দিয়ে সরোবরের পাশ কাটিয়ে তা'রা চলেছে। সরোবরের জল স্বচ্ছ, আকাশ থেকে মেঘেদের ছায়া পড়েছে তা'র বুকের ওপর। অস্তগামী সূর্যরশ্মি দূরে ছোট ছোট বাড়ীর দরজা জানলায় প'ড়ে যেন আগুনের মতো জ্বলছে। কয়েকদিন বৃষ্টির পর আকাশ আবার লঘু, পরিচ্ছন্ন,—পায়ের নীচেকার পথটি কোমল। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় অদূরে পাহাড়ের গায়ে স্বর্ণাভ রশ্মিরেখাগুলি ক্রমে ক্রমে নীলাভ হ'য়ে এসেছে। শান্ত নিঃশব্দভাবে একটি দিন শরৎ রাত্রির দিকে গড়িয়ে চলেছে।

মাথায় একটা খড়ের টুপি দিয়ে একটি হালকা নীল ছিটের পোষাক

চড়িয়ে শিলভিয়া চলেছে তা'র পাশে পাশে। ওর মাথার টুপিটা দুলছে। আন্দ্রে চ'লে যাবে এই কথাটা বাতাসে যেন ভাসছে, সুতরাং বলবার মতো কোনো কথা না পেয়ে শিলভিয়া গুন-গুন ক'রে একটা সুর ধরেছে। মাঝে মাঝে সে থমকে দাঁড়াচ্ছে পথে, সরোবরের দিকে তাকিয়ে শিষ দিচ্ছে,—মনের কথাটা ভাষায় না ব'লে সে যেন এই ভাবে প্রকাশ করতে চায়। তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর কোনো লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারা কতখানি সহজ,—এটা বাস্তবিকই আনন্দের! কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে কথা বলতে গেলেই আর একজনের কথা তা'র মনে আসে কেন?

একথা ভালো ক'রে বোঝবার আগেই শিলভিয়া বললে, জানো, মনে পড়ছে এমনি এক সন্ধ্যায় সেই আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলুম;—আমরা দু'জনে।

হুম।--আন্দ্রে কপালের টুপিটা উঁচু ক'রে দিয়ে আগের চেয়ে আস্তে হাঁটতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে শিলভিয়া বললে, কিন্তু সে-সময়ে সমুদ্রের খাঁড়ি ধ'রে আমরা দক্ষিণ দিকে গিয়েছিলুম। সেদিনের সন্ধ্যা ঠিক আজকেরই মতন।- নিশ্বাস ফেলে পুনরায় সে বললে, বেশ মনে পড়ে, সে তখন ভাবতো হাজার বছর, কি তারও পরে—পৃথিবীর চেহারা কেমন হবে। সে ভাবতো, ধর্ম আর মনুষ্যত্ব কবে অখণ্ড সত্তায় সম্মিলিত হবে। কবে রোগ, দারিদ্র্য, দুঃখ আর অবিচার চ'লে যাবে পৃথিবী থেকে।

বহুকাল পূর্বেকার সেই রোমাঞ্চকর সন্ধ্যাটি কল্পনা ক'রে শিলভিয়া যেন নত মুখে মানসনেত্রে সেই ছবি দেখতে থাকে।

আন্দ্রে একটা অদ্ভুত চিন্তার মধ্যে ডুব দেয়। তা'র বেশ মনে পড়ে, শিলভিয়ার প্রেমাস্পদ এমন কোনো কথা কখনো বলেনি। বোধ হয় পরবর্তী-

কালে শিলভিয়া কোথাও এসব পড়েছে, কিম্বা ভেবেছে। কিন্তু যা কিছু ভালো কথা তা'র মাথায় এসেছে, যা কিছু উত্তম সে চিন্তা করেছে, সমস্ত সমর্পণ করেছে সে প্রেমাস্পদের নামে। শিলভিয়া তাকে দেবতার মতো পূজা করেছে, আরতি করেছে। তা'র যে মৃত্যু ঘটেছে এ ভালোই হয়েছে; নৈলে শিলভিয়াকে মর্মান্তিকভাবে হতাশ হ'তে হোতো।

আন্দ্রে ভাবে, সে ছাড়া আরো অনেক মানুষ আছে যারা মানুষের মানস-মূর্তি সৃষ্টি করে। পার্থক্য এই, শিলভিয়া সেটা নিজের অজ্ঞাতসারেই করে। কিন্তু সত্যিই কি এর ভিত্তি কোথাও কিছু আছে? সত্যিই কি সেই এডলফ উইলম্যানের মধ্যে এই সব আশ্চর্য পদার্থগুলো ছিল, যেগুলো শিলভিয়া আপন স্মৃতি থেকে তা'র উপরে আরোপ করেছে? উইলম্যান যা হ'য়ে উঠতে পারতো, সেই মূর্তিটিকেই কি শিলভিয়া মনে মনে সৃষ্টি করেছে? কিম্বা, যদি বলা চলে, উইলম্যান কি নিজের শক্তিতেই শিলভিয়ার হৃদয়ের পবিত্র আসনটি পেতে বসেছিল? জীবনকে যে-মানুষ বিড়ম্বিত করেছে, প্রতারিত করেছে,—সেই মানুষের জীবন কি এমন দেবময় হ'য়ে উঠতে পারতো?

বাড়ী ফেরার পথেও অনেক বোঝা তাদের। শিলভিয়া দু'হাতে দুটো পুঁটলি নিল, আন্দ্রে নিল কাঁধে একটা ঝোলা। কিন্তু তখন অন্ধকার সরোবরে নেমে এসেছে এক ঝলক বাঁকা চাঁদের আলো! দূরের খামারগুলিকে মনে হচ্ছে যেন স্বপ্নলোকের আলোকিত গবাক্ষ!

দুষ্টামিভরা চক্ষে চেয়ে শিলভিয়া বললে, তাহলে কিছুতেই তুমি বলবে না, কোথায় চলেছ? সামনের শীতকালে কী করবে, তাও বলবে না, কেমন?

অনেক রকমের কাজই ত' ভালো লাগতে পারে!—আন্দ্রে বললে, তা ছাড়া কিছু একটা জুটে যাবেই।

তুমি বুঝি এমনি ক'রেই চিরকাল গড়িয়ে-গড়িয়ে বেড়াও? কোনোদিন এক জায়গায় স্থির হয়ে নিজের জন্য আশ্রয় বাঁধতে চাওনি?

কই না, ওটার চেহারা তেমন ক'রে কখনো চোখে পড়েনি!—এই ব'লে হাসতে হাসতে প্রসঙ্গটা সে নিজেই থামিয়ে দিল।

পথের ধারে এক জায়গায় এসে শিলভিয়া বললে, এখানে একটু ব'সে জিরিয়ে নিলে হয়।

দু'জনে বসলো। পুঁটলী দুটো শিলভিয়া হাঁটুর ওপর তুলে নিল। আন্দ্রে ঝোলাটা নামিয়ে রাখলো। কিছুক্ষণ ব'সে দু'জনে চন্দ্রালোকিত ঝাপসা সরোবরের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর এক সময়ে শিলভিয়া বললে, কি আশ্চর্য বলো ত, আজ ওই সরোবর আর ওই চাঁদকে যেমন দেখাচ্ছে—হাজার হাজার বছর ধ'রে ওদের অমনিই দেখায়—ওরা ওইভাবেই থাকবে আবহমান কাল পর্যন্ত। কিন্তু আমরা—আমরা থাকবো না!

হুম্—আন্দ্রে মাথা নত করলো! আজো সে এই অমৃতবাণীর উপলক্ষ্য মাত্র।

শিলভিয়া একটু হেসে আবার বললে, নিজের কথা বলতে পারি, আমার অমন দীর্ঘ পরমায়ুর দরকার নেই! ঝোপ-জঙ্গলে খরগোসের মতন থাকি, সময়টা কেবল খাবার যোগাড় করতেই কেটে যায়। তা'র মানে, একটা খরগোসও এর চেয়ে কিছু বেশী কাজ করে!

হুম্—আন্দ্রে বুঝলো বৈ কি। শিলভিয়া ভাবছে, সে যে স্ত্রীলোক, তা'র যে সন্তানাদির দরকার, সে যে আপন স্মৃতিটুকু ছাড়া আরো কিছুকে ভালোবাসতে সমর্থ!

আন্দ্রে বললে, আপনি প্রায়ই প্রশ্ন করেন আমি কি করবো। কিন্তু

আপনার নিজের সম্বন্ধে ? আপনি কি সমস্ত জীবন এই জঙ্গলের মেঠোঘরে কাটাবেন ?

শিলভিয়া বললে, কী করতে বলো তুমি আমাকে ? এখানে যত সব জঞ্জাল জড়ো ক'রে তুলছি, এই মাত্র। এর চেয়ে ভালো কী করতে পারতুম ? আমার বন্ধুবান্ধব আছে, তা'রা আপিসে-ইস্কুলে খাটে ; বছরের বেশীর ভাগ সময়ে তা'রা শেকল-বাঁধা। আমি অন্তত নিজের খুশিমতো চলতে পারি। দুঃখের বিষয় বৈ কি, আমার মতন মেয়ের চোখে কোনো আশা-ভরসা নেই, প্রত্যাশা নেই,—আমার কাছে আজও যা, কালও তাই। বছরের পর বছর চ'লে যায়—শুধু বুঝতে পারি বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছি। কিন্তু স্বপ্ন ঘোচেনা মন থেকে ; একজন অপরকে পাবার স্বপ্ন দেখে। খুব মজার কথা, নয় ? আমি কেই বা, কতটুকুই বা,—তবু এখানে ব'সে মজুরদের জন্য পরিকল্পনা করি, মানব সাধারণের জন্য নতুন সমাজের কথা ভাবি। আমার মনে হয়, তুমি অনেক সময়ে ভাবো, বুড়ি কুমারীরা ভারি মজার লোক। তা সত্যি !

আন্দ্রে বললে, আমরা যা ভাবি, যা অনুভব করি, তা'র মৃত্যু নেই। সেটা পুরুষানুক্রমিক।

আরে, আমার সেই মানুষটিও এই কথা বলতো যে ! হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ে তা'র কথা ! সত্যি কী যে আনন্দ হয় শুনলে !

আপন হৃদয়ের ধক্‌ধক্ শব্দ আন্দ্রে শুনতে পাচ্ছিল। বললে, তিনি কি ধর্মপরায়ণ ছিলেন ?

হ্যাঁ, তাঁর দিক থেকে ত' বটেই। এই ব'লে শিলভিয়া মাথা নত ক'রে দেখতে লাগলো 'আপন প্রাণের অন্তঃস্থল অবধি—কথাটা সত্য কিনা। পুনরায় বললে, হ্যাঁ, মানুষের আত্মার অনন্ত সম্ভাবনায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বরকে

আমরা লাভ করবো একদিন—এই হোলো স্বপ্ন। তিনি এই কথাই বলতেন।

আন্দ্রে লক্ষ্য করলো শিলভিয়ার নিমীলিত চক্ষু। সে যেন মৃত ব্যক্তিকে জীবনের মধ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান করছে। তা'র মৃদু কণ্ঠস্বর উভয়ের কথালাপকে সলজ্জ ঘনিষ্ঠতায় ভরিয়ে তুলেছে। সে পুনরায় বললে, এদিক দিয়ে দেখলে সমাজসেবাও মানুষের ধর্ম হ'য়ে ওঠে।

আর একবার আন্দ্রে অনুভব করলো, তার এই আদর্শ—যেটা শিলভিয়া এতকাল ধ'রে একটা ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করছে,—এটা যেন একটা ভিন্ন বস্তু, এটার ওপর তা'র নিজের আর কোনো কর্তৃত্ব নেই। সে যেন শিলভিয়ার প্রেমিকের পদতলে শিষ্যের মতো বসতে পারতো,—এইটুকুই সে কেবল বলতে পারে।

কতক্ষণ পরে শিলভিয়া পুনরায় বললে, অনেক সময়ে তা'র কথা নিয়ে বক্তৃতা দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস হয় না। সঙ্কটকালে যেন মূঢ় হ'য়ে যাই। আমি যা পারিনে তা তোমায় করতে বলা অবিশ্যি আমার পক্ষে খুবই সহজ ; তবে—

আন্দ্রে বললে, হয়ত এমন দিন আসতে পারে, আপনার কথা-মতো চলতেও পারি।

কী বললে? সত্যি বলছ?

হ্যাঁ?

আন্তরিকভাবে?

হ্যাঁ।

ভগবান, সেদিনটি এলে জানবো, আমার বেঁচে থাকা মিথ্যে হয়নি! ভেবে দেখো ত, সত্যি বলছ?

দু'জনে আবার উঠে ঝোলা-পুঁটলি নিয়ে চলতে থাকে। তা'রা মোড় ঘুরে চললো জঙ্গলের পথ দিয়ে, সেখানকার পথের সঙ্কেত দু'খানা চাকার দাগ ছাড়া আর কিছু ছিল না,—মাঝে মাঝে চাঁদের আলো আর গাছের ছায়া।

উৎফুল্ল মনে এলোমেলোভাবে শিলভিয়া বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব'লে যেতে থাকে; তা'র পাশে পাশে হেঁটে নিজের কল্পনার কথাও যোগ ক'রে দেওয়া—সে এক অত্যুগ্র আনন্দ। শান্ত চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় পথের কষ্ট অকিঞ্চিৎকর; ওদের পক্ষে কত সহজ—ওদের দু'জনের পক্ষে কত সহজ পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করা।

সহসা শিলভিয়া বললে, বলো তোমার জন্যে কী করতে পারি? দু'জন সঙ্গীহীন নারীর কাছে তুমি কত স্নেহশীল ছিলে!

আল্রে বললে, দয়া ক'রে একটি কাজ করবেন?

সত্যি? কী বলো ত?

ছাপানো সুর কেমন ক'রে পড়তে হয় আমাকে শেখান্।

সত্যিই কি আমাকে শেখাতে বলো? অবিশ্যি সেদিন রবিবারে গীর্জায় ব'সে শুনেছি, কী চমৎকার তোমার গলা! যদি ধৈর্য থাকে তোমার, সানন্দে আমি শেখাবো।

অবিস্মরণীয় কয়েকদিনের সন্ধ্যা। কাজকর্মের পর ঘরে ঢোকার আগে আল্রে মুখ-হাত-পা ধোয়, চুল আঁচড়ায়। মুদ্রিত সুরের খাতাটি সামনে রেখে শিলভিয়া পিয়ানোয় বসে, আল্রে পিছনে দাঁড়িয়ে সেইদিকে তাকায়। দু'বার ক'রে শিলভিয়ার দরকার হয় না তা'কে কিছু বোঝাবার। শিলভিয়া বিস্মিত

হয় তা'র দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য ক'রে। সত্যিই কি আন্দ্রে আগে কিছু জানতো না? খুব অল্পসময়ের মধ্যেই আন্দ্রে স্বরের দিকে তাকিয়েই গান ধরতে পারতো, শিলভিয়া পিয়ানো বাজিয়ে যেতো—মাঝে মাঝে শুধু স্বরের পদ্ধতির ইঙ্গিত ক'রে চলতো। আন্দ্রের দীর্ঘ কণ্ঠস্বর দুঃসাহসিকতায় ভরে উঠতো, এমন ছাত্র পেয়ে আনন্দে সে অধীর হোতো, এবং শিলভিয়াকে এত সান্নিধ্যে পেয়ে আন্দ্রেও যেন অভিভূত হ'য়ে পড়তো। কখনো কখনো একত্রে দু'জনেই ধরতো স্বর, এবং সেই সময় আবার তা'র মনে হোতো, তা'রা উড়ে চলেছে নীলোজ্জ্বল মহাকাশের শূন্যপথ দিয়ে। সেই রাজহংস—সেই রাজহংস ঘুমিয়ে রয়েছে সকলের সত্তার মধ্যে,—সে যেন জেগে ওঠে।

দু'জনে গান গাইতে গাইতে আন্দ্রের সকল প্রাণ যেন অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে, যেন শুচিশুদ্ধ হ'য়ে আসে, পৃথিবী 'অপরূপ' মনে হয়। যদি সে আরো—আরো কাছে আসতে পারতো, যদি সে কোলে তুলে নিতে পারতো শিলভিয়াকে,—সে পেতো ছোট্ট একটি সংসার, মধুর শান্তি! কিন্তু সে কি সত্যিই অসম্ভব?

মাঠে কাজ করতে করতে আন্দ্রে সহসা থেমে মাটির দিকে একদৃষ্টে তাকালো। মৃত্তিকার গভীর তলদেশে যেন ভাষা আছে, যেন আর্ত যন্ত্রণায় কেউ এর নীচের তলায় অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে চলেছে। এর আগেও যেন অনেকবার আন্দ্রে মাটির তলাকার আর্তকণ্ঠ উপলব্ধি করছে। তুমি কোথায় ঠিক কেমন ভাবে আছ, একথা জানবার আগেই হয়ত মাটির তলা থেকে সে মাথা তুলে আত্মপ্রকাশ করতে পারে,—বুঝেছ? কিন্তু কী ওটা? অনিশ্চয়তা? সাবধান, নিজেকে পাহারা দিও! আন্দ্রে যে-ভাবে আছে এই

ভাবে দীর্ঘকাল তা'র থাকা সহ্য হবে কিনা,—এই সামান্য সংশয় দেখা দিলেই বিপদ। সমস্ত জীবনটা ধ'রে এখানে থাকার বাসনা তা'র প্রবল; কিন্তু এ সমস্ত ত্যাগ ক'রে নিরুদ্দেশে পালিয়ে যাবার বাসনা,—হ্যাঁ, মাটির অতল তল থেকে যেন সেইটিই বার বার শোনা যায়।

পাগল আর কি! এই ত, আজ সন্ধ্যাতেই তা'রা আবার দু'জনে গান গাইবে।

পরদিন মাঠে সে কাজ করছিল অন্যমনস্ক; হাতে তা'র এক আটি শস্য। সহসা নিজের ছায়ার প্রতি সে তাকালো। ছায়া কেন? না, কিছু না! ছায়াটা যেন নিজের গতিবিধিরই বিকৃত অনুকরণ। যেন পাশেই আর একটা মানুষ! কিন্তু আন্দ্রের কাছে সেই ছায়া দেখতে দেখতে কায়া হ'য়ে উঠে। ছায়ার কণ্ঠে আওয়াজ ফোটে, তা'র উদ্দেশ্য বোঝা যায়।

ছায়া বলে, হ্যাঁ, সেই ব্যাঙ্কের পাস বইখানা—আর, টাকার শুদ পাওয়া মানেই ত' অবাধ স্বাধীনতা! অতএব ওখানা লুকিয়ে রেখো। সাম্যবাদের আদর্শ মতো কাজ ক'রে যাও—সেই ভালো, সেইটিই মঙ্গল! কিন্তু ভিতরে ভিতরে গোপনে তাদের ঠকিয়ে চলো! নিশ্চিত থেকো, আদর্শের প্রতি তোমার বিশ্বাস যত মহৎ আর পবিত্র হ'তে থাকবে, ততই সেই আদর্শের প্রতি চোখ ঠেরে চলবার বাসনা বাড়বে তোমার। এটা ওটার উল্টো পিঠ—এটা ওটার ওজনটা ঠিক সমান সমান রেখে চলে—বুঝেছ?

পাগল কোথাকার! আন্দ্রে আবার কাজে মন দেয়। হাতের ফলাখানা দিয়ে অন্যমনস্কভাবে সে মাটিতে একটা গর্ত খোঁড়ে। গর্তের মধ্যে সেটা ঢুকিয়ে দেয়, শস্যের আটিটা তা'র মধ্যে ঢোকায়। কাজ করতে করতে

তা'র কেমন একটা উত্তেজনা বাড়তে থাকে—মাটির তলা থেকে সেই ভূতটা যেন মাথা তুলে নিজের মুখখানা প্রকাশ করে। বিশ্বাসঘাতকতা! প্রতারণার চেষ্টা! ওটা যে সেই ভূতের মুখবিকার তা নয়,—ওটা যেন দুরন্ত ঝটিকা! যে-লোকটা ভীষণ রৌদ্রে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে,—ওটা এসে দাঁড়ায় তা'র কাছে যেন স্বাভাবিক তৃষ্ণার অনস্বীকার্য দাবী নিয়ে। ওকে তাড়াতে পারো না,—ওর দাবী হয়ত রাক্ষসের মতো,—কিন্তু সত্য, নির্ভুল।

শোনো আন্দ্রে—ছায়া বলে, যারা মাঝারি দলের আদর্শপন্থী তা'রা মহত্তম আদর্শকে ঠকাবার জন্যে সরল বিশ্বাসে মিছে কথা বলে। তোমার তা'তে দরকার নেই। সত্যের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াও। সকল মানুষকে ভালোবাসা খুবই ভালো, কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় তাদের গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া যেন কেমন কুটীল আনন্দ! যাও, নগরের দিকে যাও। ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে একজন আন্দোলনকারী হ'য়ে ওঠো, কিন্তু নিজের টাকাগুলো নিয়ে তেজারতি কা'রবার করো, বিক্রি-বাঁধার দোকান খোলো, হিসেব ক'রে শুদ নাও। তা'র মানে বেশ মোটা উঁচু হারে শুদ,—কথাটা ভেবে দেখো।

আন্দ্রে মাথা তুলে এদিক ওদিক তাকায়। কিছু বুঝতে না পেরে দেখে আজকের দিনটি কী সুন্দর। দক্ষিণ আকাশের দিকে ওড়বার জন্ম একদল পাখী জড়ো হচ্ছে। পাহাড়ী গাছের ফলগুলি সবুজ-হরিদ্রাভ পাতার ভিতরে ভিতরে রক্তিম ফলকে দেখা দিচ্ছে। শরতের আকাশ কী অপরূপ নীলপ্রবাহে ভরা, রঙের কী তরঙ্গ ছুটেছে দিকদিগন্তে।

ছায়া বলে, শ্রমিক নেতারা, যারা সম্পত্তিলোপের জন্ম বক্তৃতা করে, যারা বলে জনসাধারণের জন্যে সব কিছু,—তা'রা নিজে কি সত্যাই সর্বহারা? যারা

বড়লোকদের গালি দেয়, তা'রা কি ঠিক বড়লোকদের মতন জীবন যাপন করার আয়োজন করে না? পদদলিতের দল যখন জেগে ওঠে, তখন তা'রা কী করে? তা'রা অপরকে মাড়িয়ে চ'লে যায়। তাদের বিচার করো না, এই ছায়াটাই হ'লো তাদের মুক্তিবাসনার সঙ্কেত। তুমি নিজেকে চেনো, তুমি পরের জন্ত বাঁচা আর পরের জন্ত পরিশ্রম করার ধর্মপ্রচার করবার চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ো। কিন্তু আর কিছুর জন্য কি কামনা করবার নেই তোমার? নিজের সঙ্গে নিজে প্রতারণা করা, নিজেকে ঠকানো?

আন্দ্রে চারিদিকে তাকিয়ে যেন পালাবার চেষ্টা করে। অথচ আশঙ্কার কথা এই যে, সেই দুষ্ট কণ্ঠস্বরকে সে যে ঠিক ঘৃণাও করছে, তাও নয়। ওই স্বরটা আবার শোনবার জন্ত তা'র কেমন অদ্ভুত ইচ্ছা জাগে। তা'র পিপাসা যেন ক'মে আসে। পালাও আন্দ্রে, পালাও। ছায়াটা যাবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে। তুমি একটা সস্নেহ দয়াবত্তার আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারো, কিন্তু তোমার সেই মৌখিক ঘৃণা ভ্রাতৃপ্রেমে ভ'রে উঠবে। শিলভিয়ার পায়ের কাছে তুমি লুটিয়ে পড়ো,—দেখবে ছায়াটাও পড়েছে তা'র পায়ের কাছে।

সেদিন থেকে গানের পাঠ নিতে গেলেই আন্দ্রে আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু গান একবার আরম্ভ হ'য়ে গেলে, তা'র গানে অতলস্পর্শ আবেগ এসে পৌঁছয়! হে রাজহংস—দূরে, দূরে উ'ড়ে চ'লে যাও।

কিন্তু সকাল বেলা বিছানা ছেড়ে উঠলেই ওই ছায়াটা তাকে পেয়ে বসে, তা'র পিছু পিছু যায়। ক্রমশঃ গা-ছমছমে অবস্থার ভিতর দিয়ে ছায়াটা যেন প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হয়। যেন হ'য়ে ওঠে একটা স্থূলদেহ সুদখোর মহাজন,—

শতকরা শুদের হিসাব ছাড়া তা'র মুখে আর অন্য কথা নেই। কেবল হাত কচলায় আর বলে, আমায় দেখে খুশী হও, আন্দ্রে। শুনলুম, তুমি উড়ে চলেছ শূন্যে, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। কিন্তু পৃথিবীতে কোথাও নোঙর না ফেললে দাঁড়াবে কেমন ক'রে? সুতরাং একটা আদর্শ ধ'রে চলো,—আদর্শটা যত মহৎ হয় ততই ভালো। ভয় নেই, আমি তোমার পাশে পাশে থাকবো।

আন্দ্রে মুখ ফিরিয়ে নেয়; একটা সজী ছিঁড়ে অন্যমনস্কে চিবোতে থাকে। যে-মানুষটা সৌন্দর্য্য আর মহত্বে বিশ্বাসী, আলোক সত্তায় আস্থাবান,- শিলভিয়া তাকে সৃষ্টি করেছে। সে এখন যা—সেটা শিলভিয়ার তৈরী। অথচ সে যা হয়ে উঠতে চায়, সে যা হবে—সেটাও সে নিজে, সে আন্দ্রে।

সায়াহ্নকালে চলে সে বাসার দিকে ধীরে ধীরে। শক্ত সমর্থ দীর্ঘকায় একজন মজুর,—মাথায় টুপি, হাতের জামা গোটানো। হাতে একটা মেয়েলি জোব্বা, গাঁইতিখানা নিয়ে চলেছে ছড়ির মতো দুলিয়ে। সূর্যাস্তের পর তা'র নিজের কালো ছায়াটাও ঘাসের উপর দিয়ে ন'ড়ে চলেছে।

রান্নাঘরে গিয়ে খেতে ব'সে দেখে, টেবিলের ধারে শিলভিয়া কী যেন বুনছে। আজ আবার সে পরেছে আলখাল্লার মতো একটা পোষাক, কিন্তু মাথাটি ঢাকা নয়। আজ আবার তাকে ধর্ম সেবিকার মতো মনে হয়। মুখের একটা পাশ তা'র চোখে পড়ে, শিলভিয়ার মাথায় এক-আধগাছা পাকা চুল।

হাসিমুখে চেয়ে শিলভিয়া বলে, ও আবার কি? আজ বুঝি এক সঙ্গে বাজনা হবে রাত্রে?

আন্দ্রে বলে, কিন্তু আজ আমি ভারি ক্লান্ত, ভাবছি এখনি গিয়ে শুয়ে পড়বো।

জানলার বাইরে শিলভিয়া তাকায়। বলে, এটা কিন্তু ভারি অন্যায়, আন্দ্রে, তোমাকে ওই বাইরের গোলাঘরে গিয়ে শুতে হয়। আসছে বছর এই উঁচু জায়গাটায় একখানা ঘর তুলে দেবার ইচ্ছে আছে।

আন্দ্রে উঠে পড়ে। দরজার কাছে গিয়ে নিমেষের জন্য থমকে শিলভিয়ার দিকে সে তাকায়। বলে, আচ্ছা, আজ চলি।

এসো। খুব ঘুমোওগে,—আবার কালকে।

পরদিন ভোর বেলায় হ্যানসাইন ছুটতে ছুটতে বাড়ীর ভিতর এসে দরজা বন্ধ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো, ওই নাও, ওই ছ্যাখোগে যাও···পাখী উড়ে পালিয়েছে।

কি? কে? কি হয়েছে?

মাথা আর মুণ্ডু! যাও, নিজের চোখেই দেখে এসোগে, সত্যি বলেছিলুম কিনা—

দয়া ক'রে বলো, কি—হয়েছে কি?

লোকটা পালিয়েছে, আর কি! ঘর-দোর, মাঠ-ঘাট—সব খুঁজে এলুম, কোথাও নেই। ঝোলা পুঁটলী সব নিয়ে স'রে পড়েছে। তখন কী বলেছিলুম তোমাকে? অনেক আগেই ওকে আমাদের তাড়ানো উচিৎ ছিল।

কিন্তু একথা মনে আছে, হ্যানসাইন—আন্দ্রের কথা যদি বলো, এখনও তা'র সব মাইনে চুকিয়ে দেওয়া হয়নি?

হ্যানসাইনের পিছনে পিছনে শিলভিয়া এলো বাড়ীর বাইরে। হ্যানসাইন বললে মাইনে! বাজি রেখে বলতে পারি, নিজের মাইনে নিজেই সে ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে গেছে।

শিলভিয়া এদিক ওদিক ছুটোছুটি ক'রে ডাকে—আন্দ্রে, আন্দ্রে শুনছ?—ডাকতে ডাকতে গোলাঘরে গিয়ে সে ঢুকলো। দেখলো, হ্যাঁ, ঝোলাটা তা'র সঙ্গেই গেছে। কী অদ্ভুত, অসাধারণ লোক! যাবার আগে বিদায় নিয়ে যায়নি। নিশ্চয়ই ফিরবে একদিন, আবার একদিন আসবে···আসবে বৈ কি!

হ্যানসাইন বললে, ডাকাডাকি তুমি করতে পারো। কিন্তু ব'লে রাখছি, যদি খুঁজে তাকে বের করতে পারো, আমি তোমাকে তোমার পাওনা পুরস্কার দেবো। শোনো, হ্যাঁ, আমাদের টাকাকড়ি গুণে দেখিগে চলো।—এই ব'লে সে ভিতর দিকে ছুটলো। কি-কি চুরি ক'রে নিয়ে গেল দেখা দরকার।

শিলভিয়া শান্ত মৃদুপদে ভিতরে এলো। মুখে তা'র রক্তের চিহ্নও নেই; কিছুই সে বুঝতে পারলো না। হ্যানসাইন ওদিক থেকে বললে, যাক্, টাকা-কড়ি কিছু নিতে পারেনি! তাহ'লে ওর কিসের ওপর লোভ হোলো?—সহসা সে চীৎকার ক'রে উঠলো, ঘোড়াটা!—বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে এলো সে উঠোনে, গোয়ালঘরের পাশে গেল দৌড়ে।—আঃ যাক্, ঘোড়াটা বাঁধা রয়েছে, নতুন ঘাস চিবোচ্ছে। হ্যানসাইন যেন বিশ্বাস করতে পারলোনা নিজের চক্ষুকে—ঘোড়াটার কাছে গিয়ে সে তা'র পিঠে হাত বোলালো। হ্যাঁ, আছে বৈ কি। ঘোড়াটা সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে রয়েছে বটে! লোকটা যেন যাবার সময় বেশ গুছিয়ে ঘোড়াটা তুলে ওখানে যত্ন ক'রে রেখে গেছে।

কিন্তু এর পর কিছুকাল পর্যন্ত শিলভিয়া বিবর্ণ বিষণ্ণ নীরব-নতমুখে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো,—যেন কিছু একটা রহস্যের দিকে তা'র চোখ দুটি নিমেষ-নিহত হ'য়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে সে যখন ঘুরতে ঘুরতে তা'র

গৃহাঙ্গন থেকে মাঠের বহুদূরে চ'লে যায়—তখন যেন কেউ শুনতে না পায়—এই ভাবে অদূরে অরণ্যের দিকে তাকিয়ে তা'র ভিতর থেকে আর্ত আহ্বান জেগে ওঠে। সে ডাকে, আন্দ্রে, কোথায় তুমি? কেন চ'লে গেলে এমন ক'রে?

পরিচ্ছেদ—৩৭

শহরের ধারে নদীর ওপারে একখানা পাকাবাড়ীতে একটি নতুন ধার-বিক্রির দোকান খুলেছে। সম্প্রতি এ তল্লাটে মজুরদের একটা ধর্মঘটের ফলে সেই দোকানের ধারে সারবন্দী হয়ে দাঁড়ায় একদল রোগা আর জীর্ণবাসা নরনারী। যদি কখনো কোনো একটা লোক ভীড় ঠেলে ঠুলে চাপা নোংরা ঘরটার মধ্যে ঢুকতে পারে—দেখা যায় ভিতরে লোকগুলো যেন বাক্সবন্দী চুনো মাছের মতো কিলবিল করছে! চতুর্দিকে দারিদ্র্যের দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছে।

জানলার ভিতর দিকে একটা কুব্জদেহ লোক - নাকটা রাঙা, চোখ দুটো কুটীল—ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতস্তত। বিড়ালের মতো বড় বড় কালো গোঁফ-দাড়ি; রাঙা টাকপড়া মাথাটা গরমে আর গুমোটে কুঞ্চিত। গায়ে একটা আলগা ঝোলা-ঝালা কালো কোট,—বেশ বোঝা যায় কোটটা তা'র নিজের জন্য তৈরী নয়, ওটা কেউ বাঁধা রেখেছিল—আর ছাড়াতে পারেনি। লোকটা যখন জানলার সামনে ফিরে আসে, দেখা যায়,—একটা ভারি সোনার চেন আর চাকতি ঝুলছে তা'র পকেটে,—ওটাও তাই,—বাঁধা রাখা সামগ্রী, ছাড়ানো যায়নি। লোকটার লম্বা লম্বা নোংরা আঙুলে লাল-নীল পাথর বসানো কয়েকটা আংটি—সেগুলো বাঁধা রাখার জিনিস। একটা

রংচটা গলাবন্ধ—আগে ওর রংটা ছিল কালো—তাতে একটা দামী পিন্ গোঁজা - নিশ্চয় ওটাও ওর কাছে বাঁধা রেখেছিল কেউ। ওর গায়ের জামা, ওর হাতের রুমাল,—সমস্তই মনে হয় ওই শ্রেণীর সামগ্রী। লোকটার পেশা এত কদর্য কিন্তু পোষাক কী ঝলমলে!

বিবর্ণ মুখে একটি স্ত্রীলোক কেঁদে উঠলো, ওমা, এমন চমৎকার পশমীর কোট বাঁধা রেখে মাত্র পাঁচ টাকা?

লোকটা কোনো কথা বলতে চায় না,—কেবল আংটি পরা হাতখানায় জামাটা তুলে নিয়ে ওর মূল্য নির্ধারণ করে মাত্র। মুখে বলে, আচ্ছা, গোটা দশেক টাকা পেতে পারো। তা'র বেশী নয়।

কোটটা হাতে নিয়ে স্ত্রীলোকটি রাগে আগুন হ'য়ে গরগর করে।

সে লোকটা অন্যদিকে ঘুরে অগ্নিমূর্তির মতো বলে, দশ টাকা—ওই আংটিটার জন্যে!—এই ব'লে ফিরে সে দুটো পিলসুজ নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে বলে, না গো না, এটা রূপোর নয়। এ রেখে আমি কিছু দিতে পারবো না।

এদিক ওদিক থেকে সম্মিলিত ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনা যায়। গালি আর চোখ-রাঙানোর সঙ্গে কাকুতি-মিনতি আর কান্নাকাটি মিশে থাকে। কিন্তু মহাজন ব্যক্তিটি নির্বিকার। কোনো একটা খদ্দেরের সঙ্গে বোঝাপড়া হবামাত্র সে গিয়ে ডেস্কের সামনে মোটা খাতা খুলে বসে। খদ্দেরটির নাম লেখে, টাকার পরিমাণটা জমা ক'রে নেয়—তার পাশে চুক্তির চিহ্ন এমন একটা বসিয়ে রাখে, যেটা সে কেবল নিজেই বোঝে। ইতিমধ্যে একবার যারা রাগের চোট দেখিয়ে বেরিয়ে চ'লে গিয়েছিল, তা'রা সবিনয়ে নতমুখে আবার ফিরে আসে, হাত পেতে দাঁড়ায়, হাত তোলা সামান্য মুদ্রা ক'টিই নিতে বাধ্য

হয়। টাকার মানে আসলে টাকা; দয়া মায়া বিবেচনা ওসব থাকলে, টাকার কারবার চলেনা; টাকার কাছে কিছুই না। বাইরে তখন সারবন্দী জনতার মধ্যে অস্থিরতা ঘন হয়ে ওঠে। তা'রা ভয় দেখিয়ে চেঁচামেচি ক'রে জানায়, এখনি ভিতরে ঢুকতে না দিলে দরজা ভেঙে তা'রা দোকান লুঠ করবে। এমন সময় সহসা মহাজনটি নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব'লে দেয়, ব্যস, সময় হ'য়ে গেছে, আর নয়। আপনারা আজকের মতন স'রে পড়ুন, দোকান বন্ধ করবো।

ঘোষণার ফলে আরো চেঁচামেচি, কান্নাকাটি, আর হাতের ঘুষি পাকানো। কিন্তু দোকানের ভারি দুটো দরজা একত্রে বুজে যায়,—এবং লোকটা নিজের পকেটে চাবির গোছা রেখে জনতার দিকে ফিরে বলে, যদি এখনও স'রে না যাও তোমরা, তাহলে কাল আমি দোকান খুলবো না।

কথাটা মন্ত্রের মতো কাজ করে। জনতার আর সাহসে কুলোয় না। গালমন্দ, বকাবকি, দাঁত কিড়ি-মিড়ি করতে করতেও চ'লে যায়। তখন মহাজনটি বাড়ীর দরজা বন্ধ ক'রে, খিল ও খোঁটা লাগিয়ে, জানলাগুলো আটকে চ'লে যায়।

ইস্, কী নোংরা সমস্তটা! গ্যাসের আলোটা জ্বালিয়ে সে চারিদিক তাকায়। এতক্ষণে সে একা!—চারিদিকে জীর্ণ বহুব্যবহৃত পোষাকের গন্ধ,—দারিদ্র্যের দুর্গন্ধই এই। এদিক-ওদিক সে পায়চারি ক'রে বেড়ায়,—এক সময় সে অনুভব করে, মোটা লভ্যাংশটারও এইরূপ দুর্গন্ধ। পশমী কোটটা,—হ্যাঁ, যেটার জন্য পাঁচ টাকা সে দিল, ওটা আর ছাড়াবে না এ জানা কথা। সে জানে তা'র মক্কেলদের! কিন্তু ওটা নিলামে বেচলে পাওয়া যাবে পঞ্চাশ টাকা। এর নাম কারবার, এরই ডিভিডেন্ট! পায়চারি করতে করতে সে হাত কচলায়। অতঃপর সে সিন্দুকের ডালা

সরিয়ে টানাটা খোলে। আংটি, ব্রুচ, ব্রেসলেট, সোনার কাঁটা,—আরো কত কি! চোখের সামনে সোনা আর জড়োয়া ঝলমল করে। ওগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে তা'র চোখ দুটো কেমন যেন তীব্র বিহ্বল আনন্দে বন্ধ হ'য়ে আসে। তারপর আবার সিন্দুক বন্ধ ক'রে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঁ, ঠিক—কৃপণের বাস ঠিক এইরকম পরিবেশের মধ্যেই মানায়। হ্যাঁ, দাতব্য ভালো জিনিস, কিন্তু কারবার বস্তুটাও উত্তম। যে লোকগুলো এবাড়ীর দরজায় এসে টাকার জন্য হাঙ্গামা করে, তা'রা মদ খায়; স্ত্রীলোকগুলো লক্ষ্মীছাড়া। তবু আমি ওদের সাহায্য ক'রে থাকি। যদি আমি না থাকতুম তবে ক'আনা পয়সার জন্য তা'রা কা'র দরজায় যেতো? ওদের জন্য অনেক করি; ওদের যা পাওয়া উচিৎ তা'র চেয়ে বেশী দিই। যদি এত হিসেব ক'রে আমি না চলতুম, তবে বুড়ো বয়সের জন্য কিছুই রাখতে পারতুম না।

সে মাথা নীচু করে। অবশ্য একটি স্ত্রীলোক কোথাও আছে যে বাঁধা-কপির চাষ করে, ধর্মসঙ্গীত গায়, এবং মনে করে পৃথিবীর সবটাই বুঝি আকাশের মতো উদার। কিন্তু ব্যবসার সে কী জানে? একবার তা'র সঙ্গে অবশ্য আমি নিজের মতিবুদ্ধি মিলিয়েছিলুম বটে, তবে এখানে চ'লে এসে বেঁচেছি—যা দু'জনে স্থির করেছিলুম, তা'র ঠিক বিপরীত কাজে নেমেছি। জানি এটা প্রতিক্রিয়া। সেখানে ছিল অত্যন্ত ভদ্ররুচি আর ভব্যতা; দুধ আর মধু খেয়ে গলা কিটকিট করতো। একটু নুন-ঝালের দরকার আছে বৈ কি। প্রতিক্রিয়া! প্রতিবিম্ব!

এটা অবশ্য জেনে রাখা ভালো, সে নারীটি জীবিত রয়েছে। এতে একটু স্বস্তি পাওয়া যায় বৈ কি অর্থাৎ কামনা করবার কিছু আছে, এই যা ধরো,

আকাশের তারকাকে যদি আপন মনে করা যায়। কিন্তু ঈশ্বর হ'লেন মস্তবড় কারবারী,—তিনি এত উঁচুতে তারকাদের রেখে দিয়েছেন যে, চোখে দেখা যাবে বটে, কিন্তু স্পর্শ করা যাবে না।

আমি কি সত্যিই নোংরামি আর ঘিঞ্জির মধ্যে থাকি? তা হ'তে পারে, —তবে এখান থেকেই কামনা করবো শুচিতা—আলো আর ধর্মবিশ্বাসকে। এইটিই ত' চমৎকার!

লোকটি পাশের ঘরে ঢুকে পোষাক পরিবর্তন করে। হ্যাঁ, পরিবর্তনের জন্যই ত! যখন সত্যিই পোষাক বদলে সে আর একটা বিভিন্ন মানুষ হ'য়ে দাঁড়ালো, তা'র বিবেকের কণ্ঠ যেন উচ্চ হ'তে উচ্চতর গ্রামে উঠলো। সুদ-খোরটার প্রতি যেন ঘৃণা বৃদ্ধি হ'তে লাগলো—যেন একটির পর একটি খোলস আর লক্ষণ ছাড়িয়ে ফেলে সে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। ক্রমশ সুদখোর কঞ্জুসটা হ'য়ে উঠলো যেন একটা দানব—যেন একজন আর একজনকে হত্যা করার উদ্যোগী।

একখানা ঘষা আয়নার সামনে এসে সে দাঁড়ালো—পরিষ্কার দাড়ি-গোঁফ কামানো তা'র, সদ্য স্নাত, সান্ধ্য ভ্রমণের পোষাক পরা, পায়ে নধর চামড়ার জুতো। মাথায় দিল ধূসরবর্ণের টুপি, হাতে একটা অল্প শীতের উপযোগী ওভার কোট ঝোলানো, দুই হাতে দস্তানা, এবং একটি রূপো-বাঁধানো ছড়ি। ওর নাম ভয়লা! ও একজন আধুনিক শ্রমিক নেতা, একজন সাম্যবাদী, ব্যক্তিগত সম্পত্তিবাদের প্রতি তা'র প্রবল ঘৃণা। কোন একটি জনপ্রতিষ্ঠানে সে চলেছে ধর্মঘটীদের উদ্দেশে একটি বক্তৃতা করার জন্য!

যে-পোষাকগুলি সে ছেড়ে ফেলেছে এইমাত্র, সেই দিকে তা'র চোখ পড়লো। হ্যাঁ, ওই যে ছায়াটা! তা হোক, যে-বাঁকা কৌতুকটা জমে ওঠে. সেটা 'শরীরের

মধ্যে না রাখাই ভালো। মাঝে মাঝে এক সময়ে ওটাকে দানা বাঁধতে দিয়ে দেখা দরকার, ওর কতদূর দৌড়। নৈলে নিজের চেহারাটা হ'য়ে ওঠে আধা-ভালো আধা-মন্দ আধা-কটু আধা-উজ্জ্বল, কিম্বা আধা-রহস্যময় ব্যক্তি! না, তা'র চেয়ে শয়তানের হাতে কিছুক্ষণের জন্য রাশ ছেড়ে দাও। তারপর অন্যান্য জীবের মতন তুমিও তা'র হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

ছায়া, আর কিছুকাল অপেক্ষা করো,—তারপর দু'জনে মিলে যা হোক একটা বোঝাপড়া করে নেবো। লোকটা একটি চুরুট ধরালো, তারপর খিড়কির পথ দিয়ে নিজেকে বা'র ক'রে নিয়ে গেল।

ওই জঘন্য মহাজনী দোকানটা ছাড়িয়ে যতদূর সে যায়, শুদখোর ব্যক্তিটাও যেন ছায়ার মতো ক্রমশঃ অস্পষ্ট হ'য়ে আসে। এমন একটা জগতে তা'র বাসা-বাঁধা যেখানে কেবল খেয়াল খুশি, নানাবিধ মতলব, বাঁধাবুলি. বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা—এরই মধ্যে তা'র চলাফেরা। ইদানাং তা'র ডাক-নাম হোলো মিঃ আরেনফেল্ট—সে একজন শ্রমিক নেতা, ধনিক সমাজে ঘৃণিত, বুর্জোয়া সংবাদপত্রে নিন্দিত। কিন্তু সহস্র সহস্র শ্রমিক তা'কে প্রাণভরা অভি-নন্দনে ভূষিত করে। তা'র মতো শ্রমিকদলের মুখপাত্র দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

শ্রমিকদলের সাধারণ সভ্যের পদ থেকে নানাবিধ সুযোগের ভিতর দিয়ে সে অতি দ্রুত উচ্চ আসনে উঠেছে। প্রথম. সে সোজাসুজি হিসেবী লোক, তা ছাড়া ধনী ব্যক্তি ব'লে সে নিজের পরিচয় দেয়। নানা স্থানে কানাকানিও শোনা যায়, সে নাকি কোনো বিদেশী অভিজাত পরিবারের উত্তরাধিকারী। এ কি তা'র পক্ষে ভ্রান্তি? মোটেই না। অভিজাত শ্রেণী এবং ধনবাদকে গালাগালি দেবার জন্য যে সব লোককে দাঁড় করানো হয়েছিল, তাদের দল এতই ভারি হয়ে উঠেছিল যে, উচ্চশ্রেণীর লোকেরা স্বেচ্ছায় নিম্নশ্রেণীর দলে

এসে ভিড়লো। তা'কে সবাই ধনীরূপে দেখতে চাইল,—সে যেন আরামে আনন্দে গা ভাসিয়ে থাকে। ও যখন বুকে হাত রেখেবলে, আমরা সর্বহারা শ্রমিক সাধারণ,—ওরা তখন সব কিছু সত্ত্বেও ওকে বিশ্বাস করে। ওরা সবাই ঠিক জানে, নিজেদের দলের লোক ছাড়া ধনী সমাজকে মুখের মতন গালি দেবার আর কেউ নেই। সুতরাং শ্রমিক সাধারণ তাদের মুখপাত্রকে এই কারণেই সুখ্যাতি করতে থাকে। তা'রা বলে, ওই যে, ওই শোনো। ও জানে, ও আমাদের সব কিছু জানে। ওই তোলো মানুষ!

হ্যাঁ, এই কথাই সে বলতে চায়। আসল কথা, ছায়াটা দুলছে তা'র সামনে, সেই যোগাচ্ছে শক্তি। সেই যেন সাহস দিচ্ছে, যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানকার মাটি শক্ত মনে হচ্ছে ওই ছায়াটারই ভরসায়। নিজের বক্তৃতার ভিতর দিয়ে সে বহু দূর দূরান্তর অবধি শূন্য অনির্দিষ্ট লোকে বিচরণ ক'রে আসতে পারে—আর, সেটাকে সে ভরিয়ে তোলে কেমন একটা সগৌরব ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন-চ্ছায়ায়। বক্তৃতা করতে করতে তা'র যেন আগল খুলে যায়, আর পাশ থেকে সেই ছায়ামূর্তিটা যেন বলতে থাকে, বেশ, ভাই বেশ। ব'লে যাও, কোনো ভয় নেই। আমি ঠিক সময়ে তোমাকে বাস্তবলোকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবো!

কিন্তু আন্দ্রে, এর শেষ কোথায়? শিলভিয়া কি তোমার বক্তৃতা পড়ে? এই সব কথাগুলোই কি শিলভিয়ার কথা? তোমার প্রাণের মধ্যে একদা এই সব চিন্তাধারারই কি উদ্‌গম হয়েছিল?

মাঝখানে সহসা সে বক্তৃতা থামায়, কিন্তু পথের লোকারণ্য তাকে কিছুতেই থামতে দেয় না। মনে মনে সে বলে, না, এসব তা'র কথাগুলোর মতন নয়! তোমার ভিতর থেকে মহৎ বৃত্তি বেরিয়ে যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, তুমি কি তখনও মন্দের দিকে পা বাড়িয়ে দাও, মন্দ মৎলব আঁটো?

বক্তৃতাস্থলে সে যখন এসে পৌছয়, তখন সে বড় হল্-এ সহসা এসে ঢোকে না—পাশের নিরিবিলি কক্ষে প্রবেশ ক'রে একখানা চেয়ারে ব'সে পড়ে। সোনা বাঁধানো নাক টেপা চশমা বা'র ক'রে আপন মনে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

আন্দ্রে, তুমি কি প্রকৃত সেই সমাজ ব্যবস্থার কথা বলছ, যেখানে সব মানুষ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে? না, তোমার ভুল! তোমার বক্তৃতায় পাওয়া যায় শ্রেণী সংগ্রাম, বিপ্লব, ক্ষমতার দাবি! তুমি আর তোমার সহকর্মীরা যেদিন ক্ষমতালাভ করবে, সেদিন কি তোমরা ভ্রাতৃত্বের নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করবে? না! তোমার এসব ফাঁকা বস্তাপচা বুলি! আমরা সেদিন ধন-লুণ্ঠন করবো,—হ্যাঁ, এ ছাড়া কিছু না। যাদের কাছে তুমি এই সব বক্তৃতা দিচ্ছ তাদের মন, বুদ্ধি, চিন্তাধারা—এগুলোকে উন্নতস্তরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছ কি? না, তাদের শেখাচ্ছ শুধু ঘৃণা করতে! তোমার আন্দোলন কি সেই পথে পরিচালিত করছ, যে পথে গেলে মানব-সাধারণের জীবন সুন্দর হবে, পরিপূর্ণ বিকশিত হবে? না—আপাতত আমরা চাইছি যাদের সঙ্গে আমাদের মতের আর পথের মিল নেই, তাদের প্রত্যেককে হত্যা করতে! কিন্তু তারপর? তারপর—আমরা ক্ষমতাবান হবো, আর সেই ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবো শয়তানের স্বপক্ষে।

আন্দ্রে মাথা তুললো, তুলে দেখলো তা'র সামনে দাঁড়িয়ে শুদখোর লোকটা। শুদখোর যেন নিজের মাথা চুলকে বলছে: সম্প্রতি তুমি আমাকে ঘৃণা করছ কেন তা আমিই তোমাকে বুঝিয়ে দেবো। প্রথম কথা হোলো, আমাদের দু'জনকে দেখতে একই রকম মনে হচ্ছে। আমার আর আদর্শবাদীর মাঝখানে খুব বড় রকমের কোনো ব্যবধান নেই।

সুতরাং একজন আর একজনকে তেমন বেশী কামনাও করছে না। এটা তোমার সহ্য হচ্ছে না দেখতে পাচ্ছি। জীবন তোমার কাছে অত্যন্ত একঘেয়ে অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে উঠছে, এও প্রত্যক্ষ। এইটিই তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে কেমন ক'রে আমি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছি, এটা কি তোমার চোখে পড়েনি? তোমার সহকর্মীদের চেহারাও তাই। তোমরা সবাই সুনিয়ন্ত্রিত ছায়ামূর্তি! আমরা চাকচিক্যময় হল্ ভাড়া নিই; সুন্দরী তরুণীর দল এবং কতকগুলো অভিজ্ঞ লোক—এদেরও ভাড়া ক'রে আনি। আমরাও একদিন ক্ষমতা পাবো এই ভরসা করি। আর কিছু চাও তুমি? তোমার মনের যে অংশটা উদার, সেটা বুড়ো হ'তে চললো, বুঝলে বন্ধু, আমরা এখন একই দলে। এতদূরেই তুমি নেমে এসেছ!

এমন সময় একটি লোক এসে দাঁড়াল। বললে, মিঃ আরেণফেল্ট, হল্ ভরে উঠেছে, শ্রোতারা ব্যস্ত হয়ে পড়ছে!

পরিচ্ছেদ -১৮

বিচার সভার উদ্বোধন হয়েছে। কৌতূহলী দর্শক সাধারণে গ্যালারী পরিপূর্ণ। হাকিম, রাজস্বপক্ষের প্রসিকিউটর, কেরাণী, আসামীপক্ষের কৌঁসুলী—সবাই সেই কক্ষের বিভিন্ন অংশে নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট! জুরীর দল বসেছে বাঁ দিকে, আসামী রয়েছে কাঠগড়ায়—তা'র পিছনে একজন পাহারাওয়ালা। ঘটনা হোলো, একটি রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড,—আসামী সে-সম্বন্ধে কোনো খোঁজখবর দিতে চায় না,—হাজতে ব'সেও না,—বিচার-সভার সমক্ষেও না।

আসামীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ, চুলে পাক ধরেছে, গায়ের রং ফ্যাকাসে,—দাড়ি

গোঁফ পরিষ্কার কামানো। আসামীর বেশভূষা পরিচ্ছন্ন, নিখুঁৎ তা'র কথাবার্তা আচার আচরণ বেশ সহজ ও সিধা। শ্রমিকদলের স্বনামখ্যাত নেতাদের সে অন্যতম,—তা'কে এই হত্যাকাণ্ডের আসামী সাব্যস্ত করা হয়েছে; চারিদিকে প্রবল উত্তেজনা।

আসামী পক্ষের সংবাদপত্রগুলি ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে—তাদের আদর্শপন্থার প্রতি এই প্রকার আক্রমণ লক্ষ্য ক'রে; অপরপক্ষে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি আনন্দে নৃত্য করছে। বলাই বাহুল্য, ওরা সব একই জাতের লোক, আজকাল ভবিষ্যৎ বেত্তার ছড়াছড়ি চারিদিকে।

আসামীপক্ষের কৌঁসুলী আজ সর্বশেষ বক্তৃতা করবেন। তিনি শ্রমিক দলের একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা। বিচারে যদি তাঁর মক্কেলের শাস্তি হয় তবে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবার আশঙ্কা আছে।

হাকিমের চোখে সোনা বাঁধানো চশমা, মুখখানা রক্তিম,—মোটাসোটা একজন ভদ্রলোক। তিনি এবার আসামীকে আহ্বান করলেন:

মিঃ আরেণফেল্টু, তুমি তোমার ঘটনার বিবরণ শুনেছ। তুমি জানো কি জন্য তুমি অভিযুক্ত,—তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্যের কথাও তুমি জানো। তুমি দোষী, একথা নিজের মুখে স্বীকার করবে কী?

আসামী উঠে দাঁড়ালো: আমি কিছুই স্বীকার করিনে।

হাকিম: যে-নামে তুমি আজ পরিচিত, এ নামটি সম্প্রতি তুমি গ্রহণ করেছ, এটি প্রমাণিত। পুলিশের আবিষ্কার অনুযায়ী বলা যেতে পারে, নাম-পরিবর্তন ব্যাপারে তুমি জগতে সর্বপ্রধান আসন লাভ করেছ। তোমার আসল নাম জানা যাচ্ছে আন্দ্রে বার্জেট। এখন থেকে তোমাকে ওই নামেই ডাকবো, আশা করি তোমার মত আছে।

আসামী: আমি যদিও পুলিশে চাকরি করিনে, তবুও জানতে পেরেছি হাকিম সাহেব, আপনার আসল নাম হোলো অসলেণ্, কিন্তু এখন আপনি বর্ক্ ব'লে নিজের নাম চালান্। আমি আপনার আগেকার নাম ধ'রে এখন থেকে ডাকবো, আশা করি আপনি রাজি আছেন।

সোনার চশমা-আঁটা ভদ্রলোকটির মুখমণ্ডল আরো রাঙা হ'য়ে উঠলো, তিনি কঠিন চক্ষে তাকালেন গ্যালারীর দিকে,—সেখান থেকে নানা টিট্‌কারী আর বাঁকা হাসি শোনা যাচ্ছিল। তিনি ব'লে গেলেন, এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, আগেও তুমি ধরা পড়েছিলে, আর আইনানুসারে অনেকবার তোমাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল!

আসামী ঘাড় নেড়ে তা'র সম্মতি জানালো।

হাকিম: অন্যান্য অভিযোগ ছাড়া, তুমি কয়েক বছর আগে একটি ব্যাঙ্ক প্রতারণার দ্বারা মোটা টাকা পেয়েছিলে, অবিশ্যি টাকাটা আর পাওয়া যায় নি।

আসামীপক্ষের কৌসুলী: ক্ষমা করবেন, হাকিম সাহেব। সেই কেসের বিচার আর শাস্তি—দুই-ই হয়ে গেছে, আজ সেটা ঘাঁটাঘাঁটি না করাই উচিৎ।

আসামী তখনও দণ্ডায়মান। মুখে হাসি না এনে সে জবাব দিল: হাকিম সাহেব ঘটনার কথাই বলছেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আজ আমি একটি রাজনীতিক দলের নেতা। কিন্তু বুর্জোয়া দলের মধ্যে কি এমন লোকও নেই যাঁরা অপরের টাকা-কড়ি দরজা-জানলা দিয়ে ছোড়াছুড়ি করেন না? অবশ্য তাঁদের আদালতে টেনে আনা হয়না বটে, বরং তা'র বদলে প্রায়ই তাঁদের কাউকে উঁচু আসনে সম্মান দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়—আর, সমগ্র পৃথিবী হাঁ ক'রে চেয়ে দেখে তিনি আপন রাজনীতিক সহকর্মীদের

কাছে দিব্যি বিশ্বাসী লোক। সুতরাং আজ আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিৎ নয়, আমার পক্ষে ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি হওয়া উচিৎ।

হাকিম তা'র হাতুড়ি ঠকঠক করলেন। সোনার চশমাটা খুলে সেটাকে একবার মুছে নিলেন। তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। এরপর আবার যখন দর্শকদের দিক থেকে টিটকারি এলো, তিনি পুনরায় হাতুড়ির শব্দ ক'রে গর্জে উঠলেন: যদি দর্শকরা শান্ত না থাকে, আমি গ্যালারী খালি ক'রে দেবো। তারপর তিনি আরম্ভ করলেন: তাহলে আমাদের সামনে কেসটা হোলো এই, ধার-কারবারী মহাজন মিঃ অব্রাহামসনের নিরুদ্দেশ হওয়া! তুমি তাহলে স্বীকার করছ তুমি তাকে চিনতে?

আসামী নতমুখে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

হাকিম: তুমি সেই মহাজনের দোকান-বাড়ীর বাইরে হাঙ্গামাকারীদের দলপতি ছিলে?

আসামী নতচক্ষে চেয়ে পুনরায় সম্মতি জানালো।

হাকিম: তুমি জানলা-দরজায় ইটপাটকেল ছুড়ে ভাঙতে সাহায্য করেছিলে। তুমি কয়েকটি লোককে নিয়ে দোকানের মধ্যে ঢুকেছিলে, তারপর যেমন ক'রেই হোক সিন্দুকের চাবি খুঁজে পেয়েছিলে। তুমি নিজে সিন্দুক খুলে মূল্যবান সামগ্রী, সোনা জড়োয়ার গহনা আর চেকগুলি জনতার মধ্যে সমস্ত ছড়িয়ে বিলিয়ে দিয়েছিলে! এসব তুমি স্বীকার করো কি?

আসামী: আজ্ঞে, হ্যাঁ।

রাজস্বপক্ষের প্রসিকিউটর—কৃষ্ণকায় ব্যক্তি, হাড়-বাঁধানো চশমা চোখে। তিনি প্রশ্ন করলেন: চাবিটা কি আছে তোমার কাছে? ওটা যে দরজার কাছে ফেলে আসবে, এটা খুব সম্ভব নয়।

আসামী নীরব। কতক্ষণ চুপ।

হাকিম: তোমার সঙ্গে কি সেই মহাজনের ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল?

আসামী একবার মাথায় হাতখানা বুলিয়ে হাসিমুখে বললে, হ্যাঁ এবং না—দুই-ই বলব। কিন্তু সে ছিল হিংস্র জানোয়ার, আমাদের অভিশপ্ত সমাজের গায়ে দুষ্টক্ষতের মতো। লোকে যখন ক্ষুধায়, ঠাণ্ডায়, নিরাশ্রয় হয়ে ম'রে যাচ্ছে,—তখন, সে লোকটা তা'র ব্যবসা চালায়, লাভের টাকা জমায়, সোনার গাদা বানায়। আমি বলতে চাই আমাদের এই ধনতান্ত্রিক সমাজে আজ এমন বহু সহস্র লোক আছে যারা ওই লোকটারই মতো,—ও ছিল তাদেরই একটা টাইপ। ওই রক্তলেহী লোকটাকে আর আমি বরদাস্ত করতে পারিনি। আমি স্থির করলুম, একটা উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করবো।

আসামীপক্ষের কৌঁসুলী হলেন সুশ্রী একজন ফিটফাট শহুরে বাবু,—তিনি তাঁর নাক-টেপা চশমাটা ঠিক ক'রে নিয়ে সোনার পেন্সিলটি ধ'রে তীব্রভাবে গরগর ক'রে উঠলেন। তাঁর বক্তৃতায় ধনতান্ত্রিক সমাজকে ভীষণভাবে আক্রমণ করবার কথা ছিল। শ্রমিকদলের মুখপত্রে সেই বক্তৃতাটি ইতিমধ্যেই সাজানো আছে প্রকাশ করার জন্ত—আগামীকাল প্রভাতেই সেটি প্রকাশিত হবার কথা।

সরকার পক্ষের কৌঁসুলী: তুমি যখন দোকানে ঢুকেছিলে তখন কি সেই মহাজনটি সেখানে ছিল?

আসামী চিবুকে হাত রেখে জানালো, তা'র বিশ্বাস—সে লোকটা ছিল।

বিশ্বাস? নিশ্চিত নও তুমি? তুমি কি দেখোনি তা'কে?

হ্যাঁ।

হাকিম: কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে সেই লোকটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য! পুলিশ

তা'র সন্ধান করেছে শহরের সর্বত্র, দেশ-দেশান্তর,—কিন্তু বেশ বুঝতে পারা যায় লোকটিকে হত্যা ক'রে গুম করা হয়েছে। ঘটনার বিষয় কিছু বলতে তুমি কি এখনও অস্বীকার করো ?

হাকিম চেয়ারে হেলান দিয়ে আসামীকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কতক্ষণ চুপচাপ। বিচার-সভা আর গ্যালারীর সকলের একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ হোলো আসামীর প্রতি—তা'র পাকা চুলের প্রতি আর বিবর্ণ মুখের প্রতি। কেবল তা'র পিছনে পাহারাওয়ালাটা রইলো নির্বিকার হয়ে।

হাকিম বললেন : আমার বিশ্বাস সোজাসুজি সত্য কথা বললে তুমি নিজেরই উপকার করবে। রহস্যটা তুমি নিশ্চয়ই জানো।

আবার চারিদিক নীরব। সকলের চোখ আড়ষ্ট হ'য়ে রইলো সুসজ্জিত আসামীর দিকে। আসামী তখনও নতমুখে দাঁড়িয়ে। অবশেষে একসময় এমন ভাবে মাথা তুললো, যেন মনে হোলো, সে একটা মস্ত সিদ্ধান্ত করেছে। হাকিমের চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ—

ব্যাপারটা তুমি সব জানো ?

জানি।

ওদিককার টেবিলে ব'সে সংবাদপত্রসেবীরা যেন নিশ্বাস রোধ ক'রে তাদের খাতা-পেন্সিল নিয়ে উদগ্র উৎকর্ণ হয়ে উঠলো ।

হাকিম : তবে কি যা আমরা আশঙ্কা করছি তাই তুমি বলবে ? সেই মহাজন লোকটিকে কি খুন করা হয়েছে ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কে—কে খুন করেছে ?

আবার চুপচাপ। আসামী মাথা নত করলো।

হাকিম ঃ তুমি খুন করেছ ?

অতি মৃদুস্বরে—ওষ্ঠাধরের ভিতর দিয়ে এমন স্বীকারোক্তি প্রকাশ করা যেন কষ্টকর হ'য়ে উঠছে—এই ভাবে মৃদুকণ্ঠে আসামী বললে, হ্যাঁ!

সেই বিরাট হল্-ঘর আবার যেন নীরবতায় ভ'রে উঠলো। আসামী পক্ষের কৌঁসুলী চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে তাকালেন। স্বীকারোক্তিটি যেন আকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এসেছে। কৌঁসুলীর বিরাট বক্তৃতার অবশিষ্টাংশটুকুর মধ্যে যেন এই স্বীকারোক্তিটি একটা ওলোটপালট এনে দিয়েছিল। কেবল সাংবাদিকরা লিখে চলেছে—শুধু লিখে চলেছে। চাঞ্চল্য, ভয়ানক চাঞ্চল্য চারিদিকে······সংবাদপত্রে বড় বড় মোটা হরপের শিরোনামা। হত্যাকারী অপরাধ স্বীকার করেছে! কেবল ওদিকে গ্যালারীর উপরে একটি স্ত্রীলোক হাঁ ক'রে শুধু ক্লিষ্ট শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলছে—যেন এখনি প্রায় সে জ্ঞান হারাবে।

হাকিম ঃ দোকান ভাঙাভাঙির সময় তা'কে খুন করা হয়—কিম্বা তা'র পরে ?

সেই দিনেই!

সেখানে আর কেউ ছিল ?

না।

যারা তোমাকে দোকান ভাঙায় সাহায্য করেছিল, তা'রা কি তখন চ'লে গিয়েছিল ?

হ্যাঁ, তা'রা চ'লে গিয়েছিল।

হাকিমের প্রত্যেকটি প্রশ্নের আগে একবার সবাই চুপ। জুরীর সভ্যরা গলা বাড়িয়ে অখণ্ড উদ্বেগ আর উৎকর্ণতায় হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে। হাকিম

বললেন, ঘটনাটা কেমন ভাবে ঘটলো আমাদের বলো ত ? কিচ্ছু লুকিয়ো না, আন্দ্রে। কি প্রকার অস্ত্র তুমি ব্যবহার করেছিলে ?

ঠিক বোঝা গেল না আসামী নতমুখে ঘাড় নাড়লো কি না। হাকিম ব'লে চললেন, মনে রেখো যত খোলাখুলি ভাবে তুমি অপরাধ স্বীকার করবে, রং চং না চড়িয়ে যতখানি সহজ সত্য কথা আমাদের কাছে বলবে, তোমার পক্ষে ততই মঙ্গলজনক হবে। এবার বলো, ঘটনাটা কী ভাবে ঘটলো।

চারিদিক নীরব। সাংবাদিকরা আর উদ্বিগ্ন নয়; তা'রা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। হাকিম বললেন, তুমি নিশ্চয়ই রিভলভার ব্যবহার করোনি, এটা বোঝা যায়। এপাশে কামারের দোকানে কিংবা ওপাশে মদের দোকানে কেউ গুলীর আওয়াজ শোনেনি। তোমার কাছে কি ছুরি ছিল ?

আসামী ঘাড় নাড়লো।

হাকিম তখন প্রায় বন্ধুর মতো ভদ্র মিষ্ট কণ্ঠে বললেন, বেশ, তাহলে, আন্দ্রে, ঘটনাটা আমাদের সব খুলে বলো! তুমি ঠিক কী করেছিলে ?

দুহাত বাড়িয়ে আঙুলগুলো কুঁকড়ে ফ্যাকাসে আসামীটি এবার বললে, আমি···আমি···

জনতার মধ্যে যেন একটা আতঙ্কময় শিহরণ প্রবাহিত হ'য়ে গেল। যেন তখনকার একটা দৃশ্যমান নীরবতার ভিতর দিয়ে সাংবাদিকরা পেন্সিল ছোটাতে লাগলো।

হাকিম : তাই নাকি ? তুমি তা'র টুঁটি টিপে ধরেছিলে ?

আসামী সম্মতি জানালো ঘাড় নেড়ে। সকলে স্তব্ধ।

হাকিম : সে-লোকটা প্রতিরোধ করেনি ? তা'র সঙ্গে তুমি ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছিলে ?

না, বিশেষ নয়।

মৃত্যুর অনেকক্ষণ আগে অবধি কি এই প্রকার অবস্থা ছিল?

ন্—না।

আসামীপক্ষের কৌসুলী চেয়ারের এপাশে ওপাশে নড়াচড়া করছিলেন। তিনি এইভাবে আসামীপক্ষ সমর্থন করবেন মনে করেছিলেন যে, যদি কেউ এইভাবে হত্যা করতে বাধ্য হয়, তবে অপরাধ সম্পূর্ণ ক্ষয়িষ্ণু সমাজেরই। কিন্তু ওই হতভাগা লোকটা এমনভাবে অপরাধ স্বীকারে প্রবৃদ্ধ হোলো কেন? সাক্ষ্য-সাবুদ যখন কেউ নেই, তখন কেন এই অপরাধ স্বীকার?

হাকিম প্রশ্ন করলেন: আচ্ছা, মৃতদেহ গোপন করার জন্য তুমি তখন কী করলে? এখন সেই দেহটা কোথায়?

আসামী নতমুখে নীরব হ'য়ে রইলো।

হাকিম: যখন পুলিশ গিয়ে পৌছল তুমি তখন সেই বাড়ীতে; অথচ সেই মহাজন তখন নিরুদ্দেশ। সেই বাড়ী তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজাখুঁজি করা হোলো, মাটি খোঁড়া হোলো, জানলা-কপাট ভেঙে দেখা হোলো, দেওয়ালে দেওয়ালে ঠোকাঠুকি ক'রে পরীক্ষা চললো, মাটির তলা খুঁড়ে খুঁড়ে দেখলো; কিন্তু তবু সেই মহাজনের শবদেহ সেই বাড়ীর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ সেটা গুম করবার মতন সময় তুমি বিশেষ কিছুই পাওনি। সুতরাং এবার বলো, তুমি কি সেটাকে লুকিয়ে রেখেছ?

আসামী চোখ তুলে হাকিমের দিকে তাকালো। সকল দিক থেকে প্রত্যেকের চক্ষু আসামীর প্রতি নিবদ্ধ। একসময় সে ঘাড় নাড়লো।

তোমাকে বলতেই হবে, আজ্ঞে। এরপর তুমি কিছুতেই সেই মৃতদেহ গোপন

রাখতে পারবেনা,—তুমি এই ভাবে আমাদের হায়রাণ ক'রে নিজের কেস আরো খারাপ ক'রে তুলছ।

একটু থেমে সরকারপক্ষের প্রসিকিউটর প্রশ্ন করলেন: লোকটাকে খুন করার সময় আর কেউ কি তোমার সহায়তা করেছিল?

আসামী ঘাড় নাড়লো। উপরিওয়ালারা সকলে পরস্পরের প্রতি তাকালেন। লোকটা কতক্ষণ তাঁদেরকে এই ভাবে বোকা বানিয়ে আট্‌কে রাখতে চায়? অবশেষে হাকিম বললেন, এইবার শেষবার, আস্ত্রে। তুমি মহাজনটির মৃতদেহ কোথায় গোপন ক'রে রেখেছ?

আসামীর মুখের কোণে সহসা একটু কুটীল হাসি দেখা দিল। মানে? সত্যই কি লোকটা হাসছে? নিশ্চয় তা'রা সকলেই বিভ্রান্ত! কিন্তু তারপর আসামী কাঠগড়ার পাড়ের উপর দু'খানা হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে সমগ্র জনতার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট কঠিন কণ্ঠে বললে, এখন এই মূহূর্ত্তে সেই মহাজন ঠিক কোথায় তা আমি বলতে অপারগ।

কিয়ৎক্ষণ চুপচাপ। সকলের মুখই মূঢ়, হতবাক। হাকিম বললেন, তা'র মানে তুমি কি নিজেও জানো না?

আসামী: সম্ভবত।

হাকিম: তবে কি বলতে চাও সব কিছু সত্ত্বেও অন্য লোকরা তোমার সহায় ছিল?

আসামী: ঠিক সত্যি কথা বলতে গেলে,—আমার বিশ্বাস, এখানে উপস্থিত সকলের মধ্যেই সেই শুদখোর লোকটার ভগ্নাংশ ছড়িয়ে আছে।

হাকিম হাঁ করলেন। সরকার পক্ষের প্রসিকিউটর হাড়বাঁধানো চশমাটা খুলে ফেললেন। প্রত্যেকে একদৃষ্টে তাকালো। সাংবাদিকরা তাদের পেন্সিলের

কথা ভুলে গেল। অবশেষে হাকিম প্রশ্ন করলেন, কী বলতে চেষ্টা করছ? তোমার একথার মানে কি?

আসামী: সেই কর্জদাতা লোকটিকে সবাই যেভাবে জানে, সে তা নয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে হাকিম বললেন: তাকে যে ভাবে লোকে জানতো, সে ঠিক সেই লোক ছিলনা? সে কি পোল্যাণ্ড-ফেরত একজন ইহুদী নয়?

না, হাকিম সাহেব।

তবে কে সে?

সেই কর্জদাতা মহাজন—সে হলুম আমি!

হঠাৎ সবাই চুপ—কেবল মেঝের উপর কয়েকখানা চেয়ার টানাটানির শব্দ হোলো। সরকারী প্রসিকিউটর উঠে দাঁড়ালেন,—জুরীর কয়েকজন সভ্যও উঠে দাঁড়ালেন। গ্যালারীর ওদিকে লোকেরা এমনভাবে ঝুঁকে পড়লো যে, কতকগুলো লোক আর একটু হলেই আল্‌সের থেকে প'ড়ে গিয়েছিল আর কি! হাকিম তাঁর একটা কানের পিছনে আঙ্গুল রেখে যেন ভালো ক'রে আসামীর কথাটা শোনবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে তিনি নিজের মুখ থেকে প্রশ্নটা যেন ঠেলে বা'র করলেন, কে, কে সে? কা'র কথা বললে?

সে আমি নিজেই, হাকিম সাহেব!

এবার নীরবতা দীর্ঘ হ'য়ে উঠলো। প্রত্যেকে একদৃষ্টে তাকালো ওই বিশীর্ণ ধূসরায়মানকেশ ভদ্র ব্যক্তিটির প্রতি। সরকারী প্রসিকিউটর দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, কিন্তু এইমাত্র স্বীকার করলে তুমি তা'কে হত্যা করেছ!

হ্যাঁ, তা করেছি, প্রসিকিউটর সাহেব। লোকটা যে আবার বেঁচে উঠবে, এ আমি আর মনে করিনে।

কর্তৃপক্ষের লোকেরা আবার পরস্পরের প্রতি তাকালেন। আসামীপক্ষের

কৌস্থলী তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে মোটামুটি বিবৃত করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু আবার ব'সে পড়লেন নিজের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে। তাঁর পক্ষে আর বক্তৃতা করা অসম্ভব। তাঁর বক্তৃতাটা তুলে নেবার জন্য তাঁকে সংবাদ-পত্রের আপিসে খবর পাঠাতেই হবে। ওই আদর্শবাদী, ওই নব্যসমাজ ব্যবস্থার উদ্‌গাতা যখন নিজের মুখেই মৃত মহাজনকে আপন অঙ্গীভূত ক'রে ঘোষণা করলো, তখন আর সমাজের প্রতি বিষোদ্‌গার করার প্রয়োজন হবে না।

হাকিম আসামীকে প্রশ্ন করলেন, বলো ত আমাকে, সম্প্রতি তোমার বেশ ভালোমতো ঘুম হয়েছিল?

ওঃ—তা হ্যাঁ, যেমন হয়!

তোমার কখনো মাথা ধরে? গা মাটি-মাটি করে?

না, হাকিম সাহেব।

তাহ'লে পরিষ্কার সহজ সুস্থ মনের কথাতেই বলো, তুমি তামাসা করছ, না সত্যি সত্যি বলছ? তুমি কি নিজেই সেই ধার-কারবারী?

আজ্ঞে হ্যাঁ, অবশ্যই আমি। আমিই সেই ধার-কারবারী।

তাহ'লে সমস্তটাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কেমন? কোনো মহাজনকেই হত্যা করা হয়নি তাহ'লে?

হ্যাঁ হয়েছে, হাকিম সাহেব। আমিই খুন করেছি; সে মরে গেছে। আর সে কোনোদিন দরিদ্রদের পীড়ন করবে না।—এবার আমার বিশ্বাস, আপনি প্রশ্ন করবেন, কেমন ক'রে একজন সাম্যবাদী, একজন বিপ্লবী,—ধনতান্ত্রিক সমাজকে যে ঘৃণা করে,—সে একই সময়ে একজন ইতর মহাজন হ'তে পারে! তবে শুনুন,—জুরীতে সমাগত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ,—

আপনারা আমাকে চূড়ান্ত ভণ্ড বলবেন জানি, কিন্তু তবু আমি বলতে চাই, এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছু হয় না!

আসামী বলতে লাগলো, মহাজন থাকাকালে আমার ভিতরে একটা বেয়াড়া বিবেক জেগে উঠতো,—তা'র বাসনা ছিল মহৎ মানুষ হবার, সমাজ ব্যবস্থাকে কল্যাণজনকরূপে পরিণত দেখবার। যখন গরীব লোকরা টাকা ধার নিতে আসতো, তাদের উপর ডাকাতি করার সময়ে আমার স্বভাবের একটা বড় অংশ যেন আত্মপ্রকাশ করতো; আমার বাকি অংশটা থাকতো বাইরের আলোয়—সেখান থেকে আমি গরীবদের হ'য়ে লড়াই করতুম, তাদের অধিকার নিয়ে জগতের সামনে ওকালতি করতুম। কেবল, জনতার উদ্দেশে বলা সেই লোভনীয় কথাগুলিতে জননেতার গলার আওয়াজ উঁচু থেকে উঁচুতেই চড়তে পারতো, কিন্তু আমি একমাত্র এই ভেবে সান্ত্বনা পেতুম যে, আমি দিব্যি স্বার্থের নোঙরে বাঁধা আছি। সমস্ত দিন পরে, যতই নোংরা হোক না কেন, আমি আমার স্বার্থকেন্দ্রে ফিরে আসতুম। নিজের স্বভাবটাকে উল্‌টে নেবার মতো শক্তি সামর্থ্য এখানে পেতুম। যেমন হয়ে থাকে, মহাজনের রাগ ছিল সাম্যবাদী ডাক্তারের প্রতি, এবং সাম্যবাদীটি ঘৃণা করতো আর গালমন্দ দিত ওই মহাজনটিকে। উভয়ের মধ্যেকার এই কথাকথিতে আমার মন সদাসর্বদা স্পষ্ট জাগ্রত থাকতো! একদিন সাম্যবাদীটি মহাজনের বিরুদ্ধে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামার চক্রান্ত করলো, লুঠ করলো তার দোকানপাট, তারপর তা'র টুঁটি টিপে ধরলো। এই ভাবেই আমাদের স্বভাবের একটা অংশ আরেকটা অংশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়ে থাকে! এবার তবে আমি কি প্রশ্ন করতে পারি, এ আদালতে কি সেই সব লোকের সংখ্যা অনেক বেশী, যাঁরা আপন আপন স্বভাবের উন্নতি করার বাসনায় নিজেদের চুলচেরা বিচার করেন?

আসামী ব'লে চলে: প্রাণ আর মতবাদ? আপনারা দুটোকে মেলাতে চান্? যদি আপনারা সদাই সত্যবাদী হন, তবে সকলেই স্বীকার করবেন. এর চেয়ে অসম্ভব আর কিছু হ'তে পারে না। আদর্শটাই যদি প্রাণ হয়, তবে আকাশের দিকে চেয়ে আর কিছু কামনা করবার থাকবেনা, ভাবী কালের স্বপ্ন কিছুই আর থাকবেনা। বিশ্বাস, বাসনা আর স্বপ্ন—কোনোটারই প্রয়োজন হবেনা। যে মুহূর্তে আদর্শ টা জীবনের একটা অংশ হ'য়ে দাঁড়াবে,—সেটা তখনই রূপান্তরিত হবে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায়। সকলের শেষে এই কক্ষেব সকলকে আমি প্রশ্ন করবো, আমি কি সত্যবান নই? আমি কি সুবিচার করিনি? এখানে যত ভদ্রলোক আর মহিলারা উপস্থিত আছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই নিজেদেরকে খৃষ্টান ব'লে পরিচয় দিয়ে থাকেন, এই আমি অনুমান করি। তাঁরা সত্য ক'রে বলুন, একটি দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটি মুহূর্তের জন্যও কি তাঁরা খৃষ্টধর্মের নীতি পালন ক'রে চলেন?

ভণ্ডামী? মোটেই না। উচ্চ আদর্শের নীতি যখন আমাদের নাগালের বাইরে থাকে. তখনই সেটি সত্য, সেটি চিরন্তর। সত্য ক'রেই বলবো, ওই সাম্যবাদী বক্তা—ধনতন্ত্রের প্রতি যার ঘৃণা, তা'র বিপরীত দিকটা কি আপনারা জানেন? বেশী টাকা কা'রা চায়? দেনার টাকা ফাঁকি দেওয়ার জন্য কা'রা বেশী অজুহাত দেখায়? যারা আমার দরজায় জিনিস বাঁধা রেখে টাকা ধার নিতে আসতো,—তাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই এই বদ্ অভ্যাস ছিল! ভণ্ডামী? মোটেই না! তা'রা আপনার আমারই মতো। আমি আশাকরি আপনারা এবং তা'রা মিলে আমার মতোই করবেন—আপনাদের স্বভাবের ভিতরে সেই মহাজনটার গলা টিপে মারুন; তবে বিনা পরিশ্রমেই সমাজের উন্নতি আর শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে!

কিন্তু এই সভায় যদি একজনও কেউ থাকে, যিনি বলতে পারেন, তিনি এই অপরাধ থেকে মুক্ত, তাহ'লে তিনি উঠে দাঁড়ান—প্রথম ঢিলটি তিনিই ছুড়ে মারুন।

আসামী বলতে থাকে, আমি যতটা পরিমাণে সংশ্লিষ্ট, আমি বেদনার সঙ্গে বলতে পারি, যেদিন আমাদের ভিতরে পাপের গলা টিপে মারি, সেদিন আমরা তা'র সঙ্গে কল্যাণকেও ধ্বংস করি। সেই কারণেই আজ আমি এখানে, আমি আমার নিজের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে ঠিক নিশ্চিত নই। আজ আমি কে, কাল আমি কি হবো? সম্ভবত আপনারাও জানেন না, অল্পদিনের মধ্যে আপনারাই বা কী হয়ে উঠবেন? আমরা একটি দিন থেকে অন্যদিনটিতে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার কালে প্রায়ই আমাদের স্বভাবের পরিবর্তন করি—এক্ষেত্রে হাকিম সাহেবও যা, আমিও তাই।

কপালের ঘাম মুছে আসামী ব'সে পড়লো। তা'র পক্ষের কৌশুলীও সমস্ত কাগজপত্র গুছিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বিবর্ণ মুখে ব'সে পড়লেন। জুরীর সভ্যরা পরস্পরের প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। একটি সুদীর্ঘ নীরবতায় বিচারশালা আচ্ছন্ন।

অবশেষে সরকার পক্ষের কৌশুলীর দিকে তাকিয়ে হাকিম ব'লে উঠলেন, আচ্ছা, আজকের মতো আমরা আদালতের কাজ মুলতুবি রাখতে পারি। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, আসামীকে প্রথম সব কাজ ফেলে আগে কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার।

পরিচ্ছেদ—৩৯

সেই বছরকার শীত পড়লো অস্বাভাবিক রকম প্রবল। তুষার পতনের ফলে চারিদিকে কঠিন বরফ জ'মে উঠতে লাগলো, এবং তুহিন শীতের স্থায়ীত্বের জন্য তুষারপাতও হ'তে লাগলো প্রচুর।

বড় বড় রাস্তাগুলো অতি কষ্টে খুলে রাখা হোলো; তার উপর যখন কোনো ঘোড়া অথবা কুকুর-টানা গাড়ী যায়,—চাকার তলায় নিরেট জমাট বরফ কচমচ-কচমচ করতে থাকে; আর সেই গাড়ীর গাড়োয়ান মোটা পশমী দস্তানা দিয়ে পাগলের মতন নিজের মুখখানা ঘষতে ঘষতে চ'লে যায়। বনে-জঙ্গলে এবার সবচেয়ে বেশী বরফ পড়েছে,—জনসাধারণ হয় তুষারপাতের ফলে, নয়ত সাংঘাতিক ঠাণ্ডায়, অথবা দুটোরই জন্য আর ঘরের বাইরে আসতে পারছেনা। অনেকে যেন বন্দী হ'য়ে রয়েছে।

ঠিক এমনিই এক রাত্রে একটি লোক অরণ্যের সীমানাপথ ধ'রে এসে পৌছল। হাতে একটা লাঠি, কাঁধে একটি ঝোলা। মাথার চওড়া টুপিটা টেনে কপালের দিকে নামানো; সুতরাং লোকটির একমুখ দাড়ি ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছেনা—সেই দাড়ির উপর তুষারের দানা প'ড়ে শাদা হ'য়ে গেছে।

পথের উপর দিয়ে লোকটা বরফ হাতড়ে হাতড়ে চলেছে, কারণ সেদিন সেই পথে বরফ-কাটা যন্ত্র চালানো সম্ভব হয়নি। লোকটা ভাবে, ওতে কিছু যায় আসেনা, বনের মধ্যে ঢুকলে পথের চেহারা আরো খারাপ হ'য়ে দাঁড়াবে!

পথের ডানপাশে একটি সরোবর—কিন্তু সে-রাত্রে ওটাকে দেখা যাচ্ছে একটি শ্বেত সমতলভূমি। চাষ-আবাদের ক্ষেত, তৎসংলগ্ন ঘরগুলি—সমস্তই ঢাকা

সাম্নুদেশের গায়ে বয়ফে জমে গেছে, তাদের জানলায় পড়েছে জ্যোৎস্না। একটু দাঁড়াও—ওখানে একটি বসবার বেঞ্চি ছিল বটে। হ্যাঁ, ওই যে দেখা যায়। কেউ ওটাকে শীতের সময়ে ঘরের মধ্যে তুলে নেয়নি; ওর উপর বরফের স্তর জমে শক্ত হ'য়ে রয়েছে।

পলকের জন্য লোকটি দাঁড়ালো। সেই তা'রা দুজন—সেই লোকটি আর সেই নারীটি—ওখানে একদিন রাত্রে একত্র বসেছিল। সেদিন আকাশে ছিল চন্দ্র—কিন্তু সমস্তটার চেহারা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকমের।

কিয়ৎক্ষণ পরে পথ ছেড়ে সে ঢুকলো বনে—সেখানে আরো গভীর তুষারের ভিতর দিয়ে ঠেলে ঠেলে সে চললো। গ্রীষ্মকালে এখানে একফালি ঘাসের উপর পায়ে হাঁটা পথ পাওয়া যায়—দু'পাশে চাকার ঘন দাগ পড়ে,—কিন্তু সে রাত্রে এমন কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না যাতে মনে হয়, এই পথ দিয়ে কেউ চ'লে গেছে। সে আড়ষ্ট হ'য়ে উঠলো এই কথা ভেবে—বনের ভিতরে সেই ক্ষুদ্র কুটীরে কোনো কিছু ঘটেনি ত?

বাস্তবিকই তা'কে নিশ্বাস নেবার জন্য একবার দাঁড়াতে হোলো। প্রতি পদক্ষেপে বরফ ঠেলে চলা অতিরিক্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ। যখন সে সেই কুটীর প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌছবে—তখন হয়ত তা'রা ঘুমোতে গেছে; কিংবা ওখানে যদি এখন আর কেউ না থাকে, তা'তেই বা কী আসে যায়?

চলো—চলো,—হেঁটে চলো, থেমো না তুমি! সে যেন একটা আশ্চর্য অভিযান। সেই নারীকে দর্শন করার তেমন বাসনা কিছু নেই তা'র—কিন্তু তবু তাকে ওখানে যেতে হবে—যেতেই হবে—তা'র কাছাকাছি গিয়ে পৌছনো চাই।

তুষারময় শুভ্র অরণ্যপথ শীতের রাত্রে মৃত্যুর মতো যেমন নীরব, তেমন

নৈঃশব্দ আর কি কোথাও কিছু আছে? প্রত্যেকটি গাছের ডাল শাদা তুষারের আবরণে আচ্ছাদিত, প্রত্যেকটি গাছের লতাপাতা শাদা ঝালরে পরিচ্ছন্ন প্রসাধন সজ্জা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রূপালী গাছের ডাল কী অপরূপ সুন্দর! সহসা মনে হোলো সেই সলজ্জ সপ্রতিভ নারীর অপূর্ব কৃশতা,—যেন ব্রীড়াবনতা নববধূ—যেন জ্যোৎস্নার বিহ্বল রেখাগুলি পড়েছে তা'র অঙ্গে-অঙ্গে। প্রিয়তমের জন্য, স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছে সে অধীর আগ্রহে,—আনত হ'য়ে রয়েছে সে দেবতার আশীর্বাদলাভের কামনায়। তুমি যেন প্রতি মুহূর্তের আকণ্ঠ উৎকণ্ঠায় অস্থির হ'য়ে উঠেছো, কতক্ষণে দেবমন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি জাগবে তোমাদের শুভ-মিলনের উৎসব-আনন্দ নিয়ে! আ, কী অপরূপ রাত্রি!

বনপথ শেষ হোলো। তা'র চোখে পড়লো,—ওই যে, ওই যে সেই কুটীরের অঙ্গন! হৃদয়, শান্ত হও, অত অধীর হয়ো না, অত পাখার ঝাপট দিয়ো না।

কত ছোট হয়ে গেছে ঘরগুলি! প্রবল তুষারপাতের কাছে হার মেনে ওগুলো যেন নতজানু হ'য়ে আত্মদান করেছে,—মাথার উপর শুভ্র কঠিন তুষারের গুরুভার তুলে নিয়েছে। কোনো জানলায় আলোকের রেখাটিও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মানুষ আছে ওখানে নিশ্চয়ই,—কারণ গোয়ালঘর থেকে রান্নাঘর অবধি একটা পথের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে; এবং রান্নাঘরের দরজায় কতকগুলো মাটির ভাঁড় বরফে-ঢাকা প'ড়ে রয়েছে।

লাঠির উপর অনেকখানি ভর দিয়ে কুঁজো হ'য়ে লোকটি চললো ক্ষুদ্র ঘরটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে,—তা'র সমস্ত পিঠে ও পিছনে তুষার পড়ে শাদা হয়ে গেছে।

সেই নারী কি নিদ্রিত? সে কি অন্য কোথাও চ'লে গেছে? কিন্তু কোনো প্রশ্ন তুলতে সে আজ আর সাহস করলো না! শিলভিয়া—শোনো, শিলভিয়া, আজ তোমার কাছে আমি মার্জনা ভিক্ষা নিতে আসিনি, জীবনকে উন্নত করবো, কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করবো—সে-কথা বলতেও নয়। কিন্তু তবু এসেছি এখানে—হয়ত তুমি জানবে না—হয়ত তুমি এখানে, কিম্বা অন্য কোথাও ঘুমিয়ে রয়েছ! কিন্তু তুমি জানলে না, শিলভিয়া—আমি এসেছিলুম এখানে!

অনড় জর্জর দু'খানা পা টেনে আন্দ্রে আরো কাছে গেল। পায়ের তলায় বরফ মাড়ানোর মচমচে শব্দ হ'তে থাকে। ক্ষুদ্র অঙ্গনটিতে সে এসে উত্তীর্ণ হোলো—চন্দ্রালোক পড়লো তা'র তুষার শুভ্র শ্মশ্রুতে,--তা'র একটি নীলাভ ছায়া বিস্তীর্ণ হ'য়ে পড়লো বরফের উপর!

খড়ের গাদার কাছে সাঁকোটার দিকে সে সতর্ক সাবধানে হাতড়ে হাতড়ে চললো। তা'র উপরে গিয়ে উঠলো মৃদু লঘু সন্তর্পণে। পোষা কুকুর কোথাও নেই যে, এ-রাত্রে গৃহবাসীকে সতর্ক ক'রে দেবে। গোলা-ঘরটার দরজা দুটোয় তালাচাবি নেই। বেশ বোঝা যায়, বাড়ীর গৃহিণীর চোরের ভয় নেই। সে অতি ধীরে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। বরফের উপর তা'র পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে সকালে বেশ জানা যাবে কেউ এখানে এসেছে। কিন্তু সকাল হ'তে এখনও অনেক দেরী।

ভিতরটা প্রায়ান্ধকার। মাঝখানে মেঝের উপর ঘাস-কাটা যন্ত্রটা দাঁড়িয়ে, স্তূপাকার শস্য দেওয়ালের কাছে জড়ো করা। মনে হচ্ছে সম্প্রতি সেগুলো কাটা হচ্ছিল; সে ভাবলো আজকাল কে শিলভিয়াকে কাজের সাহায্য করে! অতি পরিচিত সেই ঘাস আর খড়ের গন্ধে গোলাঘরখানা ভরে রয়েছে।

কাঁধের উপর থেকে আন্দ্রে ঝোলাটা নামালো; তারপর স্তূপাকার

শস্তর একপাশে শুয়ে প'ড়ে হাত দু'খানা মাথার তলায় দিল। এইভাবে কেমন চমৎকার সে নিশ্চিন্ত বিশ্রামে শুয়ে থাকতে পারবে। অবশ্য মেঝেটা ঠাণ্ডা, তা'র গায়ে কোনো ঢাকাও নেই—এবং সম্ভবত, আর কিছু না হোক, সে হেঁটেও এসেছে এতখানি, একটু গরম হয়েছে বৈ কি। তবে কি না তুষারপাত—বরফে আচ্ছন্ন—তা হোক। কিন্তু একবার যেন—যেন একবার—যখন সে শুয়ে রয়েছে সেখানে—যেন একবার সেই সাঁকোর উপর দিয়ে কা'র লঘু পদশব্দ শোনা গেল! যেন কে এসে প্রশ্ন করতে চাইলো,—এমনভাবে শু'লে শীত করবে না তোমার?

না, এটা স্বপ্ন, মায়া, মোহ! এটা সেই আগেকার কথা। সুখ জিনিসটে আশ্চর্য! অনেকে সুখের অসহ্য শিহরণ বরদাস্ত করতে পারে না।

পাশের আস্তাবল থেকে একটি ঘোড়ার মৃদু স্বর শোনা গেল। ওটা কি সেই সমুদ্রের খাঁড়ির ধার থেকে আনা ছোট ঘোড়াটা? ও কি আন্দ্রেকে এই আচ্ছন্ন অস্পষ্টতার মধ্যেও চিনতে পেরেছে?

চোখ বন্ধ ক'রে আন্দ্রে তা'র তুষারাড়ষ্ট হাত পাগুলো টেনে টেনে ছড়িয়ে দিল। সে ভালোই করেছে, এই বরফের ভিতর দিয়ে আসা তা'র পক্ষে সাধ্য হয়েছে। একথা সত্য, প্রথমটা সে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে তা'র দাঁতে দাঁত লেগে ঠক্‌ঠক্ করছিল—কিন্তু এখন তা'র বেশ ভালোই লাগছে, —কেমন একপ্রকার ঘোলাটে তন্দ্রায় সে যেন আরামই বোধ করছে।

আর কিছু নেই, আন্দ্রে—এবার তুমি ঘুমোও। যবনিকার পতন হোলো।

এখনও যেন সে বাইরে সাঁকোর উপর লঘু পদধ্বনি শুনছে কান পেতে, মনে হোলো! ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল,—ওই যে শিলভিয়া দাঁড়িয়ে! বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখে শিলভিয়া একান্ত দৃষ্টিতে তাকালো তা'র প্রতি!

হা ভগবান, আবার তুমি কেন এলে ?

শিলভিয়া, আমি আসিনি, তোমার ক্ষমা চাইতে আসিনি, উন্নত জীবনের ক্ষুধা নিয়ে আসিনি, অনুতাপের প্রতিজ্ঞা নিয়েও তোমার কাছে আসিনি, শিলভিয়া ! কিন্তু আমি সকল মিথ্যা, সকল ছদ্মবেশ, আব ছায়ার অতীত লোকে কিছু আবিষ্কার করেছি। শিলভিয়া, সেটা মানবাত্মার চিরন্তন বাসনা, সেটা আলোকের পরম তৃষ্ণা। তুমি কি জানো তাকে ?

শিলভিয়া কাছে এসে বললে, হ্যাঁ, জানি।

তারপর যা ঘটলো, পথে আসতে আসতে আন্দ্রে তা কল্পনা করতেও ভরসা পায়নি। শিলভিয়া নতজানু হ'য়ে হাতের রুমালখানি দিয়ে অতি কোমল স্নেহে অতি মৃদু স্পর্শে তা'র কপালের ঘাম মুছিয়ে দিল।

শিলভিয়া বললে, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি,—আজও তোমাকে ভালোবাসি।

আন্দ্রে বললে, আমি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলুম, শিলভিয়া। আমি সব কিছু পাবো ব'লে পথে নেমেছিলুম, কিন্তু অসংখ্য অপুণ্যের আঘাতে আমি ছিন্নভিন্ন চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে গেলুম। না, আর আমার বাঁচবার কিছু নেই, শিলভিয়া।

না, তোমার কথা সত্যি নয়, আন্দ্রে—শিলভিয়া বললে, আমার স্তবগানের ভিতর দিয়ে তোমাকে বৈকুণ্ঠলোকের দিকে তুলে নিয়ে গেছি, এ কি তুমি জানো ? গীর্জায় গিয়ে আমরা দু'জনে গান গাইতুম, মনে পড়ে ?

হ্যাঁ, মনে পড়ে, প্রিয়তমে। সেই রাজহংস, সেই যে! সব কিছু সত্বেও সেটা কি আমার মধ্যে এতদিন পাখার ঝটাপটি করছিল ?

শিলভিয়া তা'র হাতখানি তুলে নিল নিজের হাতে। তারপর, কী বিস্ময়, শিলভিয়া যেন একটি শ্বেত রাজহংসে রূপান্তরিত হোলো। আর আন্দ্রে, নিজে,

নিজেও সে উঠে উড়তে পারলো স্বচ্ছন্দে,—সেও যেন শিলভিয়ারই মতো একটি রাজহংস। তা'রা উঠলো দু'জনে ধীরে ধীরে—তা'রা দুজনে ডানা বিস্তার ক'রে উড়ে চললো মহাশূন্যলোকে। উড়ে চললো দু'জনে পাশাপাশি।

আকাশে দু'জন গান গায় পরস্পর। সমস্ত কিছুর ওপারে আছে কোনো বস্তু—চিরকালীন চিরন্তন মানবাত্মার কামন,—আলোকের তৃষ্ণা ঐ রাজহংসটি! আন্দ্রে চেয়ে দেখলো, উপলব্ধি করলো। আর সবাই এলো, সবাই চললো তাদের সঙ্গে—। অনেককে আন্দ্রে চিনতো, তারাও তা'রই মতো। তা'রাও আপন প্রাণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সমস্ত জীবন মিথ্যাচরণ করেছে, প্রতারণা ক'রে এসেছে। কিন্তু একদিন এলো যেদিন আধিভৌতিক ধূলিধূসর দেহের আবরণ ঘুচিয়ে তা'রা সহজ, স্বচ্ছন্দ আনন্দলোকের পথে উড়ে চললো গান গেয়ে গেয়ে!

বৃদ্ধা জননীকে আজ আন্দ্রে দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করলো! আশ্চর্য, তিনিও যেন আপন প্রাণসত্তার ভিতরে শুভ্রদেহা একটি রাজহংস-স্বরূপা ছিলেন। গাও গাও, মাগো, তুমিও গান গেয়ে উ'ড়ে চলো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। দেখতে দেখতে অগণ্য আনন্দময় আত্মার সম্মিলিত আনন্দ-সঙ্গীতে আকাশপথ মুখর হ'য়ে উঠলো। তা'রা সবাই যেন আরও উচ্চ ব্যোমলোকে উঠলো,—সূর্যালোকিত মহাকাশতলে তা'রা উড়ে চলেছে—দূর থেকে দূরান্তরে—এপার থেকে ওপারে—সঙ্গীতের পাখায় ভর দিয়ে আন্দ্রেও আপন আত্মাকে উপরদিকে তুলে নিয়ে গেল!

পরদিন প্রভাতে ম্যানসাইন [illegible] আবিষ্কার করলে —আন্দ্রের মৃতদেহ হিমশীতল নিশ্চল হয়ে প'ড়ে রয়েছে।